শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪)

Vol - 34

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দায়	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৫
মা	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৬
নিত্য-আবির্ভাব	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	৭
অন্তহীনা	সুজিৎকুমার পালিত	৮
রূপান্তর	সুমিত্রা রায়	৯
শ্রীমা'র মহাসমাধি	...	১১
ধ্যানের ঘরে	পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১৩
সাবিত্রী	...	১৪
বেদনয়	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৭
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী		২২
মায়ের সঙ্গে কথা	...	২৬
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৩১
দুটি কবিতা	রাত্রি রায়	৩৮
জীবনতীর্থ পণ্ডিচেরী	বিশ্বনাথ রায়	৪৮
চুকরি (কাব্য-সংগ্রহ)	বিশিকান্ত রায়চৌধুরী	৫৪

P, 7308

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: Nolini Kanta Gupta
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

১৭ই নভেম্বর ১৯৭৩

মায়ের দেহ ছিল পুরাতন সৃষ্টির অন্তর্গত। নূতন দেহের বেদী হয়েছিল তা। উদ্দেশ্য তার সার্থক হয়েছে। নূতন দেহ আসবে।

এ এক পরীক্ষা—আমরা কতখানি বিশ্বস্ত তাঁর কাছে, কতখানি সত্যসঙ্গ তাঁর চেতনার সঙ্গে।

এই দেহের পুনরুজ্জীবন হত দেহে পুরাতন সব বাধার পুনরুজ্জীবন। দেহে থেকে দৈহিক বাধাগুলির অপসারণ যতখানি সম্ভব করা গিয়েছিল আর বেশি সম্ভব ছিল না। নবতর এক রূপান্তরের জন্য নূতনতর এক পদ্ধতির দরকার হল। "মৃত্যু" সেই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।

নলিনীকান্ত গুপ্ত

বসুমতী মা,

তোমার নবদেহ পুরাতন সৃষ্টি অন্তর্গত, কারণ তুমি চেয়েছিলে তোমার সন্তানদের সঙ্গে একাত্ম হতে। তুমি চেয়েছিলে এই স্নেহ তুলে ধরবে এরই উপর গড়েছিলে যে নব দেহ তাকে, আর তোমার ইচ্ছামতো কাজ দিয়েছে সে।

তোমার সন্তানদের, বিশ্বের আহ্বান ও আস্পৃহা, প্রেম ও আত্মনিবেদন কৃতজ্ঞতাভরে নিবেদিত হল তোমার চরণে।

নলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এসেছ যদি ধ্যানের মণি, মানবতনু ধরি'
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি' ?
অলকা অরবিন্দ তুমি
শোভিলে যে ধূলায় কুসুমি'
নাশিলে কালো অলোক-আলোময় নির্ঝরি'।
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি' ?

অন্ধকারে বসুন্ধরা ছিল যে বিরহিণী
করুণ মেঘে না শুনি তব অরুণকিঙ্কিণি
এলো যে দুখদারুণ দিনে
লয় যেন সে তোমারে চিনে—
দাও গো এই নয়নবর আড়াল অপসরি'।
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি' ?

জপিয়া তব দ্যুমণি-মণি রজনী বৈরাগী
কেতনে তব চমকি' নবচেতন ওঠে জাগি'
ঘনালো যবে বেদনরাতি
গাহিলে প্রেমে তুমি প্রভাতী
মরণপারাবারে বাহিলে নবজীবন তরী
ম্লান ধরণী কী ধন দিয়ে তোমারে লবে বরি' ?

মা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এলে কি মা আজি আলো-রূপে সাজি' কালো নাশিয়া ?
এলে কি মোহিনী, প্রাণ-আরোহিণী ! ভালোবাসিয়া ?
এলে কি মা তুমি করুণা কুসুমি' অরুণ হাসিয়া।

মা, তোমারি ধ্যানে ঝংকৃত গানে চলি বিলাসিয়া
তোমারি আশায় তোমারি ভাষায় উঠি বিভাসিয়া।
এলে কি মা তুমি করুণা কুসুমি' অরুণ হাসিয়া।

বরিয়া তোমারে তবি মা আঁধারে জ্যোতি বিকাশিয়া।
এসো আরো কাছে হিয়া আজি যাচে প্রেম উছাসিয়া।
এলে কি মা তুমি করুণা কুসুমি' অরুণ হাসিয়া !

নিত্য-আবির্ভাব

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

একটি পরব ক্ষণে তিপ্পান্ন বছর আগে
নয়ন সম্মুখে মোর যে দেব-বিগ্রহ জাগে :
অতসীপুষ্পবর্ণাভা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা,
বিহসিত বিম্বাধরা মৃদুল মধুরেক্ষণা।
মুক্তির প্রতিমা মূর্ত, বরাভয়যুতকরা,
রাজরাজেশ্বরীরূপা করুণা-অমৃতঝরা,
সর্বমঙ্গলমঙ্গলা সর্বার্থসাধিকা শিবা,
শিবসমন্বিতা শক্তি দীপ্ত নেত্রে দিব্য বিভা।
মর্ত্যের মানবী মাতা অমর্তা দেবীর রূপে
বরণ করিনু তাঁরে অন্তরের গন্ধধূপে।

আজি নব অনুভব তিপ্পান্ন বরষ পরে,
অন্তরালগতা মাতা বিশ্বের কল্যাণ তরে,
ধরিয়া ধরিত্রী-ভার ছিন্ন করি মায়াজাল,
গ্রন্থিবদ্ধ স্বর্ণসূত্রে ইহকাল-পরকাল,
শাশ্বত ও সনাতন শুদ্ধ সত্যাশ্রয়নে,
মৃত্যুর মরণ লাগি যুঝিয়া মৃত্যুর সনে,
দশ দিক উদ্ভাসিয়া দশপ্রহরণধরা,
অসুরনাশিনী দেবী সর্বেশ্বরী বিশ্বম্ভরা।
সর্বগতা সর্বজয়া সর্বশক্তিকেন্দ্রস্থিতা,
নিত্য-আবির্ভাবে মাতা তিরোভাব-বিরহিতা।

অন্তহীনা

সুজিৎকুমার পালিত

অধুনা সে সনাতনী প্রাচীনার শরীর স্বরাট
অদিতির বৃংমূর্তি ওতপ্রোত মৃত্তিকা-গভীরে
স্বরূপার তাম্রদেহ ধরিত্রীর কক্ষে নগ্নলীন।

হৈমদ্যুতি বরাভয়বাণী সমাধি প্রকোষ্ঠ হতে
অচিরকালের নয়, সান্নাবেলা চলে আসে—
মানুষের মানুষীর ক্ষয়িষ্ণু প্রাকারে
নুজধারা জ্যোতিঃস্রোতস্বিনী আজ ঢেউ তোলে
নবীন বিভংগ।
হাতছানি দেহ অমা ফের ফিরে জ্যোতি
এইভাবে কতোকাল...
ব্যর্থ নয় কিংকরের সেবা।

অগ্নি ইন্দ্র প্রমুখেরা সমাগত
পৃথ্বী তাঁর মৃন্ময় শরীর নিয়ে অধুনা নিমগ্ন
প্রজ্ঞাপারমিতা শিখা পারংগম খদ্যোতের প্রায়
সংকর্ষণে দীপ্তি আনে, আনে সুধা হেন।

হিরণ্য প্রচয় হতে ঋতম্ভরা জ্যোতিষ্মতী নদী
বসুন্ধরার বুকে কল্লোলিনী এক্ষণে প্রবেগে—
যুগনদ্ধ দেশ-কাল আলো-আঁধারিতে
হোত্রী মানবক তার করপুটে ফুল ধরে রয়॥

রূপান্তর

সুমিত্রা রায়

তীরে বসে ঢেউ গুণে অন্যমনে
ভেবেছিনু সুখে আছি আপন মনে,
কখন জোয়ার আসে সাগর-বেলায়
আমারে ভাসায়ে নেয় ঢেউয়ের ভেলায়,
নাকেমুখে নোনা জল প্রাণপণে যুঝি
তীরে ফিরে যেতে চাই, ডুবি বা বুঝি,
ঢেউয়ের নাগরদোলা বড় মাতাল
হাল ছেড়ে ভয় ভুলে তালে দিই তাল,
অবাক নিজেরে দেখে—নরিনি আমি,
মাটি ছেড়ে জলে এসে জল হয়ে গেছি
জলের মতন ভেসে চলেছি নেচে
ভেঙে ভেঙে আর বার উঠেছি গড়ে।

নীড় বেঁধে বসে ছিনু বৃক্ষচূড়ে
ঝড়ে জলে ভয়ে মরি বুঝি বা পড়ে।
হঠাৎ দমকা এক হাওয়ার তোড়ে
আমারে উড়ায়ে নিল কুলায় ছেড়ে,
প্রাণপণে ধরে রই বৃক্ষশাখে
হাওয়া এসে দোল দেয় পাতার ফাঁকে,
অবশেষে ছেড়ে হাত থাকি যে ভাসি'
ভয়ডর সব ঝেড়ে মন উদাসী ;
কিছু পরে দেখি চেয়ে পড়িনি আমি
হাওয়ার হাওয়ায় ভেসে হাওয়া হয়ে গেছি।
দূরে দূরে চলে যাই তারার সনে
মাটির ফুলেরে ছুঁই আপন মনে।

বড় শীতে বসে যাই আগুনের পাশে—
ওম ওম তাপ ভালো, ছোঁওয়া না লাগে,
দূর থেকে খুশি শুধু রূপ নেহারি'
ধরা তো দেবনা, পাছে আপনা ভুলি,
কখন ঘুমের ঘোরে পায়ে পায়ে এসে
আগুন আমাকে কোলে ঘিরিয়া ধরে—
চারিদিকে চেয়ে দেখি পথ নাই আর,
সব ভুলে চোখ মেলে রূপ দেখি তার;
কিছুক্ষণ পরে দেখি কোথায় মরণ
হুতাশন মোরে শুধু করেছে হরণ—
আমার রূপেতে এক বহ্নিশিখা
লেলিহান উর্ধ্বাশী নব দীপালিকা।

শ্রীমার মহাসমাধি

১৮ই নভেম্বর ১৯৭৩। ভোর তিনটের খবর এল শ্রীমা তাঁর পার্থিব দেহ ত্যাগ করেছেন, মেডিটেশন হলে অমৃতদার ঘরের সামনে শ্রীমার দেহটি রাখা হয়েছে। পিছনের এবং দুই পাশের দেওয়ালে অভিনানদ-প্রতীক সোনালী রঙের সিল্কের কাপড়ে ঢাকা। মেঝের পুরু সাদা কার্পেট। তার ওপরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শ্রীমা রয়েছেন অর্ধ-শায়িত অবস্থায়। নুদিত নয়ন। মুখটি ঝুঁকে আছে বুকের ওপর, হাত দুটি কোলে ন্যস্ত। বাকি সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত সাদা গরদের চাদরে। শয্যার চারদিকে ছোট ছোট রেকাবিতে কর্পূর রাখা আছে। সমস্ত পরিবেশটি শান্ত, নীরব, স্বর্গীয়।

আকাশবাণীতে খবর গেল; তার ও বেতার মারফৎ বার্তা পাঠান হল ভারতের রাষ্ট্র-পতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং পণ্ডিচেরী সরকারের দপ্তরগুলিতে

"শ্রীমা ১৯৭৩ সালের ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭-২৫ মিনিটে দেহত্যাগ করেছেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হওয়াই তাঁর মহাপ্রয়াণের আশু কারণ। তাঁর শিষ্য, ভক্ত এবং জন-সাধারণের শেষ-দর্শনের জন্য তাঁর দেহটি সজ্জিত করে রাখা হয়েছে এবং যতদিন সম্ভব এইভাবে রাখা থাকবে। শ্রীমার প্রাণবন্ত বাণী বিশ্ববিশ্রুত—এক নব মানবত্বের উদয় হবে। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণতা লাভ করুক।"

এই বছরের এপ্রিল মাসের শুরু হতেই শ্রীমা যেন নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে আপন অন্তরের গভীরে পুরোপুরিভাবে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সেবা পরিচর্যা যাঁরা করতেন মাত্র সেই চারপাঁচজন ছাড়া আর কারুরই তাঁর কাছে যাবার অনুমতি ছিল না। বাহ্যিক সমস্ত কাজকর্মও তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকদিন ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করতেন কিন্তু শারীরিক কোন ব্যাধি বা অসুস্থতার সন্ধান তাঁরা পান নি। তা সত্ত্বেও শ্রীমা মগ্ন থাকতেন তাঁর অন্তর্জগতে, কথাবার্তা প্রায় বলতেনই না, এবং খাওয়ার পরিমাণ অত্যন্ত রকম কমিয়ে দিয়েছিলেন। এক একদিন তিনচার আউন্সের বেশী তাঁকে খাওয়ান যেত না। এইভাবে চলেছিল ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনও আরম্ভ হয়েছিল একই রকম ভাবে। বরং না আগের দু' একদিন কয়েক আউন্স বেশীই খেয়েছিলেন, এবং বারবার বলেছিলেন তাঁকে তুলে বসিয়ে দিতে। সকলে এটি ভাল লক্ষণ বলেই ভেবেছিল। তাই ১৭ই তারিখ সন্ধ্যায় খাবার পরে যখন মা উঠে বসতে চাইলেন, তাঁকে বসান হল এবং একটু পরে তার ইচ্ছানুসারে আনা হল অর্ধশয়ান অবস্থায়। সন্ধ্যা তখন সাতটা। অক-স্মাৎ দেখা গেল তিনি যেন শরীরটি ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ডাক্তার অবিলম্বে তাঁকে হার্ট-মাসাজ দিতে লাগলেন। কিন্তু ৭-২৫ মিনিটে তাঁর হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীমার ঘরে যারা উপস্থিত ছিল তারা ব্যতীত আর কেউই কিছু জানতে পারল না, এমন কি

সে সময়ে যারা আশ্রমে ছিল তারাও না। রাত ১১টা পর্যন্ত সব কিছুই নিত্যনৈমিত্তিকভাবে চলল। তারপর আশ্রমের দরজা বন্ধ হতে শ্রীমাকে মেডিটেশন হলে নামিয়ে আনা হল।

পরদিন ভোর চারটে থেকেই আশ্রমে জনসমাগম হতে লাগল। হাজার হাজার নর-নারী, কোলের শিশু থেকে অথর্ব বৃদ্ধ পর্যন্ত, নীরব শান্তভাবে সারি বেঁধে গেল শ্রীমার শেষ দর্শনের জন্য। হৃদয় সকলেরই শোকাকুল, চক্ষু সজল, কিন্তু কোনরকম বাহুল্য বা আতিশয্য কোথাও প্রকাশ পায় না। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা পালা করে সারা দিনরাত সেই বিশাল জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল, কিন্তু তাও একেবারেই নিঃশব্দে।

বাইরে প্রকাশ না পেলেও অনেকেরই মনে জাগছিল একটা অসহ্য সংশয়াকুল প্রশ্ন : কেন এমন হল? সবাই জানে যে শ্রীমার সাধনা দৈহিক রূপান্তরের জন্যে—জরা, মৃত্যুকে জয় করবার জন্যে। তা হলে কেন শ্রীমা দেহত্যাগ করলেন?

প্রশ্নের উত্তরেই যেন নলিনীদা দিলেন নিম্নের বাণীটি

১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৩

মায়ের দেহ পুরাতন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তা নব কলেবর হবার নয়। তা ছিল নূতন শরীরের স্তম্ভমূল। সে তার ব্রত সুচারুরূপে করেছে সমাধা। নব দেহের আবির্ভাব হবে।

এ হল অগ্নি-পরীক্ষা—মায়ের ওপর আমাদের কতদূর আস্থা ও বিশ্বাস, তাঁর চেতনাতে কতখানি সত্যনিষ্ঠ আমরা।

পুরাতন দেহের পুনরুজ্জীবনের অর্থ ঐ দেহের পুরাতন বাধা বিপত্তির পুনরুদ্ভব। শরীরের থেকে ঐ সব বাধা যতটা অপসারণ করা সম্ভব তা করা হয়েছিল তার বেশী আর করা যেত না। নব রূপান্তরের জন্য নূতন কার্যপ্রণালীর প্রয়োজন। সেই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ "মৃত্যু"।

১৯শে নভেম্বর সকাল ৯-৩০ নিঃ স্থির হল যে শ্রীমার দেহ সমাহিত করা হবে পরদিন ২০শে নভেম্বর সকাল আটটায়। সমাধির স্থান শ্রীমা নিজেই স্থির করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যখন দেহরক্ষা করেন (৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০) তখনই শ্রীমা বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সমাধির মধ্যেই তাঁর জন্যেও একটু স্থান রাখতে। তাই করা হয়েছিল—সমাধির ভিতরে শ্রীঅরবিন্দের কামরার ওপর আট ফুট গভীর একটি খালি কামরা বালি ভরে রাখা হয়েছিল। এখন সমাধির উপরস্থিত মার্বেল পাথর এবং তার তলার ভারী কংক্রীট স্ল্যাবগুলি সরিয়ে সেই কামরাটি খোলা হল এবং সমস্ত বালি সরান হল। আশ্রমের ছেলেমেয়েরাই এই কাজ করল। অন্য দিকে আশ্রমের একটি কারখানায় নির্মিত হল রোজ-উডের এক আধার—প্রায় ছয় ফিট্ লম্বা, তিন ফিট্ চওড়া এবং আড়াই ফিট্ উঁচু।

আধারের ভিতরটা মোড়া হল প্রথমে রূপার পাত দিয়ে, তার ওপরে দেওয়া হল ফেল্ট এবং সব কিছুর উপর রেশমের আচ্ছাদন। এর মধ্যে পুরু করে শয্যা পেতে চারিপাশে বালিশ দিয়ে মধ্যে শ্রীমাকে অর্ধশায়িত ভাবে শোয়ান হল। তারপরে উপরের ঢাকনাটি রেখে সব কিছু স্ক্রু দিয়ে বাতাস বিরহিতভাবে বন্ধ করা হল। এই ঢাকনার উপরে ছিল

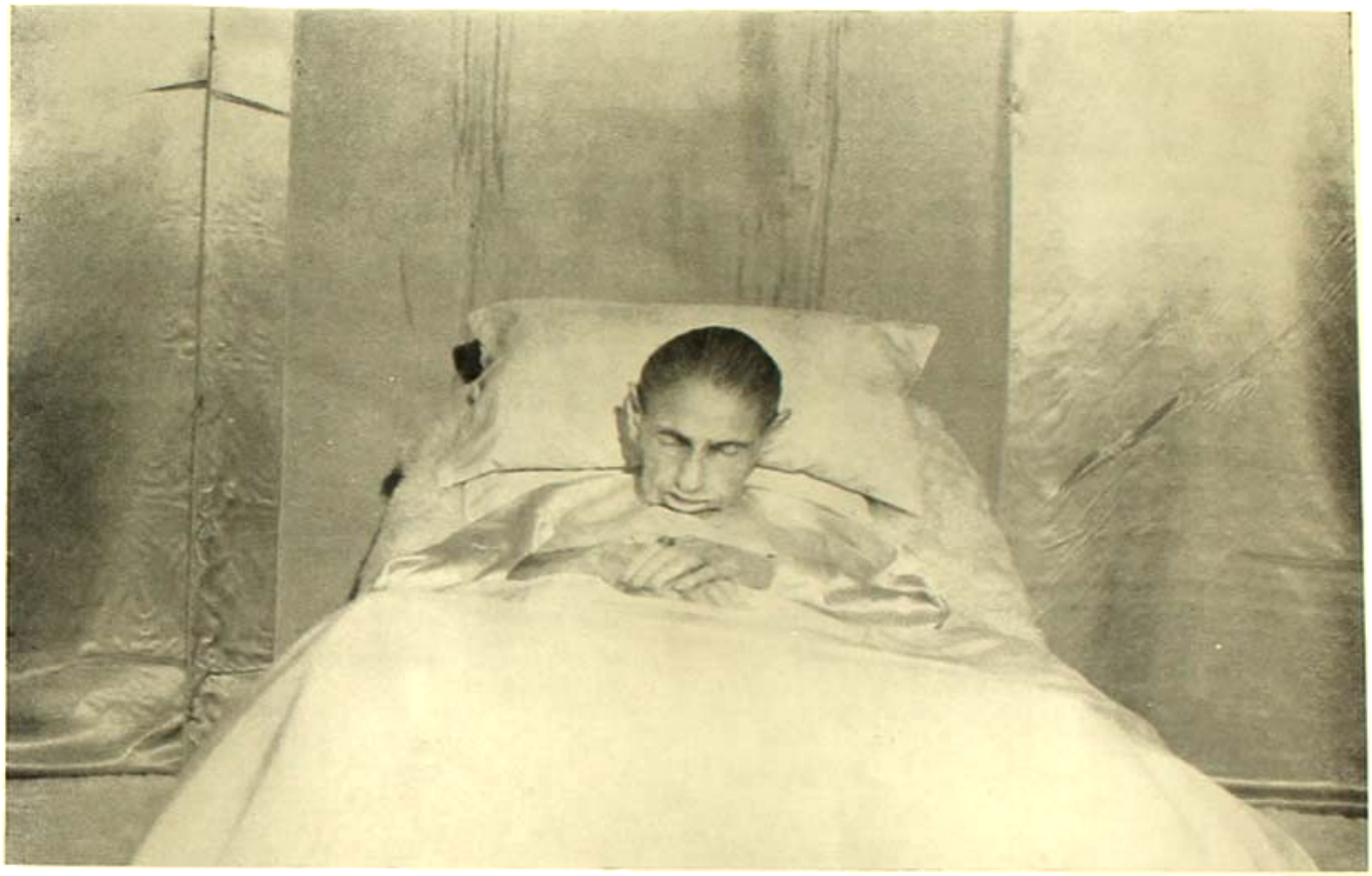

শ্রীমা

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৮ — ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৩

বিশুদ্ধ স্বর্ণ নির্মিত শ্রীমার প্রতীক। শ্রীমার সেবকরাই তিনজন ডাক্তারের সামনে এ সমস্ত কার্য সমাধা করলেন।

ভোর চারটের সময় থেকেই আশ্রমের সাধক সাধিকা এবং ভারতের চতুর্দিক হতে সমাগত অতিথিরা সমাধির চারপাশ ঘিরে বসেছিলেন নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায়। অনেকে সারা রাতই ধ্যানে কাটিয়েছেন। সকাল সাতটার মধ্যেই আশ্রমে আর তিল ধারণের স্থান রইল না। দশদিকের যেখানেই চোখ যায় খালি মানুষ আর মানুষ—নির্বাক, নিশ্চল, অপেক্ষমাণ।

সাড়ে আটটার একটু পরে আশ্রমের আটজন যুবক শ্রীমার দেহাধারটি বহন করে ধীর পদক্ষেপে মেডিটেশন হল থেকে সমাধির স্থানে নিয়ে এল। সঙ্গে এলেন নলিনীদা' প্রমুখ আশ্রমের প্রবীণেরা। ধীরে ধীরে রজ্জুর সাহায্যে সেই ভারী আধারটি এবার নামান হল সমাধির মধ্যে। নলিনীদা ও অঁদ্রেদা তার ওপর গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিলেন। এই সময় আশ্রমিক রচিত শান্ত গম্ভীর যন্ত্রসঙ্গীত ভারতীয় বেতারকেন্দ্র থেকে বাজান হচ্ছিল। এবার সমাধির উপরটি আবার ভারী কংক্রীট স্ল্যাব দিয়ে ঢাকা দেওয়া হল, এবং মিনিট দশেক ধ্যানের অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটল।

পণ্ডিচেরী সরকারের তরফ থেকে একজন মন্ত্রী এবং পণ্ডিচেরীস্থ ফরাসী প্রতিনিধি সমাধির ওপর ফুল ও মালা রেখে শ্রদ্ধা জানালেন, আর তাঁদের পরে উপস্থিত অন্য সকলে একে একে সমাধি প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করলেন। সকাল পৌনে আটটা থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও সমস্ত অনুষ্ঠানটি প্রচার করছিলেন।

———

ধ্যানের ঘরে

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

শীত নেমেছে অঘ্রাণের প্রথম রাতে, জগৎ ঝিমঝিম্,
মা নিয়েছেন সবার আগে টেনে নিজের ওপর সেই হিম,
হিম-বিদ্ধ মায়ের দেহ ধ্যানের ঘরে, ফুলেরা পায়ে ঝরে,
ধূপকাঠিরা নীরবে জ্বলে সবার চোখে দেশে-দেশান্তরে।

সাবিত্রী

২য় পর্ব—১০ সর্গ

ক্ষুদ্রতন মানসের রাজ্য ও দেবশক্তিসব

(৫)

জলন্ত সত্তা এক এল তারপর, ত্রিমূর্তির মধ্যে পরবর্তী সে
কুরঙ্গপৃষ্ঠ আরোহী রক্তাভ বন্য গর্দভের 'পরে,
দুঃসাহসী বুদ্ধিশক্তি এক ধেয়ে নেমে এল দুলায়ে সিংহকেশর তার
লোকোত্তর সেই মহান অগ্নিশিখা হ'তে ভূবণ্ডল যে রয়েছে ঘিরে
আর ক্ষুরধার করাল জিহ্বায় তার খেয়ে চলে জীবপুঞ্জমের হৃদয়।
সেখান থেকে উদ্‌গীর্ণ হ'ল কামনার লোলুপ দৃষ্টি।
সহস্র আকার ধারণ করে সে, আর সংখ্যাতীত নাম :
বহুলের, অনিশ্চিতের এষণা
অঙ্কুশাঘাতে চালিত করে তারে চিরকাল অদ্বিতীয়ের অনুসরণে
অগণিত পথ ধ'রে মহাকালের যত প্রসারে,
পার হয়ে অন্তহীন বৈচিত্র্যের যত পরিক্রমা।
দগ্ধ করে দেয় সকল হৃদয় বৈধের আগুনে।
জ্যোতিলেখা এক উদ্ভাসিত তমোঘন নদীর উপরে
প্রজ্বলন্ত উঠে চলে স্বর্গাভিমুখে, পরক্ষণে গ্রস্ত হয়ে ডুবে যায় নরকের দিকে ;
উঠে যায় সত্যকে পঙ্কের মধ্যে টেনে নাবিয়ে আনতে,
আর পঙ্কিল উদ্দেশ্যে করে ব্যবহার প্রোজ্জ্বল শক্তি তার।
বিরাট সরীসৃপ বহুরূপী এক সোনালী সুনীল রক্তিম
রূপান্তর হ'ল তার ঘন কৃষ্ণে, ধূসরে, ঘোর পাটলে,
জীবনের প্রস্থিল এক শাখা হতে ক্ষুধার্ত সে অপলক চেয়ে রয়
লোল জিহ্বায় টেনে নিতে প্রিয় ভোজ্য তার, কীট যেন আনন্দখণ্ড যত ;
তুচ্ছ আহার এই বিপুল কলেবরের,
স্বর্গবৈভবের ক্ষুধা মিটাবার তরে।
বহ্নি-ভুজঙ্গ এক, পুচ্ছ তার কালো মেঘ যেন,

অনুসরণ করে তারে সন্তানকুল তার স্বপ্নরাজি যত চিন্তার আলোকচূর্ণ ছড়ায়ে,
উন্নত মস্তকে তার দোলে ফণাসব বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত,
জ্ঞানের অভিমুখে লেহনের তরে বাড়ায় সে তার ধূমল জিহ্বা।
জলঘূর্ণি শুষে নেয় রিক্ত বাতাস,
শূন্যের উপরে প্রতিষ্ঠা করেছে বিরাট অধিকার সব,
নাস্তির মধ্যে জন্ম, ফিরে যাবে নাস্তির মধ্যে
তবুও নিরন্তর সে চলেছে অজ্ঞাতসারে
এক প্রচ্ছন্নের অভিমুখে যা হ'ল সর্বান্তি।
উদ্‌গ্রীব অনুসন্ধানে, অক্ষম ধারণে,
উজ্জ্বল চাঞ্চল্য হ'ল তার পরিচয়,
ভ্রান্তি তার জন্মগত সংস্কার, তার প্রকৃতির দিশা।
যুক্তিহীন বিশ্বাসে মনোগতি তার, সেইসঙ্গে
সবই সত্য তার চিন্তায় তুষ্ট যাতে আশা তার ;
বাষ্পসম্ভূত সোনার শূন্যকে পোষণ করে সে
অবাস্তবের দিকে সাগ্রহে বাড়ায় হাত সুভোজ্যের আশায়।
আঁধারে সে করে আবিষ্কার দীপ্ত আকার সব ;
ছায়াবৃত অর্ধ-আলোকের তলে দৃষ্ট হানে,
দেখে সে বহুবর্ণ মূর্তি সব রেখাঙ্কিত কল্পনার গুহান্তরে ;
অনুমানের রাত্রির উপর দিয়ে ঘূর্ণিপাকে ঘুরে ঘুরে চলে যায়
কল্পনার যন্ত্রে ছবি তোলে
ভাবীকালের উজ্জ্বল আশা যত ধরা দেয় চঞ্চল মশালের আলোকে,
জীবনের আকাশে রাখে স্থির ক'রে ধাবমান স্বপ্নাবলীর যত পদসঞ্চরণ,
ধ'রে রাখে অনুলিপি যত চলমান রূপাবলীর আর ছদ্মবেশী শক্তিসবের,
যার অর্ধদৃষ্ট সত্যের ক্ষণিকের আলোক-আলেখ্য।
সাগ্রহে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, অধিকার করা,
নাই যেখানে বুদ্ধি বিবেচনা, নাই অন্তর্দৃষ্টির নির্দেশ,
এই হ'ল তার আদি বৃত্তি, এই তার অবধি,
অসম্ভব অধিগত করতে গিয়ে অপচয় করেছে জীবনের শক্তিধারা :
ঋজুপথ তুচ্ছ মানে সে, ছুটে চলে অপরিচিত কুটিল পথে
ফেলে যায় অজিতকে অভিনবের সন্ধানে ;
দেখে সে অনধিগত লক্ষ্য হ'ল প্রতিমুহূর্তের নিয়তি,
পাহাড়ের খাড়া কিনারা হতে ঝম্প দেয় স্বর্গে উত্তীর্ণ হবে বলে।
জীবনের জুয়ায় দুঃসাহসই হ'ল তার রীতিনীতি,

যদৃচ্ছালাভে তার কাছে মনে হয় চিরন্তন সিদ্ধি ;
ভ্রান্তি তারে নিরস্ত করে না তার স্থির সিদ্ধান্ত হ'তে
সত্তার গভীরতর ধারার জ্ঞান নাই কোন,
ব্যর্থতা বস্তুদৃষ্টি যার শিথিল করে না ;
আকস্মিক সাফল্য এক আর সব কিছুর সত্যের প্রমাণ এনে দেয়।
শুধু প্রয়াস, জয়লাভ নয়, হ'ল জীবনের সম্বোধ।
অনিশ্চিত পণ তার নিয়ে আসে অনিশ্চিত জয়,
যন্ত্র প্রবৃত্তি হ'ল তার জনয়িত্রী, আর জনয়িতা প্রাণময় মন,
দৌড়ের খেলায় আসে সে সর্বপ্রথম অথবা সর্বশেষ।
কর্ম তবু তার নয় অকিঞ্চিৎ, নয় ব্যর্থ, নয় শূন্য ;
অনন্তের সামর্থ্যের এক অংশ পরিপোষণ করে সে
চায় সে যা আপন খেয়ালে এমন মহত্তর বস্তুসব সৃষ্টি করতে পারে সে ;
প্রাণের আবেগ তার ধারণ করে স্থির বুদ্ধিতে যা নেলে না।
প্রবেগ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে যত
সমুচ্চ স্বর্লোকের উপরে চিন্তাশক্তি যাদের লুকিয়ে রেখেছে
তার খরোজ্জ্বল কুয়াশায়,
চকিত উল্লাসে ধরা দেয় নেপথ্যের সূর্য।
শূন্যকে খুঁড়ে চলে, পায় সেখানে গুপ্ত সম্পদ।
ইন্দ্রিয়াবলীর মধ্যে তার রক্তিম হয়ে ওঠে অর্ধ-অন্তর্দৃষ্টি ;
ছুঁড়ে দিল সে বিদ্যুতের তীর, বিদ্ধ হ'ল অদৃশ্যে।
অন্ধকারে দৃষ্টি চলে তার, আলোকে পড়ে তার অনিশ্চিত পলক,
ক্ষেত্র তার অজ্ঞান, অজ্ঞেয় তার পুরস্কার।

বেদমন্ত্র

ঋগ্বেদ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—পঞ্চদশ সূক্ত

১। প্র বেধসে কবয়ে বেদ্যায় গিরস্তরে বসসে পূর্ব্যায়।
ঘৃতপ্রসত্তো অসুরঃ সুশেবো রায়ো ধর্তা ধরুণো বয়ো অগ্নিঃ ॥১॥

প্র+ভরে—নিয়ে এসেছি
বেধসে—স্রষ্টার জন্য, বিধাতার জন্য
কবয়ে—দ্রষ্টার জন্য
বেদ্যায়—জ্ঞাতব্যকে
গিরন্—বাক্যকে
প্র+ভরে—নিয়ে এসেছি
বসসে—মহিমাময়ের জন্য
পূর্ব্যায়—প্রাচীনের জন্য
ঘৃত-প্রসত্তঃ—ওজঃপ্রতিষ্ঠ (প্রসত্ত=seated in, goes forward to: Sri Aurobindo) (প্রসত্ত=প্রসন্ন সাধন)
অসুরঃ—বীর্য্যবান
সুশেবঃ—পরম সুখময়
রায়ঃ—আনন্দধনের
ধর্তা—ধারক
ধরুণঃ—আধার
বয়ঃ—সত্তার
অগ্নিঃ—অগ্নি

স্রষ্টা যিনি, দ্রষ্টা যিনি, জ্ঞাতব্য যিনি, যিনি মহিমাময় সনাতন, তাঁর জন্যে আমরা আমাদের বাক্য নিয়ে এসেছি। তিনি অগ্নি, ওজঃপ্রতিষ্ঠ, বীর্য্যবান, সুখময়, আনন্দসম্পদের ধারক, সত্তার আধার ॥১॥

২। ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পরমে ব্যোমন্।
দিবো ধর্মন্ধরুণে সেদুষো নৃন্ত্রাতৃন্নজাতাঁ অভি যে ননক্ষুঃ ॥২॥

ঋতেন—ঋতের সহায়ে
ঋতম্—ঋতকে
ধরুণম্—ধারককে
ধারয়ন্ত—ধারণ করে তারা
যজ্ঞস্য—যজ্ঞের
শাকে—শক্তির মধ্যে
পরমে—পরম
বি-ওমন্ = ব্যোমন্—ব্যোমে
দিবঃ—দ্যুলোকের
ধর্মন্—ধর্মে
ধরুণে—ধারণকর্তা যিনি তাঁহাতে
সেদুষঃ—আসীন
নৃন্—পুরুষবৃন্দকে
ত্রাতৃঃ—ত্রাত যারা তাদের সহায়ে
অজাতান্—অত্রাত যারা তাদের দিকে
অভি (+ননক্ষুঃ)—অভিযান করেছে অভিমুখে যাত্রা করেছে
যে—যারা
ননক্ষুঃ (√নশ্)—অভিযান করেছে

ধারক ঋতকে ঋতের দ্বারা ধারণ করে তারা যজ্ঞের শক্তিকে নিয়ে পরম ব্যোমের মধ্যে।
সেই সব পুরুষশক্তি যারা সমাসীন স্বর্গের ধারক ধর্ম্মের মধ্যে, তারা ত্রাতদেবতাদের সহায়ে অত্রাতদেবতাদের অভিমুখে যাত্রা করেছে ॥২॥

৩। অংহোযুবস্তনূস্তনূভে বি বয়ো মহদ্ভ্যাং পূর্ব্যায়।
স ক্রতো নবজাতস্তুর্বাংসিংহং ন ক্রুদ্ধমভিতঃ পরিষ্ঠুঃ ॥৩॥

অংহঃ-যুবঃ—পাপহর্ত্তা, পাপনিবারক
তনূঃ—তনুরাজি
বি (+তনূভে)—বিস্তার করে ধরে

বয়ঃ—বিস্তৃতি, প্রসারতা
মহৎ—মহান
দুস্তরম্—দুস্তর
পূর্ব্যায়—আদি সত্তার জন্যে
সম্-বতঃ—সমবেত
নব-জাতঃ—নবজাত
তুতুর্য্যাৎ—উত্তীর্ণ হবে, ভেদ করে যাবে
সিংহম্—সিংহ
ন—যেন
ক্রুদ্ধম্—ক্রুদ্ধ
অভিতঃ—চারিদিকে
পরি—ঘিরে
স্থু—রয়েছে

পাপহারী তনুকে তারা বরন করে, মহা বিশাল বরন করে মহা দুস্তর বিশাল বিস্তৃতি এক আদি দেবের জন্যে।

নবজাত সে ক্রুদ্ধ সিংহের মত তার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে যে ব্যূহ তা ভেদ করে যাবে ॥৩॥

৪। মাতেব যত্তরসে পপ্রথানো জনংজনং ধারয়সে চক্ষসে চ।
বয়ো বয়ো জরসে বর্দ্ধমানঃ পরি স্তনা বিষুরূপো জিগাসি ॥৪॥

মাতা ইব—মাতার মত, মাতা যেন
যৎ—যখন
ভরসে—ধারণ কর
পপ্রথানঃ—আপনাকে বিস্তৃত করে, আপনাকে সর্ব্বব্যাপী করে
জনম্-জনম্—জন্মের পর জন্ম
ধারয়সে—দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য
চক্ষসে—জ্ঞানদৃষ্টির জন্য
চ—এবং
বয়ঃ—রূপায়ণের পর রূপায়ণ
বয়ঃ— ,, ,,
জরসে—উপভোগ কর

যৎ—যদা
দধানঃ—ধারণ করে
পরি (+জিগাসি)—সর্ব্বব্যাপী হয়ে ওঠো, সর্বত্র প্রসারিত হও।
অনা—আপন সত্তা দিয়ে
বিশ্বরূপঃ—বিবিধ রূপ ধারণ করে

আপনাকে যখন তুমি প্রসারিত করে চলেছ, মাতার ন্যায় জন্ম জন্মান্তরকে বহন কর তুমি ধৃতপ্রতিজ্ঞা আর দিব্যদৃষ্টিকে লক্ষ্য করে। রূপরূপান্তর তুমি উপভোগ কর যখন তাদের আপনার মধ্যে ধারণ করে তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে ছড়িয়ে দিয়েছ ॥৪॥

৫। বাজো নু তে শবসস্পাতমন্তমুরুং দোষং ধরুণং দেব রায়ঃ।
পদং ন তায়ুর্গুহা দধানো মহো রায়ে চিতয়ন্নত্রিবম্পঃ ॥৫॥

বাজঃ—পূর্ণতা
নু—এখন, ফলতঃ
তে—তোমার
শবসঃ—বলের, সামর্থ্যের
পাতু—রক্ষা করে চলে যেন
অন্তম্—শেষ সীমান্ত, অন্ত
উরুম্—বিশাল
দোষম্—দোঁহা
ধরুণম্—ধারক
দেব—হে দেবতা
রায়ঃ—আনন্দ সম্পদের
পদম্—পদ, স্থান
ন—যেন
তায়ুঃ—তস্কর
গুহা—গুহার মধ্যে, নিগূঢ়
দধানঃ—ধারণ করে

মহঃ—মহৎ
রায়ে—আনন্দসম্পদের জন্য
চিতয়ন্—সচেতন করে, সম্বুদ্ধ করে
অত্রিম্—অত্রিকে বা আহারী বা দিব্যভোগীকে
অস্পঃ—ত্রাণ করেছ, উদ্ধার করেছ (প্রীতিসাধন করেছ, পার করেছ—
অপ্রীণয়ঃ, অপারয়ঃ—সায়ণ)

তোমার পরিপূর্ণতা তবে রক্ষা করে থাকে যেন তোমার গাম্ভীর্যের শেষ প্রান্ত অবধি যা বৃহৎ, যা সর্বকামদাতা, যা পরম আনন্দকে ধারণ করে রয়েছে। তস্করের মত আপন গুহাভ্যন্তরে সেই দিতি তুমি ধারণ করে রয়েছ, মহান্ আনন্দসম্পদের অভিমুখে দিব্যভোক্তা অত্রি ঋষিকে সচেতন করেছ, উত্তীর্ণ করে দিয়েছ ॥৫॥

P, 7308

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(Thoughts and Aphorisms)

(মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৩৩৭—অনুকরণ করাও কখনো কখনো শিক্ষাপ্রদ হয়, কিন্তু তাই বলে তা কখনো নৌপ্রধানের পতাকা তুলতে পারে না।

৩৩৮—সার্থক অনুকরণকারীর দলভুক্ত হওয়ার চেয়ে বরং উদ্ভাবন ভালো।

মা কথাটি বলা হয়েছে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কারণ প্রায় তারা সকলেই তা ক'রে থাকে। তথাপি যারা সৃষ্টা হয়, অর্থাৎ যাদের নতুন কিছু বলবার থাকে, তারা তা ঠিকই করবে।

১৩-২-১৯৭০

৩৩৯—ভগবানের ক্রিয়া খুবই জটিল। স্বয়ং অবতার হয়ে রাম যখন বালীকে বধ করলেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন সম্প্রদায়ের জন্য দুরাত্মা মাতুল কংসকে বধ করলেন, তখন তাঁরা সে কাজ ভালো করেছেন না মন্দ করেছেন তা কে বলতে পারবে? আমরা শুধু এইটুকু জানি যে তাঁরা ভগবৎ প্রেরণাতেই তা করেছেন।

মা : এখানে খুব সুন্দরভাবেই বলা হলো যে ভালোমন্দের বোধ কেবল মানুষেরই বেলাতে, ভগবানের চোখে তার কোনোই মূল্য নেই।

১৬-২-১৯৭০

৩৪০—প্রতিক্রিয়া ঘটার ফলে ভিতরকার শক্তি বাড়ে ও তা বিশুদ্ধ হয়, উন্নতির কাজ তাতে পূর্ণতর ও ত্বরান্বিত হয়। দুর্বল মানুষের দল সে কথা বোঝে না, তাদের জাহাজখানা যে ঝড়তুফানের তাড়নায় ছুটছে তাই দেখে বন্দরে পৌঁছনো সম্বন্ধে তারা নিরাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু বৃষ্টিধারা ও তুফানের আড়ালে সে জাহাজ গুপ্তভাবে ছুটে গিয়ে পৌঁছায় শেষে ভগবানেরই উদ্দিষ্ট ডেরাতে।

মা : এই কথাটি বলা হয়েছে আমাদের শিক্ষা দিতে যে আশাহীন কখনই হতে নেই, কারণ যাদের হৃদয় নির্মল ও বিশ্বাস অটল, তাদের পক্ষে আপাত পরাজয়ের ভিতর দিয়েই গুপ্তভাবে তাদেরকে বিজয়েতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

১৭-২-১৯৭০

৩৪১—স্বৈরাচারী রাজা, অত্যাচারী পুরোহিত ও জমিদারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে মানবাত্মা উদ্ভাবনা করলে প্রজাতন্ত্র ; ধনীদের ও বণিকদের পৃষ্ঠপোষিত প্রজাতন্ত্রের অত্যাচার থেকে বাঁচতে উদ্ভাবনা করেছে সমাজতন্ত্র ; আবার এখন আমলাপ্রধান সমাজতন্ত্রের জুলুমে উত্যক্ত হয়ে মানুষ এনে ফেলতে চাইছে নৈরাজ্য। ইউরোপের ক্রমোন্নতির পথে এই ভাবে এক ভ্রম থেকে অন্য ভ্রমে, এক ব্যর্থতা থেকে অন্য ব্যর্থতায় গিয়ে পড়া, এই হলো তাদের ক্রমোন্নতির চিত্র।

৩৪২—ইউরোপের প্রজাতন্ত্রের অর্থ মন্ত্রী পরিষদের প্রধানের দ্বারা শাসন, ওতে হয় কেবল যত সহকারীদের দুর্নীতির সুযোগ কিংবা সংভাবের বিধা মুখোসাধারী পুঁজি-পরিষদের স্বার্থপূরণ, আর বিক্ষুব্ধ জনগণের ক্বচিৎ তোষণ করা, ন্যায্য বিধানের নাম নিয়ে। আর ইউরোপের সমাজতন্ত্র হয়ে উঠেছে কেবল আমলাদের ও পুলিশের রাজ্য, তথাকথিত ন্যায্য বিধানের নাম নিয়ে। ওর মধ্যে কোনটি ভালো সে প্রশ্ন অনর্থক, আর কোনটি মন্দ তাও নির্ণয় করা কঠিন।

৩৪৩—প্রজাতন্ত্রের ফলে লাভের দিক থেকে যা হয়েছে তা ব্যক্তি নিরাপত্তা, অত্যাচারী ও স্বার্থান্বেষী দুর্বৃত্তদের হাত থেকে লোকের সম্পত্তিরক্ষার সুরাহা। আর ক্ষতির দিক থেকে হয়েছে মানুষদের মধ্যে মহত্বের অভাব।

বা মানুষদের তৈরি সকল গভর্নমেন্টই মিথ্যাপূর্ণ ও ফাঁকি। শুধু আশা করা যায় যে কোনো একদিন পৃথিবী শাসিত হবে কেবল সত্যের দ্বারা, যদি পরমেশ্বর কখনো মানুষদের মধ্যে সত্যের আলোক সঞ্চার করেন।

১৮-২-১৯৭০

৩৪৪—এই ভ্রান্ত মানবজাতি কেবলই স্বপ্ন দেখে যে তাদের শাসনরীতি ও সমাজনীতির সুব্যবস্থায় জগতের পরিস্থিতি নিষ্কলঙ্ক হয়ে যাবে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল ভিতরকার দোষগুলি ঘোচালেই তবে বাইরের অবস্থা নির্দোষ হতে পারে। ভিতরে তুমি যেমন হবে, বাইরে তেমনি ফলভোগ করবে। আপন সত্তার ভিতরের নিয়ম থেকে কোনো বাহ্য বিধানই তোমাকে রক্ষা করবে না।

৩৪৫—বাস্তবের কিছু আভাস বা চিহ্নমাত্রকে আঁকড়ে প্রকৃত বাস্তবের প্রতি অন্ধ হয়ে তাকে অস্বীকার করার প্রেরণা থেকে নিজেকে সতর্ক রাখবে। মানুষের দুষ্টবুদ্ধি নয় কিন্তু মানুষের ভ্রান্তিই ঘটায় যত অমঙ্গল আসার সুযোগ।

বা : কোনোরূপ আইন কিংবা শাসনরীতি আমাদের নিজেদের দোষগুলির ফলভোগ

থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে না। কেবল ভগবৎ সত্যকে মেনে চললেই সব কিছুর বাহিরে আমাদের জীবনকে সুপরিচালিত করতে পারে।

১৯-২-১৯৭০

৩৪৬—সন্ন্যাসীর বাইরের বেশকে অবশ্যই সম্মান করবে, কিন্তু সেই মানুষটি কেমন সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে, নতুবা কেবল ভণ্ডের দ্বারাই সকল তীর্থস্থান ছেয়ে যাবে, প্রকৃত সাধু বলতে কিছুই থাকবে না।

৩৪৭—অধিকাংশ লোকই চায় আপন পটুতা ও সমৃদ্ধি, খুব কম লোকই আপন প্রিয়া রূপে দারিদ্র্যকে গ্রহণ করে: কিন্তু তুমি অঁকড়ে থেকো কেবল ভগবানকে। তোমার পক্ষে তিনিই ব্যবস্থা করবেন রাজপ্রাসাদ অথবা ভিক্ষার ঝুলি।

৩৪৮—পাপ বলতে কেবল একটা অভ্যাসের দাসত্ব ছাড়া আর কি, এবং পুণ্য বলতে কেবল লোকের অভিমত ছাড়া আর কি? তুমি ভগবানের দিকে চেয়ে কেবল তাঁর ইচ্ছাতেই চলবে, তোমার জন্য যে পথ দেখাবেন সেই পথেই অগ্রসর হবে।

মা এটি সম্পূর্ণ খাঁটি কথা! ভগবান তোমাকে যেমন পথে চালাবেন সেই পথে চলতে পারাই প্রকৃত সাধুতা আর তাঁর সঙ্গে মিলিত থেকে তিনি কোনদিকে তোমাকে নিতে চাইছেন তা জানতে পারাই প্রকৃত জ্ঞান। তা ছাড়া বাকি সব কিছুই মানুষের নিজের বনগড়া সিদ্ধান্ত।

২০-২-১৯৭০

৩৪৯—জাগতিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের ব্যাপারে বিত্তবান বলে ধনীদের পক্ষও নিওনা, আবার বিত্তহারী বলে গরিবের পক্ষও নিও না, শক্তিমান বলে রাজার পক্ষও নিওনা, আবার উৎসাহী আশাবাদী বলে জনগণের পক্ষও নিওনা, তুমি থাকবে কেবল ভগবানের দিকে। কিন্তু যদি তিনি তাঁরই বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। তখন সর্বান্তঃকরণে সর্বশক্তি দিয়ে সানন্দে তুমি তাইই করবে।

৩৫০—কেমন ক'রে জানবো যে আমার বেলাতে ভগবানের কিরূপ ইচ্ছা? তার জন্য আমার নিজের অহংভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে সকল অভিসন্ধি খুঁজে খুঁজে, আমার অমলিন ও নগ্ন আত্মাকে ভগবানের অনন্ত ক্রিয়াতে নিমগ্ন ক'রে দিতে হবে, তাহলে তখন ভগবান নিজেই আমার কাছে তা উদ্ভাসিত করে দেবেন।

৩৫১—কেবল নগ্ন ও নিলাজ আত্মাই হতে পারে নির্দোষ ও নির্মল, যেমন ছিলেন মানবের আদিম উদ্যানে আদিমানব আদম।

প্রশ্ন : না, আত্মা "নিলাজ ও নগ্ন" এর অর্থ কি? আত্মা কি সর্বদাই বিশুদ্ধ নয়?

না হাঁ, শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাই বলেছেন। আত্মা কখনো ছদ্মবেশ গ্রহণ করে না; সে মানুষের বুদ্ধিবিচারকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে, কারণ আত্মার মধ্যে আছেন ভগবান, আত্মা হলো তাঁরই বিশ্বস্ত ভৃত্য।

২৩-২-১৯৭০

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪

প্রশ্ন : মা, আপনি বলেছেন (Education থেকে)—"সকল সংগঠনের ওপার থেকে এমন এক নতুন চিৎশক্তিকে আহ্বান করা যায় যা এখনও পর্যন্ত অনভিব্যক্ত, এবং যার আগমনে সকল কিছু পাল্টে গিয়ে সৃষ্টি হবে এক নতুন জগৎ।" আপনি এখানে যে শক্তির কথা বলেছেন তার অর্থ কি ভগবান?

উত্তর : কাকে বলো ভগবান? নিজে তুমি যা বোঝো তাই বলো। এই কথা নিয়ে এখানে আরো একবার আলোচনা হয়েছে।

প্রশ্ন জগতে যত যা কিছু রয়েছে সবই তো ভগবানের বিকাশ?

উত্তর : সে কথা নয়, তুমি কাকে ভগবান বলো তাই জানতে চাই। এ সম্বন্ধে তোমার নিশ্চয় একটা কিছু ধারণা আছে। যখন বলো "ভগবান", তার মানে কি হয়?

প্রশ্ন : যিনি সৃষ্টিকর্তা।

উত্তর ও তো কেবল একটা কথার কথা। সৃষ্টিকর্তা!!!

কিন্তু আমি কোথায় যেন বলেছিলাম যে নিজেরই ভিতরকার দিকের ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেককে একাত্ম হতে হবে? বুলেটিনে বলেছি। তোমার তা মনে নেই?

আর আমি অনেকবার এ কথা বলেছি যে শক্তির অভিব্যক্তির কাজ চিরদিন চলবে এগিয়ে, অর্থাৎ আজকের যুগে যা অভিব্যক্ত হলো তা হবে পরবর্তী যুগের অভিব্যক্তির সূচনা মাত্র। সুতরাং সৃষ্টির চূড়ান্ত স্থানে উঠলে দেখা যাবে এমন কিছু যা এখনও পর্যন্ত অভিব্যক্ত নয়, কারণ আরো পরে অভিব্যক্ত হবার মতো নূতন জিনিস চিরদিনই সেখানে থাকবে। আমি এই কথাই ওখানে বলেছি। যদি চেতনার সীমান্তে উঠে আপাত অভিব্যক্ত সব কিছুকে ছাড়িয়ে যেতে পারো তাহলে এমন এক শক্তির সংস্পর্শে আসবে যা এতাবৎ অনভিব্যক্ত এক বাস্তব। আর দেখবে যে চেতনার সেই সীমান্তে ওঠাও শেষ কথা নয়, তাও হবে পরবর্তী কালের চেতনাতে উঠে যাবার একটা ধাপ মাত্র, কারণ আরো পরে যা অভিব্যক্ত হবে তা এখনও প্রস্তুত নয়। সৃষ্টিতে এমনিই বরাবর চলে আসছে। (এটাই ছিল বক্তব্য।)

প্রশ্ন : মা, হতাশাকে কেমন ক'রে, দমন করবো?

উত্তর : ও। তার সোজা উপায় আছে। হতাশা আসে তোমার প্রাণসত্তাটির

মধ্যে, চেতনা যখন থাকে প্রাণসত্তার দখলে তখনই ওটা আসে। কেবল যদি তুমি তোমার প্রাণসত্তার অধিকার ছাড়িয়ে আরো গভীরতর চেতনার মধ্যে চলে যেতে পারো, তাহলে আর তখন ও ভাব থাকবেনা। এমন কি উচ্চতর ও প্রদীপ্ত মনের রাজ্যে উচ্চতর চিন্তার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলেও ওটা থাকবেনা। আর যদি তুমি তোমার চৈত্যসত্তার মধ্যে আশ্রয় নাও তাহলে হতাশা আসার সম্ভাবনা মাত্র থাকবেনা।

দুটি কারণ থেকে হতাশা আসতে পারে : প্রাণসত্তার তরফের অতৃপ্তি, কিংবা দেহ-জনিত স্নায়ুগুলির অবসাদ। দৈহিক অবসাদ থেকে যে হতাশা আসে তা সহজেই চলে যেতে পারে—পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত চাঙ্গা বোধ না করো, নয়তো হাত পা ছড়িয়ে এমনিই বিশ্রাম নাও স্বপ্নের আশ্রয়ে। আর প্রাণসত্তার যে অতৃপ্তি তা যখন অল্পেই এসে পড়ে তখন সেখানে তোমার যুক্তিবুদ্ধিকে কাজে লাগাবে ; কারণটি খুঁজে বের করবে যে কিসের দরুণ সেটা আসছে, নিজেকে প্রশ্ন করবে যে তোমার আভ্যন্তরীণ আস্পৃহার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা অথবা এমনিতেই হচ্ছে। প্রায়ই দেখবে যে ভিতরকার আস্পৃহার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, তখন অল্প চেষ্টাতেই তাকে ঝেড়ে ফেলে নিজের কর্তব্য কাজ ক'রে যেতে পারবে। এতেও যদি ফল না হয় তখন আপন গভীরের দিকে চলে যাবে, যতক্ষণ চৈত্যসত্তাতে গিয়ে না পৌঁছাও। সেখানে সেই চৈত্যকে তার কাজে নিয়োগ করবে, তাহলে হতাশা তৎক্ষণাৎ চলে যাবে।

আর প্রাণসত্তার মধ্যেই যদি লড়তে চাও, তাও হয়—অনেকেই এমন আছে যারা প্রাণসত্তার সঙ্গে লড়া পছন্দ করে—যদিও প্রকৃতপক্ষে তা খুব শক্ত কাজ।

প্রশ্ন : চৈত্যসত্তা একবার সামনে প্রকট হলে আবার পিছিয়ে ঢুকে যায়?

উত্তর : হাঁ। সাধারণত এই হয় যে প্রথমে তুমি উপর্যুপরি তাঁর সুস্পষ্ট অনুভূতি পাবে, কিন্তু পরে ক্রমশ তা মিলিয়ে যাবে, আর তখন থাকবেনা। কিন্তু তাতে ক্ষুণ্ণ হবেনা, কারণ এমনিই সাধারণত হয়ে থাকে। কিন্তু তার পরের দ্বিতীয় দফাতে তা আসবে আগের চেয়ে অনেক সহজে। আর অনতিকাল পরেই একটা সময় আসবে যখন আস্পৃহার মধ্যে একাগ্র হলেই তার সংস্পর্শ ঘটে যাবে। তা যদিও হয়তো সর্বদার জন্য বজায় থাকবেনা, কিন্তু ইচ্ছা করলেই তাকে আবার পাবে। তখন থেকে ক্রমশ সবই সহজ হয়ে আসবে। কোনো কিছু বিপদ বা সমস্যা উপস্থিত হলে, কোনো ক্লান্তি কিংবা বাধা বিঘ্ন এলে, অথবা এমনিতেই তার সঙ্গে একাত্ম হবার আনন্দ পেতে চাইলে (কারণ তার সঙ্গে একাত্ম হলেই প্রভূত আনন্দ আসে) যখনই তুমি স্থির হয়ে থেকে আস্পৃহা ও একাগ্রতা আনবে তখনই তার সংস্পর্শ সহজেই মিলে যাবে, আর সকল রকমের সমস্যাও তাতেই মিটে যাবে। কেবল স্থির হয়ে বসে একাগ্র হলেই হলো, তখনই সে এসে যাবে।

পরে এমন একটা সময় আসে যখন আর ঐ সংস্পর্শ ছেড়ে যায়না, চেতনার গভীরে থেকে সকল ক্রিয়াকে সেই নিয়ন্ত্রিত করে। তখন অনেক রকম দোষ দূর হয়ে যায়।

হতাশা, অসন্তোষ, বিদ্রোহ, ক্লান্তি ইত্যাদির বাধাগুলো আর থাকেনা। আর যদি এমন অভ্যাস করো যে নিজেকে তফাৎ ক'রে রেখে কেবল চৈত্যেরই চেতনাতে সব কিছু দেখা—সকল রকমের ঘটনা, মনের ধারণা, সকল রকমের জ্ঞান, প্রভৃতি সব কিছু—তাহলে খাঁটি রকমের নির্দেশ পেতে থাকবে কেবল ঐ "চৈত্য" থেকেই, যে কখন কি করা দরকার। অবশ্য এমন অভ্যাস আনতে পারার জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রচেষ্টা আবশ্যক।

প্রশ্ন : না, জীবনকে ছাড়িয়ে কেবল অজানার সঙ্গে একাত্ম হতে চাইলে কেবল অহংকার ত্যাগই নয়, অহং জিনিসটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়াই কি দরকার নয়?

উত্তর আবশ্যক।

প্রশ্ন : কিন্তু এই যদি আমি নিজে অজানার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলাম, অথচ জগতের অন্য সকলে যথারীতি কষ্ট পেতে থাকুক, এটাও কি অহংএর কাজ হলোনা?

উত্তর হাঁ। তাই বরাবরই ঐরকম জিনিস হচ্ছে : যারা ঐভাবে সাধনা করে তারা শেষ পর্যন্ত এই নির্দেশ পায় যে জগতের ক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে তাদের কাজ করতে হবে। অর্থাৎ যেন লোকের খোঁজা পর্যন্ত পৌঁছে তারা শোনে—"না, না, এখন নয়, ফিরে গিয়ে এখন তুমি কাজ করো। তখন যখন তৈরি হবে তখন এসো।"

এই যে জগতের সকল ঝামেলাকে এড়িয়ে পালানো, এ তো হলো পুরো অহংএর কাজ। তোমাদের সাধনাতে বলা হয়, এই এই রকম করো, পরে অন্যেরাও যদি তাই করে তখন জগতের সকল লোক মুক্ত হয়ে যাবে",—কিন্তু কেবল বিশেষ কতকগুলি বাছা বাছা লোকই তা করতে পারে। অথচ এরাই হলো জগতের কাজের পক্ষেও সবচেয়ে উপযোগী, কারণ এরা সাধারণের চেয়ে ভালো অনেক বেশি আর বহু বিপদকে অতিক্রম করতে সমর্থ হওয়ার জন্য এরাই অন্যদের ভালো সাহায্য করতে পারে। এই মানবজাতি কত বিরাট...যারা সাফল্য লাভ করে তারা তো মাত্র কয়েক শত, তাদের নিয়ে বলা হয় যে "এরাই মানুষজাতি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা তার কেবল বাছাই করা অংশ মাত্র। কিন্তু তার বাইরে বাকি-রইল যে বিপুল জনগণ, কেবল ভারতের বেলাই দেখ না কেন, যে সব মানুষ বাইরে গ্রামে গ্রামান্তরে রয়েছে, তাদের মধ্যে মুক্তির প্রচেষ্টা অথবা জাগতিক জীবনধারা থেকে উপরকার অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ করা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই নেই। এমন কি তাদের নিজেদের ভিতরকার কথা ভাববার পর্যন্ত কোনো সময় নেই। ঘোড়া গরুদের মতো লাঙলে জুতে তাদের কাজ হতে থাকে, নির্দিষ্ট খাতের থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ই নেই। তাদের কাছে গিয়ে এ কথা বলা যায় না যে "আমরা যেমন সাধনা করছি তাই তোমরা করো, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।" তাদের কাছে "আমি যেমন করছি" এ কথার মানেই হয় না। হয়তো কয়েক শত মানুষ মাত্রই তা পারে, এই পর্যন্ত:

প্রশ্ন : মা, দেহে ক্লান্তি আসে কেন? আমরা ঠিক নিয়ম অনুসারেই প্রত্যহ কাজ করি, অথচ তবু কোনোদিন বেশ স্ফূর্তি থাকে, আর কোনোদিন খুব ক্লান্ত বোধ করি।

উত্তর : ওর কারণ ভিতরকার ভারসাম্য না থাকা। তার হেতু অনেক রকম হতে পারে, কিন্তু মোটের উপর এই হয় : সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতির অভাব। আমার এও হয় যে একদিন হয়তো স্ফূর্তিযুক্ত হয়ে অনেকখানি শক্তি খরচ ক'রে ফেললে—যদিও শিশুদের বেলাতে সে কথা নয়, কারণ তারা অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত থামতে চায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়ে না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা চঞ্চলতা থেকে বিরত হয় না। দেখা যায় যে তারা কেবলই খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, এমনি করতে করতে শেষে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। এমনিভাবেই তারা বেড়ে ওঠে ও ক্রমশ মজবুত হয়ে ওঠে। সুতরাং শক্তির খরচ করাতেই যে অনিষ্ট হয় তা নয়। যেমন তার খরচ হয় তেমনি বিশ্রামের দ্বারা তার পূরণও হয়ে যায়। ক্ষতি যখন হয় তখন তা ভারসাম্য হারিয়ে কারণ তখন সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকেনা।

লোকে মনে করে যে তারা রোজ যেমন যেমন ভাবে চলছে এবং দিনগত নিয়মে যা করে যাচ্ছে তদনুযায়ী চেতনাকে একভাবে বজায় রেখে গেলেই সব কিছু ঠিক থাকবে। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। কোনো হঠাৎ কারণে তোমার সত্তার কোনো অংশ খানিকটা এগিয়ে পড়ে, চিন্তায় বা ধারণায় বা প্রাণের তরফ থেকে, তখন সত্তার অন্য সব বাকি অংশগুলি তার থেকে পিছনে পড়ে থাকে, তাই থেকেই ভিতরে একটা অসাম্য এসে পড়ে। তার থেকেই আসে ক্লান্তি বা অবসাদ। সেটা ঠিক ক্লান্তি নয় তখন তুমি চাও স্থির ও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে, যাতে সত্তার মধ্যে আবার সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতি ফিরিয়ে আনতে পারো। ঐ সময়টাতে বিশেষ দরকার হয় বিশ্রাম গ্রহণের, যা কিছু শিক্ষা পেয়েছ তা হজম ক'রে নেবার জন্য এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতির অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য।

এখন তোমরা এ কথা জানো যে দেহের ব্যাপারে মানুষ একেবারেই অজ্ঞ। ও সম্বন্ধে ঠিকভাবে কিছু বলতে পারেনা...যেমন, তুমি কি সঠিক বলতে পারো, প্রত্যেকবারের খাবার সময় তোমার দেহের পক্ষে কোন রকম খাদ্য কতখানি প্রয়োজন? শুধু এইটুকু কথা যে কতটা খেতে হবে আর কখন খেতে হবে—ঠিকভাবে তা জানোনা, কেবল অস্পষ্ট আন্দাজে বা কাল্পনিক ভাবে বা এমনই একটা ধারণা ক'রে নাও—যার সঙ্গে প্রকৃত জানার কোনোই মিল নেই। কিন্তু যথাযথ ভাবে জানা, "এই জিনিসটা এত পরিমাণে খেতে হবে, তাই আমার দেহের পক্ষে দরকার", এমন কথা নিশ্চয় ক'রে বলতে পারোনা। কিন্তু একটা একটা সময় আসে যখন তাও ঠিক জানা যায়। তবে তার জন্য বহু বছরের প্রচেষ্টা থাকা দরকার, মনের কর্তৃত্বকে প্রায় বাদ দিয়ে কেবল সূক্ষ্ম চেতনার অনুশীলনের দ্বারা, যার সঙ্গে তোমার আত্মিক উন্নতি ও রূপান্তরের সম্পর্ক রয়েছে। তেমনি একথাও যদি জানতে চাও যে দেহের ভালোর পক্ষে কতটা পরিশ্রম ও তৎপরতা ও শক্তিব্যয় করা চাই, তার কতখানি পূরণ করা যেতে পারে, খরচ এবং প্রাপ্তির মধ্যে কতটা অনুপাত হতে পারে, শক্তি ব্যয় করবার

পরে কি ভাবে তার ক্রমোন্নতি ও সামগ্রিক উন্নয়ন আনা যেতে পারে, ইত্যাদি, তাহলে তার জন্যও অনেক চেষ্টা করতে হয়। আর দৈহিক রূপান্তর ঘটাতে চাইলে তাই করাই দরকার। এর জন্য প্রথমত ভিতরকার চেতনার সঙ্গে তার পুরো সঙ্গতি আনা চাই। আর তা করতে হবে এমন কি প্রতি কোষে প্রতি রসক্রিয়াতে প্রতি তুচ্ছ ব্যাপারে। সব কিছু ছেড়ে দিনরাত তাই কেবল করা। এমন একান্ত প্রয়াস ও আভ্যন্তর দৃষ্টি সর্বদার জন্য কেউ রাখতে পারে না।

আমি তোমাদের কাছে সামান্য একটা বাহ্য দৃষ্টান্তই বললাম: হয়তো আশ্চর্য হয়েছ যে কোন খাদ্য কতটা কখন খেতে হবে তাই নাকি সঠিক জানা যায়। কিন্তু এ তো শুধু বাহ্য কথা, কিন্তু যাবতীয় কোষের সমন্বয় ও তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকতে পারলে আগত উপরের শক্তির প্রভাবে অনেক কিছুই জানবে প্রথমত, তুমি কি জানো তোমার ভিতরকার বিভিন্ন কোষগুলি ও তাদের বিভিন্ন ক্রিয়া কেমন, তাদের সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা কেমন? বলতে পারো কি যে কখন তুমি ক্লান্ত আর কখন তা নও? যদি হঠাৎ কিছু বিগড়ে যায়, বলতে পারো কি যে অমুক কারণে তাই ঘটেছে?...লোকে ডাক্তারের কাছে যায় কেন? কারণ তারা ভাবে যে ডাক্তার তাদের দেহ পরীক্ষা করে বলে দেবে যে কী দোষ হয়েছে—ন্যায্য কথা না হলেও এতেই সবাই অভ্যস্ত! কিন্তু কে নিজেরই ভিতরটা দেখে বলতে পারে যে কোথায় কি বিগড়েছে এবং কেন তা বিগড়েছে? অথচ তা হলো শুধু পর্যবেক্ষণের কাজ কিন্তু তারও পরে জানা চাই যে কেমন ক'রে তাকে স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরিয়ে আনতে হবে, সে কাজ হলো আরো বেশি কঠিন।

কিন্তু এগুলি হলো রূপান্তরের গোড়ার কথা। ব্যস, এই পর্যন্ত।

—শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(৩৩)

অদ্বৈততত্ত্বে অবস্থিতি সাধনার উদ্দেশ্য। জ্ঞানযোগের আলোচনায় সেই অদ্বৈত-জ্ঞান ও অদ্বৈত অনুভবের পূর্ণতা প্রসঙ্গে গোড়ার কথাটাই দেখেছি পুরুষ ও প্রকৃতি আর তাদের যুগনদ্ধতা হাতের এপিঠ ও পিঠের মতই অচ্ছেদ্য এক তত্ত্ব। তাই বহুত্বের জ্ঞান নিয়ে যদি শুরু দেখি, আরম্ভ করি, শেষ পর্যন্ত একত্বে তার সমাপ্তি —আত্মজ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে সর্বত্রই ঐ আত্মানুভবের এককে পাওয়ার মতই একত্বকে খোঁজা একসূত্র পাওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে।

সাধারণ বুদ্ধির বিচারে কখনও সবের মধ্যে এককে দেখি, আবার কখনও দেখি এমন বহু বৈচিত্র্য যা কিনা এক বলে বোঝা যায় না। কিন্তু চিন্তাধারা যখন গুছিয়ে আসে, তখন বুদ্ধি স্বচ্ছ হয় দৃঢ় হয়; তখন বুঝতে পারা যায় যে একও যেমন দেখছি বহুও দেখছি। একের দিকে দিলে বহুকে দেখি না, আবার বহুকে দেখতে গিয়ে হয়তো এককে হারিয়ে ফেলি। তাই এমন একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য অবস্থার কথা মনে হয় যেখানে যুগপৎ এক ও বহুকে দেখা সম্ভব হয়। আত্মানুভবের দিকে এই দর্শন আত্মজ্ঞান আপন আত্মায় একত্ব অনুভবের গাঢ়তায় আত্মদীপটি যেমন জ্বলছে দেখতে পাই, তেমনিই বিশ্বের দিকে সেই দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখি বহুর সমাহার ব্রহ্মতত্ত্বে, বৃহতে সেই দীপ বিস্ফারিত—যুগপৎ একই বহু এবং বহুই এক, সে সবই তিনি, সঃ। এ তত্ত্ব সব কিছুর অনুভব ব্যাপ্ত করে এবং তাও ছাপিয়ে ঊর্ধ্বে। সেই তত্ত্বদৃষ্টিতেই ব্রহ্মের বা ভগবানের তিনটি বিভাব দেখা দেয়, এক ব্যক্তি, বহু নিয়ে বিশ্ব, এবং বিশ্বাতীত। বিশ্ব ছাপিয়ে ব্যক্তি ছাপিয়ে বিশ্বাতীত নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব স্ফুরিত হয়, "তত্ত্বভাব প্রসীদতি"। পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখে সচ্চিদানন্দের দার্শনিক আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। তাঁর সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি কেমন করে কী ভাবে হয়, বুঝে দেখার চেষ্টা করব এবার।

দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে আমি বা ব্যক্তিবিশেষ, এই ব্যক্তি এক নয় বহু, সে-সব নিয়ে বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত এমন কোন তত্ত্ব—জীবজগতের দিক দিয়ে ত্রিপুটিকে এই রকম করে দেখা হয়। এইরকম করে "পুরুষ" বলে আত্মার অনুভব হলে পরে, তার যে তিন প্রকার দেখানো হয়েছে, তার পরিভাষা ক্ষর পুরুষ অক্ষর পুরুষ ও ক্ষরের অতীত ও অক্ষরের চেয়ে উত্তম পুরুষ। তিনিই গীতোক্ত পুরুষোত্তম। অক্ষর পুরুষ সুমেরু, অকোভ্য এক তত্ত্ব, কিন্তু যিনি অক্ষর তিনিই ক্ষরণ করেন—"ক্ষরত্যক্ষরম্"। বাউল বলেছেন—

"টলে জীব না টলে ঈশ্বর
দুয়ার মাঝে খেলা করে রসিক শেখর।"

গীতায় বলেছেন পুরুষোত্তম, সেই পুরুষোত্তমকে "দেহে অস্মিন্" অনুভব করতে করতে 'তিনি' হয়ে যেতে হবে, এই হল সমগ্র জীবন নিয়ে সমগ্র দর্শন। সেই তাঁকেই জীবে ব্যক্তিতে প্রকাশিত হতে দেখার সাধনাই দিব্যজীবনের সাধনা।

পুরুষ হলে তার গুণ ও ক্রিয়া আছে ; একদিকে দৈবী সম্পৎ আর দিকে আসুরী সম্পৎ, প্রকৃতিতে থেকে জীবের মধ্যে এই গুণলীলা চলে। এই রজোগুণ ও তমোগুণ নিয়ে একটা বিক্ষোভের অবস্থা লেগেই আছে। সুষুপ্তিতে এ বিক্ষোভ স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই সুষুপ্তি যদি জাগ্রতে আনা যায়, তাহলে জীবন শান্ত ও প্রসন্ন হয়। এই কথাটাই জ্ঞানযোগের সমগ্র অংশের গুরুত্বপূর্ণ দিক, কেননা আমাদের সত্তার সত্য অনন্ত জ্ঞান একেই প্রতিষ্ঠিত। "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম", তারপর আনন্দ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ অনন্ত হলে ব্রহ্ম আর খণ্ডিত হলে জীব। তাই, আমাদের সত্তার সত্য ঐ অনন্ত আলো জ্ঞান সামর্থ্য আনন্দ সব নিয়ে যে পরম একরস অবস্থা, তাতে প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য হয়। আর আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য এই কারণেই হওয়া উচিত এমন এক উন্নত দার্শনিক জ্ঞানের উপায় আবিষ্কার করা যাতে, আমরা যে অন্ধকার অজ্ঞান দুর্বলতা দুঃখ ও খণ্ডতার অধীন প্রকৃতির গুণলীলায় সংঘর্ষমূলক পৃথক পৃথক সত্তার বহুত্বের জ্ঞানে আবদ্ধ হয়ে আছি, সেই প্রমাদ থেকে ঐ সত্যজ্ঞানের আলোয় বাস করতে সমর্থ হই। আবার এরকম সিদ্ধান্ত যদি হয় যে, প্রকৃতির গুণলীলায় গুণের সংসর্গে সংঘর্ষ ও বৈষম্য থেকে মুক্তির উপায় নেই তাহলে গুণক্রিয়ার বন্ধনমুক্ত হয়ে গুণাতীত অবস্থায় এক প্রশান্তির স্থির ভূমিতে বাস করাই যুক্তিসঙ্গত। সত্য যদি হয় স্থাণু স্থির, তাহলে অস্থিরতা চঞ্চলতা অসত্য এইভাবে দুই দিক ও দুটি মেরু দেখা দেয়। এই রকম নির্গুণ ব্রহ্মে ওই স্থাণু সুষুপ্তির ভাব কল্পিত। রামানুজ কিন্তু বলেছেন ব্রহ্ম অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন। সেখানে গুণক্রিয়া স্তব্ধ নয়, শুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত, এইভাবেই আবার ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ আর স্বরূপ লক্ষণ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন অন্ধদের হস্তীদর্শন যেমন। সেটা হল তটস্থ লক্ষণে দেখা, আর চোখ মেলে যে দেখেছে, সেই বলতে পারে কি দেখলাম কি বুঝলাম। সাক্ষাৎ অনুভবই স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সৎচিৎ আনন্দ, এর সঙ্গে অনন্তের যোগ। প্রতিটি জীবেই সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি তত্ত্বই আছে, কিন্তু জীবের সান্ত দৃষ্টি অনন্তকে ধারণা করতে পারে না, কেননা তার চিত্তবৃত্তি সাধারণত বহির্মুখ, তা দিয়ে এ ধারণা স্পষ্ট হতে পারে না। তাই এই বহির্মুখী চেতনাকে স্তব্ধ করতেও অন্তরাবৃত্তির প্রয়োজন। যান্ত্রিক ভাবে নিদ্রায় সে কাজ হয়। সেজন্য সমনস্ক ও সচেতন ভাবে ওই নিদ্রাকেই জাগ্রত চেতনায় নামানোর কথা বলা হয়েছে। গভীর চিন্তায় ও মননে অন্তরাবৃত্তির আভাস মেলে। সীমাহীন দেশ ও শাশ্বত কালের বোধ আনতে হলে অন্তর্মুখ হতেই হবে।

বৈদিক ঋষিরা শিক্ষা দিয়েছেন আকাশ-ভাবনা—অসীম আকাশ মেলে রয়েছে দেখ আর বারবার তাই ধারণা করার অভ্যাস কর, আকাশ হয়ে যাও। তারপর দেশ তার মধ্যে সূর্য জ্বলছে তা থেকে কালজ্ঞান হবে। অনন্ত দেশ অনন্ত কাল বা অনন্ত শক্তি—এ থেকে

তোমার মধ্যে যে অনন্তের ধারণা হয় তাও দেখ জানো, তার মধ্যে প্রবেশ কর। তার মধ্যে প্রবেশ করলে যা পাই তাই জাগ্রতে যেমন বাহিরে বস্তু, তেমনি ভিতরে হয় ভাব (Ideal)। চেতনার গতি এইভাবে দ্বিমুখী একটা অন্তরাভিমুখী বা নিবৃত্তি আর একটা বহির্মুখী প্রবৃত্তি। শুধু বস্তু নিয়ে চেতনার কারবার হয় না। বাহিরের শক্তিকে যদি এরকম গুটিয়ে আনতে পারি, ভেবে চিন্তে যদি করি, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাই সামান্য প্রত্যয়ে, তখন আর শুধু ভাব নয়, তা হয় ভাবক (Ideal)। আমরা যখন দুঃখের নিবৃত্তি চাই, আমাদের চিন্তায় (Thought) আরও ভাল জগৎ গড়ে তুলি। যোগচিত্তে এই হল যোগ এবং তার বিজ্ঞান। বাস্তবে যা পাইনা বা ধরতে পারি না, চিত্ত অন্তর্মুখ একাগ্র করে তাকে যখন পাই, অন্তরে তার ভাবমূর্তি গড়ে তুলি। সেটা বস্তু শক্তি। আধুনিক কালের বস্তুবাদী চিন্তাবিদগণ এটা উপেক্ষা করতে চাইলেও এটাই করে থাকেন।

চিত্ত অন্তর্মুখ করে কাম্যবস্তুকে অন্তরে ফুটিয়ে তোলার স্বপ্নে আনন্দ-বিষাদাদি বৃত্তির উদ্দীপন দেখে প্রাচীনেরা এটা ধরতে পেরেছিলেন। তাই ভাবকে যোগচিত্তে বাস্তব প্রত্যক্ষ করে তুলে ক্রমে তাকে তীব্র সংবেগ দ্বারা বাইরে সৃষ্টি করার ক্ষমতা আত্মবীর্য বা যোগবীর্য দ্বারা সম্ভব হয়। আরও গভীরে তলিয়ে গেলে এর মূলে দেখা যাবে সর্বেশ্বর সর্বযোনি সুষুপ্তিস্থান পুরুষ, তিনিই যোগশক্তির চরম, সেই শূন্যতাতেই পূর্ণতার বীজ। এই ভাবে জাগর হতে স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে গিয়ে যে জাগ্রত ভূমি, তা থেকে সচ্চিদানন্দের অনুভব। বাহিরের জীবনে তাকে ঠিক ধরতে পারি না বলেই অন্তরে সেই স্থিতি চাই। আর এই জন্যই চাই ধ্যানচিত্ত। সচ্চিদানন্দকে জানতে বুঝতে হলে ওই ধ্যানভূমিতে যেতেই হবে। আর কিছু না হ'ক আত্মধ্যান করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তাও যদি না হয়, তাহলে "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এই ভাবের অনুশীলন করা চলে। এই ভাবে চলে জ্ঞানযোগে অহন্তা অস্মিতা ও অস্তিতার ক্রমিক ভূমি-পরম্পরা দেখানো হয়েছে। এগুলি সত্তেরই বিভাব। অন্তরে মগ্ন হলে দেখি গভীর শান্তি পাই। শুধু আমি আছি, এই অনুভব থেকেই জাগে তিতিক্ষার শক্তি। অক্ষোভ্য স্থিতিমানসের সেই শক্তিই আধারে স্থৈর্য নিয়ে আসে, তার সঙ্গে শান্তি আর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা এসে যায়। তখন যা মনে করি তা করবই (stubborn will) এই শক্তি জেগে ওঠে।

তাহলে দেখছি অহন্তা থেকে অস্মিতা আসে এবং তা নিয়ে যায় "পাকা আমি"তে। এইভাবে সৎব্রহ্মের বোধ এবং তারই গাঢ়তায় শুদ্ধ এক অস্তিতার বোধ, তিনি আছেন, আছেন "বিশ্বভুবনম্ আবিবেশ"। আমার মধ্যে যখন তাঁকে দেখি, ওই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, যিনিই "অধূমক জ্যোতি, ঈশান ভূতভব্যস্য", তখন এ আমিটা আর থাকে না। এইরকম বিমূর্ত ভাবনায় প্রতিদিন নিজেকে শূন্য করে স্থির থাকতে পারলে, আত্মচৈতন্য জাগ্রত থাকে। আলোর ধর্মই তো প্রকাশ, ছড়িয়ে পড়া। সে তো শুধুই স্থির হয়ে জ্বলে না, আলো দেয়, তাপ বিকীরণ করে। শুধু প্রকাশ নয় ক্রিয়াশীলও। এই হল জ্ঞানের ধর্ম। "অস্তি ইতি উপলব্ধব্যম্" শুধু এই অস্তিতা বা আছি, এই প্রত্যয়ের উপলব্ধিতেই তিতিক্ষার শক্তি

শান্তি আর আনন্দ। এইভাবে গোটা পুরুষকে নিতে হবে বুঝতে হবে; "অস্তি ভাতি প্রিয়" তিনি। এই 'ভাতিতে' নিত্যবর্তমান চৈতন্য, চিদ্‌ব্রহ্মের কথা আসে। বেঁচে থাকার যে আনন্দ, উপনিষদের ভাষায় প্রাণারাম, তা কি এই চিৎসত্তা নয়? ঘুমের মধ্যে জেগে থাকলে এ অবস্থা বোধগম্য হয়। জাগ্রতে তার অনুশীলন করলে হয় যোগনিদ্রা, আর সেই সুষুপ্তি প্রশান্তি নিয়ে বিচরণ করলে হয় জাগ্রৎ সমাধি। যেমন গীতা বলেছেন:

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী....

যেখানে সর্বভূতের নিশাকাল, সেখানে সংযমী জেগে থাকেন, তার অর্থ হয় এই। গোরক্ষপুরের গম্ভীরনাথ এই অবস্থার উদাহরণ বলা যায়। তিনি গম্ভীর পুরুষ, তাঁর জাগ্রৎ আর সুপ্তি একসঙ্গে ছিল।

তখন মন উড়ে যায় হালকা তুলির মত। সাধারণ মন বিষয়ানুসঙ্গে থাকবার বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছিটকে ছিটকে পড়ে। কিন্তু ওই চঞ্চল মন গুছিয়ে আসে, তখন বৃহত্তের অনুভবে চিত্ত শান্ত হয়। মনের চঞ্চলতায় যেমন জীবনের সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু মন যদি শান্ত ও প্রসন্ন থাকে, তাহলে কোন সমস্যাই সমস্যা বলে বোধ হয় না। গভীর শান্তি স্বচ্ছ ব্যাপ্তিবোধ আর বিরোধের আত্যন্তিক অভাব মনোভূমিতে এই সচ্চিদানন্দের অনুভব। বিরাট তরঙ্গটিতে শ্রীঅরবিন্দ আবার অন্য দিক দিয়েও এটা দেখেছেন। চৈতন্য বলতে সাধারণত আমরা শুধু মনের চেতনাই বুঝে থাকি, তাই বলে থাকি, আমি নিদ্রিত মূর্ছিত বা বেহুঁশ ছিলাম বলে চেতন ছিলাম না। কিন্তু চেতনাকে শুধু মন দিয়ে বুঝি, এও ভুল ধারণা। প্রাণ তো সর্বদাই আছে, গভীর নিদ্রায় মনশ্চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণ জেগে থাকে। এ ভাবে দেখলে বোঝা যাবে, সত্তা ও চৈতন্য সহব্যাপ্ত (Co-existent) ওতপ্রোত।

ব্রহ্ম যখন সত্তামাত্র, তাতে ক্রিয়া নাই অর্থাৎ চৈতন্য নাই, এ যদি বলা হয়, তাহলে পাই জড়, সাংখ্যের প্রকৃতি, এ-ই হল মনের সংস্কার নিয়ে দর্শন। মন ফাঁকা নিষ্ক্রিয়, তাই শক্তিও বিলুপ্ত মনে হয়। কিন্তু চৈতন্য জগতের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে বর্তমান; এমন কি মাটিতেও তিনি নিগূঢ়স্থিত। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তা মানতে নারাজ। বোধিজ প্রত্যয় না হলে এ সমস্যা মেটে না। সাংখ্য ন্যায় বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন, এ সব দর্শনে দেখা যায় যেখানে সব কিছু লোপ পেয়ে গেল, সেখানে সত্তা থাকে বটে কিন্তু চেতনা থাকে না। এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়া এক নির্বিশেষ চৈতন্যের অবস্থা।

কিন্তু যেখানে গেলে ব্রহ্ম জড় হয়ে যায়, সেখানে গিয়ে ফিরে এলে তবে ব্রহ্মসত্তাকে বোঝা যাবে, তার পূর্বে নয়। সেই রামকৃষ্ণদেবের উপমা মনে পড়ে যে, দেয়ালের ওপারে কি আছে জানি না। কোন রকমে উঠে যদি দেখিও, মুখে বলতে পারি না। হা হা করে পড়ে যাচ্ছি, কে বলবে? মুখে ব'লে সেই গাঢ় অবস্থা বলাও যায় না, কোনরকমে কেউ বলে, ভারি মজা ইত্যাদি। ব্রহ্ম সৎ ব্রহ্ম চিৎ ব্রহ্ম আনন্দ, তাকে যদি বুঝতে চাই, সেই পূর্বের ধারাটি বুঝে চলতে হবে—প্রশান্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে দিয়ে প্রাণারাম মন-আনন্দ আকাশ-

শরীর ব্রহ্মই যে সত্য আত্মা তা বুঝতে হবে ; সেই স্থির উৎস পর্যন্ত যেতে পারলে তা থেকেই সব বেরিয়ে আসছে, তা দেখা যাবে ; বোধে আসবে এই জড়ব্রহ্মই ব্রহ্মশরীর।

কিন্তু এই আমার মধ্যে চৈতন্য কি ভাবে কতদূর থাকে জানতে চেষ্টা করলে অন্তরাবৃত্ত চেতনায় নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে সচ্চিদানন্দকে বোধে জানলাম, এই psychological process যেমন আছে, তেমন আছে বিশ্বমন নিয়ে তাঁকে জানা। অবচেতন অচেতন এই ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যাকে অচিত্তি (unconscious) বলা হয়, তা থেকেই উদ্ভিদ পশু মানুষ এই ভাবে চেতনার উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি ঘটেছে। কিন্তু একেবারে নিরেট জড়ের মধ্যে চৈতন্য আছে কি নেই, এ প্রশ্ন দার্শনিক এলাকার বাইরে। দুদিক দিয়েই এর উত্তর খোঁজা হয়েছে। জড়ের মধ্যে চৈতন্য আছে কিনা বুঝতে যেখানে বোধ অধিকতর স্পষ্ট যেমন আমার এই দেহ, সেখানে দেখতে হবে, এই যে দেহবোধ, তাতেই প্রাণ হল, মন হল। তখন বুঝি জড়ের মধ্যে প্রাণের আর প্রাণ-মনের বিকাশ হচ্ছে। শরীরের ক্রিয়া ও তার প্রভাব চৈতন্যের উপরই পড়ছে। যে অবস্থি আমার শরীরের বোধে আসে, তার ক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক পূর্বে। অন্নময় পুরুষ অন্ন থেকে রস টেনে নেন, তিনি বেছে নিতেও পারেন। কিন্তু পশুর মধ্যে এই আহার-বিচার যতটা সহজাত, মানুষ সে ভাবে সহজে তা পারে না। অথচ যখন গরমিল হয়, তখন সবটাই গড়বড় হয়ে যায়, শরীর-ক্রিয়ার সে কতটুকু বোঝে?

কিন্তু মনের যে আলাদা করে দেখার ক্ষমতা আছে, সেই মনকে নিয়ে সাধনা করে তার অজ্ঞতা অন্ধতা বা খণ্ডদৃষ্টি যদি দূর করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ এই 'মন' বা 'মানস' কথাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিমানসে (Supermind) নিয়ে গেছেন। এই মনের অতিমানসে রূপান্তর পূর্ণযোগের সার কথা। তিনি বলেছেন Thought the Paraclete, এই তত্ত্বটি বজায় রেখে যজমান মন সাধনা দ্বারা দৈবচক্ষু লাভ করতে পারেন, তখন অতিমানস দর্শন (Vision) গুলি খুলে যেতে থাকে। যৌগিক উপায়ে অনেক কিছু জানা যায়। যেখান থেকে সব কিছু আসছে, সেখানে বসে বসে কে যেন সব গড়ছে, সেসব যোগজ মনের প্রত্যক্ষ হয়। তখন বুঝতে পারি, জড়ের মধ্যে রয়েছে চিন্ময় মন। যেমন করে অন্নময় পুরুষ আমার এই দেহকে রেখেছেন, তেমন করে সব জড়বিশ্বকে ব্রহ্মশরীর বলে দেখতে যদি পাই, সে দেহ তিনিই দেখছেন, ঠিক করে রেখেছেন। তাদাত্ম্যবোধ থেকেই যুক্তি আসে। ব্যাষ্টিচৈতন্য নিয়ে যে বিশ্ববোধ, তাই আকাশ-শরীর বা মহাবিদেহ ভাবনা। এই কারণে বলা হয় যে দেহ সম্বন্ধে সংস্কারগুলি আগে কাটাতে হবে, দেহকে বোধে পর্যবসিত করার অর্থ ভূতশুদ্ধির সাধনায় যেমন করার ব্যবস্থা আছে। সূক্ষ্মদেহের বোধ যেখানে প্রাণ টগ্‌বগ্‌ করছে তা হল শিশুর দেহের মতই, নমনীয় উছলে পড়া দেহের স্বাস্থ্য নিয়ে সেখানে আপনাতে আপনি থাকা। বিকার বা ব্যাধি এলে আময় ও তা না থাকলে অনাময় ; সে অবস্থায় দেখা যায় দেহবোধটাও জ্বলছে। মন দিয়ে চিন্তা করা নয়, এ হল দেহের অণু পরমাণু দিয়ে চিন্তা—আর তখন দেহ আর মন একাকার হয়ে

যায়। যেমন কিনা বলা হয় যে, ভগবানের নাম করতে করতে নামের আগুন দেহে সঞ্চারিত হয়।

উপমা দেওয়া যেতে পারে, তপ্ত করলায় আগুন ধরে যাবার মতই তখন যেন সবটাই দেহ হয়ে মনে, দেহপ্রাণ মনের ভেদ তখন চলে যায়, সবটাই আগুন। এমন কি, যে মাটিতে আগুনটা হয়েছে তাকে ও পারিপার্শ্বিককে তপ্ত করার মত সেই অবস্থায় দেহবোধ লঘু হয়ে যায় ক্রমে ক্রমে, দেহপ্রাণমনে একাত্মতায় সমস্ত দেহটাই তাই হয়ে যায়, তখন দেহটা দিয়েই ভগবানের ভাবনা—দেহটা তাপ হয়ে ব্যাপ্ত হতে থাকে। এইরকমভাবেই জড় ভাব থেকে চেতনার ব্যাপ্তি ধরা যায়, উর্ধ্বের দিকে গেলে উচ্চচেতনস্তরে পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বব্যাপী বোধ হতে হতে বিরাটপুরুষের ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে। পৃথিবী থেকে দ্যুলোক পর্যন্ত সেই অগ্নি দীপ্তিমান, আর তারই এক একটা কণা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। তা সে কোথাও বা মহাপুরুষ সব দেবস্বভাব, আবার কোথাও বা অসুরস্বভাব পুরুষ সব। আবার চেতনার ব্যাপ্তি নিয়েই যদি সাধনা শুরু করা যায়, তাহলেও শেষ পর্যন্ত ভূলোক হতে দ্যুলোক পর্যন্ত তা পরি-ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এই রকম চৈতন্যের ব্যাপ্তি ও বিদেহধারণায় যে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ও নৈপুণ্য, সে বুদ্ধি বিশারদী। সব ছাপিয়ে ব্রহ্মের সৎ চিৎ বিশুদ্ধ করে দেখতে পারলে তাই আনন্দ। আমাদের মধ্যে চৈতন্য যেমন কুণ্ঠিত, আনন্দও তাই। তাই দুঃখ তারই দান। দুঃখকে চৈতন্যে প্রোজ্জ্বল রেখে সত্তাকে প্রসন্ন রেখে দেখলে মনে হবে তাকে স্ফুলিঙ্গ, তখন সমুদ্রে যেন আগুন ধরে যায়।

উপনিষদে ব্রহ্মানন্দের গভীরতা ও প্রশান্তি বোঝাতে আনন্দবোধকে শতগুণ করে করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে কি ভাবে সে আনন্দের ধারণা করতে হবে। সত্তার শান্তি যার চৈতন্যের দীপ্তি থাকলে বেদনা (দুঃখবোধ) একটা বিবাদী সুরের মত লীলাচ্ছলেই যেন সুরশরীর নির্মাণ করে, একটা orchestra-র মত সুরসঙ্গতি তৈরী হয়। তখন যেটাকে বিরোধ বলে দেখি, সেখানে আসবে বৈচিত্র্য। কমলের দলগুলি সব মেলে ধরার মত জীবনে পৃথিবীতে আনন্দের রূপোল্লাস। এই রকম করে দেখতে পেলে সৎচিৎ আনন্দ এই তিনকে পাই আকাশ সূর্য আর পৃথিবীতে সৃষ্টি সুখের উল্লাস, তারপর বল "আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

আকাশ অন্তরীক্ষ আর প্রাণ পেলাম "যা জ্যোতিরেতি"। দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষ সব দেখি আলোময়, আলোয় একেবারে পরিপূর্ণ। তারপর দেখি সব কিছু সেই আলোয় আনন্দে জ্বলছে হাসছে, আবার স্বপ্নের মধ্যে দেখি জ্বলছে হৃদয়ের প্রদ্যোত। এই তিন অবস্থায় যদি বুঝতে পারি যার দেখতে পাই, তাহলে বুঝতে কোনও বাধা থাকে না। আত্মানুভবের পথ ধরেই মনোবিজ্ঞানের তথা বিশ্বমনের রহস্য আবিষ্কার করে করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে অধিকার ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। প্রাচীনেরা যাকে বলেন স্বারাজ্যসিদ্ধি তা থেকে আসবে সাম্রাজ্য সিদ্ধি।

এই সচ্চিদানন্দের অনুভব অতীতে বহু ছিল, আবার ভবিষ্যতের হবে। সবটাই

অনুভবের পরমসনন্ময়ী অনুভবের কিন্তু তা হওয়া চাই অন্তরাবৃত চেতনায়। না হলে ব্রহ্ম তো আছেন, তাঁকে বিশ্ববোধে এবং আত্মবোধে না পেলে আমার কি হল? তখন প্রশ্ন ওঠে, এই যে ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মত জীবনবৃত্ত, এখানে তাকে কি অনুভবে পেতে পারি? তরঙ্গে তরঙ্গে এখানে সমুদ্রের অস্তিত্ব, ক্ষণে ক্ষণে শূন্যবোধ, এতে সৎ কোনটা? ভাঙাগড়ার দিক দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, এখানে সৎ কোথায়? আর তখনই আমরা মনের দিকে ফিরি, দেখি সেখানে সব অস্থির আর আমরা তখনই 'নেতি' 'নেতি' করতে থাকি। এইভাবে যদি সবই শূন্য করে ফেলতে পারি, যখন বুঝি কিছুই থাকে না, সেই শূন্যের অনুভবেই তো আমি থাকি, যেমন কিনা গভীর নিদ্রায়। তার অনুভব পাই এক গভীর শান্তি, আরাম তৃপ্তি। তাহলে আমি যেখানে শান্তিতে সার্থক, যেখানে সব লয় হয়ে যায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা করণও কিছু থাকে না, সেটাই তো যথার্থ আমি। এইবার ধ্যানে বসতে পারি। তাঁকে নিয়ে তাঁতেই থাকা। তিনি অচঞ্চল এক বৃহৎ নিবিড় প্রশান্তি, তিনি আলো চেতনায় ঝলমল, তিনি উদ্ভাসন রস। সব মিলিয়ে তিনি আনন্দ অনন্ত অসীম, এই অববোধে আত্মারও স্বরূপ।*

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

দুটি কবিতা

রাত্রি রায়

বাংলা সাহিত্যে সাধক কবিদের যে বিপুল ঐতিহ্য বর্তমান, বিশ্বের অনেক সাহিত্যেই তা দুর্লভ। প্রাচ্যে আমরা ফারসী এবং আরবী সাহিত্যে উচ্চমানের মরমীয়া কাব্যের নিদর্শন পাই। সুফী কবিদের কাব্যের এবং অধ্যাত্মদৃষ্টির প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা মরমীয়া কাব্য বোধকরি লক্ষণীয়। ইংরাজী সাহিত্য পঠন-পাঠনে লভ্য যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার একথা বলতে পারি যে এই বিষয়ে ইংরাজী কাব্য বাংলা কাব্যের কতকটা কাছাকাছি আসতে পারে। ইংরাজী কাব্যে বহু মরমী কবির সন্ধান আমরা পাই সকলের কথা এখানে বলা বোধকরি সম্ভব নয়। ডান (Donne), ভন (Vaughan), হার্বার্ট (Herbert), ক্র্যাশাও (Crashaw), ব্লেক (Blake), হপকিন্স (Hopkins) এবং আলোচ্য কবি টমসন (Thompson) এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কবিদের মধ্যে এলিয়টের কাব্যে এই বিশিষ্ট অধ্যাত্মচেতনার ধারা কিছু পরিমাণে বর্তমান, যদিও একশ্রেণীর সমালোচক তাঁকে যথার্থ mystic বা মরমী কবি আখ্যা দিতে নারাজ।

বাংলা কাব্যে সাধক কবি বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে কেবল ভন, ক্র্যাশাও, ব্লেক, হপকিন্স, এ. ই. ও টমসনকেই সাধক কবি বলা যায়। কেবলমাত্র এঁদের মধ্যেই একটা সংশয়হীন, নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয়ে স্বাভাবিক ভক্তিরসে অনুপ্রাণিত কাব্যের দিশা মেলে। ডান হার্বার্ট ও এলিয়টের মধ্যে একটা সংশয়াচ্ছন্ন, সংঘর্ষমূলক তার্কিক কবিমানস এবং অন্তে সংশয়ের সগৌরব পরাজয় লক্ষণীয়। বিশ্বাস-ভক্তির সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত কবিমানসের এই দ্বন্দ্ব এতই বলিষ্ঠভাবে এরা অনুধাবন করেছেন যে আমরা সচরাচর এই দ্বন্দ্বকেই কাব্যিক প্রাধান্য দিই এবং মনে করি আধ্যাত্মিক কাব্যের ক্ষেত্রে এটা বুঝি অপরিহার্য্য। অপরপক্ষে, সুফী এবং বাংলা মরমীয়া কাব্যে এই দ্বন্দ্ব বিস্ময়জনকভাবে অনুপস্থিত। আমাদের দেশে মরমী কবিরা জন্মসাধক। রূপকঅর্থে বলা যেতে পারে তাঁদের সংশয়হীন ভক্তির কাছে পরাজয় ঘটেছে ভগবানের বার বার। দরবেশ, আউল, বাউল, সাঁই কবিদের মনে সংশয়ের লেশমাত্র পাই না।

শ্রদ্ধেয় ব্রেমন্ড (Abbé Bremond) উক্তি এখানে স্মরণীয়—কবি হ'লেন পথভ্রষ্ট যোগী ; কবিতা যতই প্রার্থনার পর্য্যায়ে আসে ততই তা বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। আমাদের সাধক কবিরা যোগী, কিন্তু পথভ্রষ্ট নন। তাঁদের কাব্যও তাই প্রার্থনার রূপান্তর। কবি নিশিকান্ত সেজন্যই এই অমূল্য ঐতিহ্যকে বহন ও পুনর্নবায়িত করেছেন আপনার কাব্যে।

আলোচনার পরিসর স্বল্প করবার জন্য বেশী উদ্ধৃতি সংযোজন করলাম না। সামান্য পরিচিতির পর টমসন এবং নিশিকান্তের এক একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করলে আমার

বক্তব্য বোধকরি পরিষ্কার হবে। এ কথা বুঝি বাংলা এবং ইংরাজী সাহিত্যে যার সমান অনধিকার তার পক্ষে এধরনের আলোচনার প্রয়াস ধৃষ্টতামাত্র। কবি নিশিকান্তের তিরোধানে বাংলা কাব্যের একটি বিশেষ দিক অপূরণীয় ভাবে শূন্য হয়ে গেল কেবলমাত্র এই বোধই আমাকে তাঁর কাব্যের সহিত নূতনভাবে পরিচয় লাভে প্রবৃত্ত করেছে। প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ কিন্তু বোধহয় অবশ্যকর্তব্য।

"হিরণ্ময় সিংহ ও মর্ত্যের হরিণ" কবিতাটি তাঁর "দিগন্ত" কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত। সঠিক রচনাকাল না থাকায় মোটামুটিভাবে এ কথা বলা যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে আসার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ তাঁর কবি-জীবনের মধ্যবর্তী কালে কবিতাটি রচিত হয়েছিল। কবির প্রকাশিত অধিকাংশ কবিতার মত এটিও একটি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতির (বোধ নয়) উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভের জন্য অগ্রসর হওয়ার সময় অকস্মাৎ এই অলৌকিক অনুভূতি বা দর্শন লাভ তাঁর হয় যে শ্রীঅরবিন্দ হিরণ্ময় সিংহে রূপান্তরিত হয়ে তাঁর প্রতি ধাবমান হচ্ছেন এবং কবি নিজেকে একটি ভীরু পলায়নপর হরিণে রূপান্তরিত হতে প্রত্যক্ষ করলেন। বুদ্ধিজীবী সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা অনধিকারচর্চা। আধিদৈবিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার জন্মগত ক্ষমতা কবি ব্লেকের মত নিশিকান্তেরও ছিল। কবিতাটি পাঠ করে দিলীপকুমার রায় কবিকে প্রসঙ্গতঃ টমসনের Hound of Heaven নামক কবিতার সঙ্গে এই কবিতার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন। কবি নিশিকান্তের কাছে তৎপূর্বে টমসনের নামও অজানা ছিল। এটা কবির নিজের স্বীকৃতি। সুতরাং এই কবিতাটিতে টমসনের প্রভাবের কথা অবান্তর প্রসঙ্গ মাত্র। আবার উল্লেখ করতে বাধ্য হ'লাম নিশিকান্তের অধিকাংশ কবিতাই এই ধরণের অলৌকিক দর্শন ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অপর পক্ষে "Hound of Heaven" টমসনের কবি-জীবনের বোধকরি প্রধানতম কীর্তি। বাস্তবিকপক্ষে, কাব্যরসিকরা টমসনকে Hound of Heaven-এর রচয়িতা হিসাবেই শুধু জানেন। এখানে সুধী পাঠক হয়ত আপত্তি করতে পারেন যে একজনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থক ও দুর্লভ কবিতার সঙ্গে অন্যের অপেক্ষাকৃত সুলভ কবিতার তুলনা প্রকৃত সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু যেখানে দুইটি কবিতার বিষয়বস্তু ও লিখনশৈলীর মধ্যে সাদৃশ্য এত পরিস্ফুট, সেখানে এ ধরণের আলোচনা বোধকরি সঙ্গতভাবেই লোভনীয়। বলা বাহুল্য টমসন ও নিশিকান্তের কবিকৃতির সামগ্রিক বিচার এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়।

টমসনের পর অনুরূপ মরমী কবি (অবশ্য A.E. বাদে) আর আমরা ইংরাজী কাব্য-জগতে পাই না। এলিয়ট বা ইয়েটসকে এই প্রবন্ধের মাপকাঠি অনুযায়ী, সঙ্গতভাবেই, যথার্থ মরমী কবি বলা যায়না। টমসনের এই কবিতাটিও তার কাব্যজীবনের মধ্যভাগেই লেখা। কোনও অধ্যাত্মঅনুভূতির উপর এটি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কি না তা বলা কঠিন। অধ্যাত্ম-অনুভূতি তাঁর আদৌ হ'ত কিনা তা আমরা জানি না। তবে নিঃসন্দেহে এই কবিতাটিতে তাঁর ভাগবত জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। আর, আশ্চর্য্য প্রাণবন্ত এই কবিতাটি

পাঠ করলে এই ধারণা মনে দৃঢ়বদ্ধ হয় যে এ ধরণের কবিতা পুরাপুরি কল্পনাভিত্তিক হওয়া সম্ভব নয়। কবিতার পশ্চাতে, প্রত্যক্ষভাবে না হোক অপ্রত্যক্ষভাবে, কিছু অলৌকিক অনুভূতির রসদ আছে এবং পাঠকের মনে এই বোধের স্বতঃস্ফূর্ত উদয় কবিতাটির সাফল্য এবং উৎকর্ষের একটি মাপকাঠি। এখানে ঈশ্বর কবির পশ্চাদ্ধাবী একটি বিশাল স্বর্গীয় সারমেয়। পলায়নপর কবি নানাভাবে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে ধাবমান সারমেয়-রূপী ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে ঐশ্বরিক প্রেমের শিকার হ'লেন। টমসনের এই সুদীর্ঘ কবিতায় (১৮২ পংক্তির) মধ্যে একমাত্র শীর্ষকে ছাড়া অন্য কোথাও "Hound" কথাটি ব্যবহৃত হয় নি। কবি নিশিকান্ত কিন্তু আলোচ্য কবিতাটিতে "সিংহ" কথাটি প্রতি স্তবকের ধ্রুবপদে (refrain) এবং তাছাড়া আরও অনেক স্থানে ব্যবহার করেছেন।

এই দুই কবির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের আলোচনা এবারে তাঁদের কবিতার লিখন-শৈলীর মধ্য দিয়ে করা যাক। বিষয়বস্তুর এই আশ্চর্যজনক মিল ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দুটি কবিতাই অতিমাত্রায় সঙ্গীতধর্মী বা musical। টমসনের কবিতার কয়েকটি ছত্র শুনা যাক—

With thy young skiey blossoms heap me over
From this tremendous Lover!
Float thy vague veil about me, lest He see!

এই সুদীর্ঘ কবিতার যে কোনও ছত্রেই এই ধরনের সঙ্গীত-মাধুর্য্য বর্তমান। সমগ্র কবিতায় ছন্দের সুললিত গতি ক্বচিৎ ব্যাহত হয়েছে। প্রারম্ভেই ছন্দের দ্রুত গতি লক্ষণীয় কবি মানসের দ্রুতধাবনেরই অনুকার—

"I fled Him, down the nights and down the days;
I fled Him, down the arches of the years;
I fled Him, down the labyrinthine ways
Of my own mind;"

গতির এই দ্রুততা আগাগোড়া সমহারে নেই। অপেক্ষাকৃত মন্থর ছন্দের ধ্বনি আমরা পাই, যেমন—

Ah! must—
Designer Infinite!—
Ah! must Thou char the wood ere thou canst
limn with it?

হতাশ জিজ্ঞাসার যতি মন্থর ছন্দ এখানে প্রতিটি শব্দের পরে পাঠককে স্বল্পমাত্রার যতি টানতে বাধ্য করবে। ছন্দের দ্রুততার এই আকস্মিক পতনের সঙ্গে তাল রেখেই কবিতাটি আবার আরও বেশী দ্রুত সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠেছে—

My freshness spent its wavering showers i' the dust;

And now my heart is as a broken fount,
Wherein tear-droppings stagnate, spilt-down ever

সঙ্গীতমুখরতার (musicality) আতিশয্য আবার পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। কবিতার সাঙ্গীতিক মাধুর্য্য নিশ্চয়ই একটা অপরিহার্য্য গুণ কিন্তু আবার মধুতে লিপ্তপক্ষ হয়ে মৌমাছি তার উড্ডয়ন-ক্ষমতা হারাতে চায় না। কবিতা যেখানে সুরলালিত্যের আতিশয্য দিয়ে সমালোচকের সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে মোহগ্রস্ত করতে চায় সেখানেই হয় কবিতার বিপদ। বহু রোমান্টিক কবির মধ্যে এই ধরনের আতিশয্য প্রায়শঃই অসহনীয়। শেলী (Shelley), পো (Poe), সুইনবার্ণ (Swinburne) প্রমুখ অনেক কবিরই বিপদ ঘটিয়েছে এই রকম অত্যধিক সুরমাধুর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস। উদাহরণ এখানে অনাবশ্যক। এবার নিশিকান্তের কবিতায় ফিরে আসা যাক। নিশিকান্তের এই কবিতায় কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও ছন্দ মন্দগতি হয় নি। তাই গীতোচ্ছ্বাসের অবধা প্রাবল্যও নেই। শুনুন তাঁর সুরু—"নন্দন-অরণ্য হ'তে হিরণ্ময় সিংহ ছুটে আসে"
এই একটি ছত্রই চিত্তে শিহরন জাগিয়ে দেয়। "নন্দন-অরণ্য" ও "হিরণ্ময় সিংহ" এই দুটি দীর্ঘায়িত শব্দের পরেই ক্রমানুযায়ী হ্রস্ব "হতে" ও "ছুটে আসে" শব্দের প্রয়োগে আমরা সিংহের বলিষ্ঠ দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পাই। এই ছত্রটিই ধ্রুবপদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপ সাড়া জাগায় টমসনের ধ্রুবপদও—

But, with unhurrying chase,
And unperturbéd pace,
Deliberate speed, majestic instancy,...
Came on the following Feet

ছন্দের সুচারু প্রয়োগ কাব্যকে কতটা উর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে উপরের উদ্ধৃতিগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আরম্ভের দ্রুতগতি নিশিকান্তের সবগ্র কবিতায় অব্যাহত

এ নর্ম্ম চিরিয়া চলে তার তপ্ত স্বর্ণবর্ণ আলো
সে সুন্দর, সেই ভয়ঙ্কর,
দেহের কঙ্কালগুলি
শিখাসম ওঠে জ্বলি
শিরা উপশিরা জ্বলে বহ্নির কিরণে
নন্দন-অরণ্য হ'তে...

অগ্নিময় এই ছন্দের কাছে টমসন নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েন। কোথায় পড়ে থাকে তাঁর "tear-drippings" ও "sighful branches"। অবশ্য এখানে বিদগ্ধ পাঠক আপত্তি করতে পারেন যে রসশাস্ত্রঅনুযায়ী, সমালোচকের পক্ষে টমসন ও নিশিকান্তের কবিতা থেকে পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মী উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত নয়—যেমন উপরে দেওয়া হয়েছে টমসনের কবিতার অশ্রুপাত ও নিশিকান্তের কবিতার বহ্নি-বিভাস। কিন্তু তাঁরা

ও রূপকল্পের ভেদবিচারের উদ্দেশ্যে ত উদ্ধৃতিগুলি উপস্থাপিত করা হয় নি। ছন্দের বৈচিত্র্য প্রদর্শনই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। নিশিকান্তের কবিতার ছন্দ আগাগোড়া সমান গতিতে ধাবমান। টমসন সে প্রচেষ্টা করেন নি। Musical unity বা সাঙ্গীতিক সামঞ্জস্য যদি কাব্যিক উৎকর্ষের পরিচায়ক হয় তাহলে নিশিকান্তের কবিতাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর। আর একটি কথা, নিশিকান্তের কবিতায় ছন্দ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা বিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা আদৌ সম্ভব এবং সঙ্গত নয়। ছন্দ তাঁর কবিতায় প্রকাশসৌষ্ঠব মাত্রই নয়, তা রসসৃষ্টির প্রধান ধারক।

ভাষার কারুকার্য দুটি কবিতাতেই সমপর্যায়ের। ধ্বনি ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষা টমসনের কবিতায় সর্বত্র বর্তমান—

Even the linkéd fantasies, in whose blossomy twist
I swung the earth a trinket at my wrist
Are yielding;

তিনি আশ্রয় চাইলেন—

By many a hearted casement, curtained red,
Trellised with intertwining charities

সেই ভয়াবহ ধাবমান প্রেমিককে এড়াবার জন্য কবি সকলকে প্রলোভন দেখিয়ে আশ্রয় চাইলেন। কিন্তু তাদের traitorous trueness (বিশ্বাসঘাতক সততা ?), তাদের loyal deceit (বশংবদ ছলনা ?) তাঁকে আশ্রয়ছাড়া করল। Oxymoron-এর অনবদ্য প্রয়োগ ! Transferred epithet এর মত Oxymoron-এর প্রয়োগও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (অন্তত: আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায়) ভাবের যাথার্থ্য প্রকাশের চেয়ে কাব্যের সৌন্দর্যবর্দ্ধনেই মুখ্যভাবে ব্যবহৃত হয়। টমসনের ক্ষেত্রে কিন্তু তার সার্থক ব্যতিক্রম ঘটেছে—ভাবের যাথার্থ্য বর্ণনেই এর আশ্চর্য্য দুরূহ সার্থকতা। এদিকে দেখুন নিশিকান্তের ভাষা—ঘন মেঘের মধ্যে দুর্নিরীক্ষ্য বিদ্যুতের সঞ্চার—

অবনীবনের বক্ষে অন্তরার চেতন ধরিয়া
সে প্রেমিক চলে মোর সাথে
উজ্জ্বল অতন্দ্র আঁখি
মেলি রাখে মোর লাগি
গহন পন্থায় মোর বৈদূর্য্য বিকাশে।

এই ঘনপিনদ্ধ অলঙ্কার-অনুপ্রাসের ঐশ্বর্য্য কিন্তু কখনও গুরুভার হয়ে ওঠে নি। অনুভূতির বৈপুল্য এবং প্রখরতা এই রকম ভাষাকেই যেন তার উপযুক্ত বাহন হিসাবে পেয়েছে। আবার শুনুন কবির প্রার্থনা—

তামসের অজগর দীর্ণ হয় তোমার আলোতে
হে ভাস্বর, হে বীর কেশরী।

অসুর শার্দূলে ধরি
দাও ছিন্ন ভিন্ন করি
সর্ব অঙ্গ লহ তার তব সর্বনাশে।

প্রথম ছত্রতেই অতি উচ্চমানের স্বার্থক ভাবের ব্যঞ্জনা (ambiguity) নিহিত রয়েছে। রাত্রির নিদ্রাগ্রস্ত তমসা দূর হয় সূর্য্যের কিরণে। আবার কবির "হিরণ্ময়" সিংহের নখরেও বিচ্ছিন্ন হয় তমোরূপী নাগ। যথার্থ কবির হাতে pun কত উচ্চস্তরে পৌঁছায় তার একটি চমৎকার উদাহরণ পাচ্ছি শেষ ছত্রটিতে। "সর্বনাশ" কথাটি এখানে প্রচলিত অর্থ অতিক্রম করে গভীরতর অভিধা এনেছে। "সর্বনাশ" এখানে হিরণ্ময় সিংহের নয়, অসুর-শার্দূলের। এই কথাটি হিরণ্ময় সিংহের সকল অশুভনাশী শক্তিকে সূচিত করেছে।

এবার রূপকল্পের কথা। টেনিসনের কবিতা থেকে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। কবি প্রকৃতির সঙ্গে যেন সাযুজ্য লাভ করেছেন—

I laughed in the morning's eyes.
I triumphed and I saddened with all weather,
Heaven and I wept together.

আবার সন্ধ্যা নামল ধরণীতে—

I was heavy with the even
When she lit her glimmering tapers
Round the day's dead sanctities.

প্রবন্ধের পরিসরের স্বল্পতা বজায় রাখার জন্য ভাবসমৃদ্ধ এই সব রূপকল্পের বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হ'লাম না। রূপকল্পের এই সমৃদ্ধি টেনিসনের কবিতার সর্বত্রই বিদ্যমান। মহাকালের প্রচ্ছন্ন দুর্গপ্রাকার থেকে উত্থিত তূর্য্যনিনাদ কবি শুনছেন—

.. ever and anon a trumpet sounds
From the hid battlements of Eternity;

নিঃসন্দেহে এই ধরনের রূপকল্প টেনিসনের কবিতায় এনেছে একটা অপূর্ব গরিমা। আবার কোনও কোনও জায়গায় সন্দেহও হয়—ধ্বনি ও রূপকল্পের প্রয়োগের দ্বারা কবি আমাদের মনে সংস্কারানুগ সাড়া (stock response) জাগাবার প্রয়াস করেন নি ত? যেমন পূর্বে উদ্ধৃত একস্থানে দেখছি বসুধা যেন কবির মণিবন্ধলগ্ন অলঙ্কার যাকে তিনি কল্পনার পুষ্পগ্রথিত শিকলে দোলাচ্ছেন। প্রশ্ন জাগে, কেন এই কষ্টকল্পিত ছবি, যা গদ্যে রূপান্তরিত করলেই প্রাণহীন, আড়ষ্ট হয়ে পড়ে? "linkéd fantasies", "blossomy twist" শব্দগুলি শুনে মোহিত হয়ে অনেকে বলবেন—"অত চুলচেরা বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন নেই মশাই।" কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে উৎকৃষ্ট রূপকল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়—অন্ততঃ পাঠকের মনে—বিশ্লেষণেই। বিশ্লেষণ যে

শুধু রূপকল্পের অপকর্ষ প্রতিপন্ন করতেই ব্যবহার করা উচিত এ ধারনা প্রবাদক। প্রবন্ধ ক্রমশঃ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে এই আশঙ্কায় টেনসনের কবিতায় এই ধরনের আরও কয়েকটি কষ্টকল্পিত রূপ-কল্পের উদাহরণ দিতে প্রতিনিবৃত্ত হচ্ছি।

এবার নিশিকান্তের কবিতায় ফিরে আসা যাক—

"কণ্টক ভূমির 'পরে
চরণের রক্ত ঝরে
সেই রক্ত উন্মুক্তির পুষ্পসম হাসে"

পরের তিনটি ছত্রেই কবি এই উপমাকে বিস্তৃত করেছেন

"মুক্তির মঞ্জরী সে যে, সে আমার গতির গোলাপ
যত যাই তত ফুটে ওঠে
স্পর্শে তার লুপ্ত হয় এ ধূলার ম্লান অভিশাপ।"

প্রথম তিনটি ছত্র পাঠ করার অব্যবহিত পরেই মনে সন্দেহ জাগতে পারে—এখানে কি সংস্কারানুগ সাড়া জাগাবার অপচেষ্টা রয়েছে? কিন্তু পরের তিনটি ছত্র এ সন্দেহের জাল ছিন্ন করে দেয়। এ যে প্রগাঢ় ভাবসমৃদ্ধ উপমা! এ ধরনের দীর্ঘায়িত উপমার প্রয়োগ কেবলমাত্র অত্যন্ত শক্তিশালী কবির পক্ষেই সম্ভব।

কবি ত ভীরু হরিণ। তাই তিনি বলেছেন—

"আমার কস্তুরীগন্ধ
জাগায় তব আনন্দ
আকাঙ্ক্ষার ধূপ জ্বলে তোমার উল্লাসে"

একটি কথা। যে ধরনের রূপকল্প নিশিকান্তের কাব্যের আকর্ষক বৈশিষ্ট্য, আলোচ্য কবিতাটিতে তার নিদর্শন নেই। সেজন্যই আমি এই কবিতাটিকে নিশিকান্তের সর্বপ্রধান বা সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলি নি, যদিও নিঃসন্দেহে এই কবিতার রূপকল্প খুবই উচ্চমানের।

গঠনশৈলীর দিক দিয়ে বিচার করলে নিশিকান্তের কবিতা টেনসনের কবিতা থেকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর। নিশিকান্তের কবিতার প্রতিটি স্তবক ছন্দ, মিল সব দিক দিয়েই এক অন্যের অনুরূপ। টেনসনের কবিতার প্রতিটি স্তবক বিভিন্নভাবে গঠিত। Metrical unity বা ছন্দ সামঞ্জস্যের অভাব টেনসনের কবিতার প্রসাদগুণকে অবধারিতভাবে খর্ব করেছে।

কিন্তু কবিতার গঠন ত কেবলমাত্র ছন্দসামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে না। বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারার কল্পনা, বিন্যাস ও ক্রমবিকাশও কবিতাকে গঠিত করে। Thematic structure-এর দিক দিয়ে বিচার করলে টেনসনের কবিতা শ্রেষ্ঠতর। তাঁর কবিতায় একটি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য আছে যা আমরা নিশিকান্তের কবিতায় পাই না। টেনসন নানাভাবে নানা কল্পিত অবস্থার বর্ণনায়—এই কবিতাটিতে আমাদের বিচিত্র আনন্দ পরিবেশন করেছেন। বহুপলবিশিষ্ট স্ফটিক যে ভাবে বিভিন্নদিক থেকে আলো বিচ্ছুরণ করে তেমনই

কবি তাঁর পলায়নকে বিচিত্র পটভূমিতে লীলায়িত করেছেন। কখনও তিনি ফেরারী আসামী ঘারে ঘারে আশ্রয়প্রার্থী, কখনও তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হয়ে আত্মগোপন করতে চাইছেন, কখনও অশ্রুপ্লুত হতাশ অবস্থায় হৃদয়ঙ্গম করছেন যে এই মর্ত্যজীবনে কিছুই পাবার আশা করবার আর তাঁর নেই। অতি বিচিত্র এই পটভূমির পরিবর্তন। নিশিকান্তের কবিতায় ঘন গঠনে এত বৈচিত্র্যের অবকাশ নেই, এত চমকপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা নেই। এই বৈচিত্র্যহীনতা কিন্তু একঘেয়েমীর নামান্তর নয়। গভীরভাবে বিচার করলে এই বৈচিত্র্যহীনতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হয়। অবশ্য এই তাৎপর্য-পূর্ণতা কাব্যিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলে মনে করলে ভুল হবে। টমসনের কবিতায় বিচিত্র পরিস্থিতির বর্ণনার ইন্দ্রজাল আমাদের মুগ্ধ করে এবং সচরাচর এই সুললিত, সুকল্পিত সুষ্ঠু কবিতার মূল বক্তব্যের প্রতি আমাদের উদাসীন করে তোলে। অপর পক্ষে, নিশিকান্তের অধ্যাত্ম অনুভূতি এতই স্পষ্ট ও সজীব যে তিনি সেটিকেই বার বার প্রকাশ করেছেন। চমক-প্রদ বর্ণনার মধ্যে তিনি আদৌ যান নি। দুর্ভাগ্য এই যে এই ধরনের অনুভূতির যাথার্থ্য পাঠকের মনে সঞ্চারিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। Mystic কবিতার প্রধান বাধা এইখানেই। নিশিকান্ত এইটি করবার প্রয়াস করেছেন কিন্তু টমসনের মত বর্ণনার সাহায্য তিনি নেন নি। অবশ্য টমসন যে ভাব সঞ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছেন তা মরমী কবিতানুরাগ আধিদৈবিক বা অতিপ্রাকৃত নয়, বরং পুরোপুরি নন্দনরসাশ্রিত। সেজন্যেই বৈচিত্র্যে তাঁর কবিতা এত মনোহর।

একটি ক্ষেত্রে দুটি কবিতায় বৈসাদৃশ্য দেখি। সেটি হল কবির দৃষ্টিভঙ্গীতে। টমসন আগাগোড়াই পলাতক। কেবল শেষ স্তবকে ১৭৭তম পদে অবশেষে কবি জিজ্ঞাসা করছেন—

Is my gloom, after all,
Shade of His hand, outstretched caressingly?

তারপরেই ঈশ্বরের করুণাঘন আহ্বান পাই—

Rise, clasp My hand, and come.

এইটেই শেষ ছত্র। কবির আত্মসমর্পণ অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিশিকান্তও পলাতক। কিন্তু এই পলায়ন লীলায়নে ধ্বনিত। কবি যেন আনন্দের সঙ্গে "তাহারে ঘুরায়ে ঘুরি বিবর্তিয়া দিবা বিভাবরী"। তিনি বলছেন—

আমি ধাই বিদ্যুতের মত ;
বন্ধুর বঙ্কিত পথে রঙ্গভরে দুলাই তাহারে
আমি ধাই বিদ্যুতের মত।

আমাদের, এবং সম্ভবত: কবির, ওষ্ঠে মৃদু হাসির আভাস পাই। টমসন তাঁর ভয়াল প্রেমিকের কথা বলছেন—

(For, though I knew His love Who followed

Yet was I sore adread
Lest, having Him, I must have naught beside);

ভাষার আড়ষ্টতা যেন মনের কুণ্ঠারই পরিচায়ক। নিশিকান্তের মনে কেবল একবারই প্রশ্ন জেগেছে. "সে কি মোরে ভালবাসে?" তাঁর মনে ক্ষণিক সংশয় আছে। তাঁর মনে হয়—

আদিত্য-দর্শনে তার বিলম্বিয়া জীবন-বাণীরে
তারে করি আত্মসমর্পণ
মনে হয়, তবু মনে
জাগে ভয় ক্ষণে ক্ষণে
ভুলে যাই সে আমারে কত ভালবাসে।

তার পরেই পাই আবাহন—

তুমি মোর পরে
যুগ যুগ লক্ষ্য রাখি চলো
নৃগয়ায় যাত্রা তব এ ধরায় শুধু মোর তরে।

এখানে লক্ষণীয় এই যে কবিই আহ্বায়ক; টমসনের কবিতায় ঠিক এর বিপরীত সুরটিই পাই। এর পরই পাই সেই উদার অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ—

এ বন্ধন ধ্বংস করো
আমার সর্বস্ব হরো
আমারে বাঁচাও তব মৃত্যুঞ্জয়-গ্রাসে।

এই উদার আবাহন টমসনের কবিতায় কোথাও পাই না। বরঞ্চ তিনি ঈশ্বরকে এড়িয়ে, নানাখানি হয়েছেন, কেননা তাঁর মনে শঠতা—

Lest, having Him, I must have naught beside.

মৃন্ময়ী সুন্দরী ধরিত্রীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ-জনিত পলায়নী মনোবৃত্তির দেখা একবার পাই নিশিকান্তে—

এখনো হৃদয়রক্তে শিহরায় ধরণীর গণ
নভি নাই পূর্ণ রূপান্তর
তাই প্রাণ পলাতকা

কিন্তু নিশিকান্ত এখানে আকর্ষণের ঊর্দ্ধে চলে গিয়ে স্বভাবকে পর্য্যবেক্ষণ করতে পারছেন। টমসনে এটি কোথাও পাই না। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন—

I in their delicate fellowship was one—
Drew the bolt from Nature's secrecies.

পূর্বেই উল্লেখ করেছি টমসনের কবিতার পশ্চাতে কোনও প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতি নেই। তার অনেকটাই কবি-কল্পনা—হয়ত পুরোটাই। তাই তিনি বহুক্ষণ ধরে মুক্ত-

সমৃদ্ধ ভাষায় ও বর্ণনায় পাঠককে তাঁর কল্পনার আভাস দিয়েছেন। নিশিকান্তের এই সমস্যা ছিল না—তাই তিনি সংক্ষিপ্ত। যে ধ্রুবপদ ছয়টি স্তবকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন, নিশিকান্ত তা একটি মাত্র বলিষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত করেছেন।

আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। টমসনের কবিতাটি তাঁর কবিজীবনের প্রধান কীর্তি একথা আগেই বলেছি। তবু তো এটি প্রত্যক্ষ অনুভূতির বর্ণনা নয়। টমসনের জীবনে যা একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ অনুভূতি বোটি, তার থেকে অনেক উচ্চস্তরের, অনেক সজীব অনুভূতি নিশিকান্তের জীবনে বার বার স্বাভাবিকভাবে এসেছে—যার প্রকাশ তাঁর অগণিত কবিতায় অগ্নিস্ফুরা ছন্দে রূপায়িত হয়ে আছে। এ হিসাবে নিশিকান্তের সঙ্গে টমসনের তুলনাই হয় না। নিশিকান্তের এই কবিতার কল্পনার কারসাজি নেই, একটিই শুদ্ধ, প্রধান বিষয় এখানে বলিষ্ঠভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে, এই ধরণের প্রেরণারহিত হয়েও টমসনের কবিতা এতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে, সেটাই তার কাব্যের উৎকর্ষের পরিচায়ক। তার সৃজনধর্মী কল্পনার প্রবল শক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তাঁর ক্ষেত্রে mystic অনুভূতি হয়ত অল্পই ছিল ; কিন্তু বাকী শূন্যতা তাঁর কল্পনাশক্তি ও লিখনশৈলীই পূরণ করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে। স্বভাবতঃই এই দৈন্য বোধগম্য হয় তখনই যখন আমরা সত্যকার অধ্যাত্মঅনুভূতি প্রণোদিত মরমী কবিতার সঙ্গে পরিচিত হই।

কবিতার কয়েকটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে হয়েছে। সীমিত সাধ্যে গভীর সমুদ্রের উর্মিই স্পর্শ করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়।

জীবনতীর্থ পণ্ডিচেরী

বিশ্বনাথ রায়

মুর্শিদাবাদের মাটি ছেড়ে পূর্বভারতের কেন্দ্রবিন্দু স্পর্শ করে রেলপথে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু অতিক্রম করে দক্ষিণ-ভারতের সীমান্তে সমুদ্র-তীরের পণ্ডিচেরীতে যখন পৌঁছলেন দৈনন্দিনের সূর্য তখন মধ্যগগনে। কলকাতা থেকে প্রায় দু-দিনের পথ পাড়ি দিয়ে দেহ ক্লান্ত। প্রতিটি পদক্ষেপে তার প্রতিবাদ মুখর। কিন্তু যে-শক্তি আমাকে দীর্ঘ-পথ-যাত্রার প্রেরণা জুগিয়েছে, তার উৎস অফুরন্ত। তাই পণ্ডিচেরীর মাটিতে পা ফেলেই রোমাঞ্চ অনুভব করলেন বিপুল উৎসাহে। কিছুটা পথ হাঁটতেই সম্মুখে উদ্ভাসিত আদিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র যেন মন-কেড়ে-নেওয়া ইংগিতে অভ্যর্থনা জানালো তার পরিচিত অতিথিকে: যেন বলতে চাইলো, প্রথমবার আমাকে দেখে সাধ মেটেনি তাই আবার এসেছো আমার আকর্ষণে। সাগরের এই আপনকরা হাতছানি আমার স্নায়ুতে সুর হয়ে ধ্বনিত হলো বারবার তবু প্রশ্ন হলো—কিসের আকর্ষণে প্রায় দেড়হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পণ্ডিচেরী এলেন?

আমার এ-যাত্রা কি কেবল দক্ষিণভারতের কেন্দ্র-শাসিত শহর পণ্ডিচেরী দেখার প্রয়োজনে? শুধু কি পণ্ডিচেরীর সাগর-বেলায় ছুটির কটা দিন সাগরের ঢেউ গুনে পরিচিত পরিবেশের সব-কিছুকে ভুলে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেওয়ার আশায়? এমনই প্রশ্নের ঢেউয়ে যখন হৃদয় উদ্বেল, দেখা মিললো আকাঙ্ক্ষিত মনের। শ্রদ্ধেয় নলিনীদা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। জনপ্রিয় শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ যোগাশ্রমে বাস করছেন প্রায় ত্রিশবছর ধরে। শরৎচন্দ্রীয় চুলের প্যাটার্ণ। ধুতি-পাঞ্জাবী পরণে, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি; মুখে প্রতিভার দীপ্তি আর চোখে বুঝি দিব্য-চেতনার আলো। সব মিলিয়ে এক শান্ত সৌম্যরূপ। বয়স চুরাশী পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে অশীতিপর বৃদ্ধের কোনো শিথিলতা নেই তাঁর জীবনের দৈনন্দিন ছন্দে। বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে নলিনীকান্ত সরকার একটি বিশিষ্ট নাম। দাদা-ঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য, শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদধন্য সুরসিক, সুরকার সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার আমার জীবনে এক অপূর্ব আবিষ্কার। জানি না কোন্ উজ্জ্বল এক মুহূর্তে এক শুভচেতনার আলোতে ওঁর জীবনের সংগে আমার সংযোগ ঘটেছিল। সে রহস্য যাই হোক পণ্ডিচেরী আসার প্রেরণা জুগিয়েছেন উনি। চিঠিপত্র মারফৎই সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছিল নিপুণ তৎপরতায়। আমার আবাস নির্দিষ্ট করা ছিল শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি পরিচালিত অতিথিশালা shelter-এর প্রাঙ্গণে। দূর বিদেশে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুন্দর ছিমছাম একটি ঘর পেয়ে গেলেন যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে। সেল্টার সোসাইটির

নাম-করা অতিথিশালা। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সব ব্যবস্থাই আছে ওখানে। আশ্রম-বাসিনী এক গুজরাটি ভদ্রমহিলার তত্ত্বাবধানে নিখুঁত ব্যবস্থা। এ-ছাড়া আরও বিশ-পঁচিশটি শ্রীঅরবিন্দআশ্রম পরিচালিত অতিথিশালা আছে সারা শহর ছড়িয়ে। বিরাট শহর পণ্ডিচেরী। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের একটি সীমান্ত ষ্টেশন এটি একেবারে বঙ্গোপ-সাগরের তীরে। দক্ষিণ ভারতের মূল শহর মাদ্রাজ থেকে পথ-সংযোগও আছে সুন্দর। তামিলনাদুর রাজধানী মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরী বাসে প্রায় ৪।৫ ঘন্টার পথ। পণ্ডিচেরী কেন্দ্র-শাসিত শহর-প্রদেশ। জন-বহুল ব্যবসা-কেন্দ্র। প্রশস্ত পথ-ঘাট আর সু-সজ্জিত বিপণি-সম্ভারে পণ্ডিচেরী নির্ভেজাল আধুনিক। এককালের ভারতবর্ষে ফরাসী ছিটমহল পণ্ডিচেরীর জীবনে ফরাসী কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ফরাসী ভাষা, বাড়ীঘরের ফরাসী ছাঁদ—সব মিলিয়ে পণ্ডিচেরী আজও যেন ফরাসীদের। আজও বুঝি দুচারটে ফরাসী জাহাজ পণ্ডিচেরীর সাগরকূলে এসে নোঙর করে যেন অতীত আর বর্তমানের সেতু-বন্ধনের আশায়। আজও বহু পথ-ঘাটের ফরাসী নাম সাক্ষ্য দেয় এমন এক অতীতের, যে-দিনের ইতিহাস ফরাসী আধিপত্যের। কিন্তু এ-কোনো কলংকিত ইতিহাসের স্মৃতি নয়, রুচিশীল সংস্কৃতির স্বাক্ষর। তাই পণ্ডিচেরী দক্ষিণ ভারতের মূর্তিমান ব্যতিক্রম নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্পদ। কিন্তু পণ্ডিচেরীর এই আন্তর্জাতিকতা ফরাসী কৃষ্টির অবদান কিনা সে-প্রশ্ন মুখর হয়, যখন অরবিন্দ আশ্রমের প্রাংগণে আসি তীর্থ-পথিকের মন নিয়ে। শহর পণ্ডিচেরীর প্রায় অর্ধেক নিয়েই অরবিন্দ-আশ্রমের বিস্তার নানা শাখা-প্রশাখায়।

এখানে আকাশের সীমাহীন বিস্তার আর সাগরের চিরন্তন চাঞ্চল্য যেন মিতালী পাতিয়েছে অনন্তকালের। পবিত্র মধুর সে মিতালীর আনন্দময় সাক্ষী হয়ে আছে সাগরকূলের শ্রীঅরবিন্দ-যোগাশ্রম। এ-আশ্রম কোনো জাতির নয়, কোনো দেশের নয়, কোনো ধর্মের নয়। সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষের শাশ্বত ধর্মের প্রাণকেন্দ্র এ-আশ্রম। এখানে কোনো কৃচ্ছ্রতা, কোনো কৃপণতা জীবন-সাধনার পরিধি রচনা করেনি সংস্কারের সীমা-রেখা এঁকে, এখানে কোনো ধার্মিক বিধণ্ণতার ছায়া ক্লিন্ন করেনি, জীবনের চিরায়ত আনন্দের রূপকে! তাই সকালের সোনালী সূর্য প্রতিদিনের প্রণাম জানায় এ-আশ্রমকে পবিত্র সমুদ্র-স্নান সেরে। মাইলের পর মাইল সমুদ্র বেলার তীর ঘেঁসে পণ্ডিচেরীর পত্তন, আর তারই ভূমিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠা। সারা পৃথিবীর মানুষ ভিড় করেছে এখানে তাদের ইতিহাস কৃষ্টি সংস্কৃতির ভিন্নতা নিয়ে একটিমাত্র সমতার সূত্রে, তা'হলো মানুষের মন।

শ্রীঅরবিন্দ যোগাশ্রম সত্যই মানুষের মনের মন্দির। কিন্তু সে মন্দিরে ধ্যান নয়, তপস্যা নয়, কর্মই যোগ। তাই শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের প্রতিদিনের প্রভাত জাগে কর্ম-চাঞ্চল্যের সামগানে রাত্রির তপস্যায় অগ্রগতির মন্ত্রোচ্চারণ সাংগ করার প্রেরণায়। আমি দেখেছি এখানে কেমন করে একই কর্ম-যজ্ঞশালায় বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাটি,

মারাঠি, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান আদের কর্ম-সাধনার সমিধ্ সংগ্রহ করছে নিস্পৃহ তৃপ্তিতে। আমি দেখেছি কেমন করে তারা শুধু মানুষ—এই পরিচয়ের প্রতিষ্ঠায় এক বিশ্ব-মানবতার সৌধ রচনা করে চলেছে প্রতিদিনের জীবনে। আমি অনুভব করেছি এখানে অনশ্বর আত্মার জয়যাত্রার পথে মৃত্যুলীন হয়ে গেছে জীবনের গভীর আনন্দরতা।

তাই এবারে পণ্ডিচেরী পর্বের আবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব। দুপুরে নলিনীদার বাড়ীতে খাওয়ার টেবিলেই সন্ধ্যার কর্মসূচী রচিত হলো। সে-দিন সন্ধ্যায় সাধক-কবি নিশিকান্তের আবাসে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হবে। কবি নিশিকান্ত রায়চৌধুরী। শান্তিনিকেতনের কবিগুরুর স্নেহধন্য 'চাঁদকবি' পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ-যোগা-শ্রমে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদধন্য সাধককবি হয়েছিলেন অতিমানস-চেতনার আলোতে। কিন্তু রক্তমাংসের দেহ বিদ্রোহ করেছে সারা জীবন; শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রোগের সঙ্গে কী প্রচণ্ড সমর চলেছিল নিশিকান্তের দেহে, তার দিনলিপি লিখেছেন কবি নিজেই। সন্ধ্যায় স্মরণ-সভায় উপস্থিত হলেন নলিনীদার সঙ্গে। সাহানা দেবীর গান শুরু হয়েছে তখন। এককালের যুগান্তকারী শিল্পী আজ বৃদ্ধা। কিন্তু বিস্ময়কর প্রতিভার শক্তি। এক আসনে বসে পরপর আটদশটি গান গাইলেন উনি। কবি নিশিকান্তেরই লেখা গান। সাহানা দেবীর শেষগানের সুর আজও বুঝি ঝংকৃত—

'আজকে আমি জানাবো প্রার্থনা
গভীরতর নিবিড়তর গানে
আজকে আমার আকুল এ-বাসনা
চলে প্রাণের অতলতার পানে।

মৃত্যুর বেদীতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের জয়গান কতো দুঃসাহসী হ'তে পারে সে-দিনের স্মরণসভা তার স্বর্ণ-স্বাক্ষর।

অধ্যাপক অরিন্দম বসুর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শুনলেন নিশিকান্তের আত্মোপলব্ধির কবিতা। সে উচ্চারণ আজও বুঝি প্রতিধ্বনিত:

এ-কবি তোমার কবি-যশোমালা-প্রার্থী নয়,
তোমারি ছন্দে তোমারেই শুধু
সাধিয়া লয়।
কবিতার তরে কবিতা গাঁথিনা,
রূপ-রচনায় রূপেরে সাধিনা;
ওগো অপরূপ, ওগো অনুপম,
পরম প্রিয়।
ওগো সম্রাট, অকিঞ্চনের,
অর্ঘ্য নিয়ো।

সুর আর ছন্দের মায়ার পরশ নিয়ে আবার সমুদ্র-দর্শনে গেলেম। রাতের সমুদ্র। অন্ধ-

কায়ের গভীরে ভীষণ-সুন্দর দৃশ্যের বিশেষ এক অর্ঘ খুঁজে পেলেন সে-রাতে। পণ্ডিচেরীর সমুদ্র যেন ধ্যানে মগ্ন। মনে হলো প্রভাত সূর্যপ্রণামের সাধনা চলছে তার। পরদিন পক্ষি-শের জানালা পথে প্রাতঃসূর্যের আলোর স্পর্শে ঘুম ভাঙলো আমার। বেলা প্রায় আটটায় আশ্রম প্রাঙ্গণে পৌঁছালেম শ্রীঅরবিন্দ-সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য দিতে। এ-শুধু যুগষি অরবিন্দের সমাধি-ভূমি নয়—এ হলো বিশ্ব-মানবের তীর্থক্ষেত্র। ভাব-গম্ভীর পরিবেশে প্রভাতের প্রশান্তি নিয়ে অগণিত মানুষের আসা-যাওয়া দেখলেম আর নীরবে উপভোগ করলেম ফুলের মেলার নির্মল আনন্দ। ফুল আর ফুল। নানা রঙের নানা গন্ধের রাশিরাশি ফুল। পণ্ডিচেরী বুঝি ফুলেরই দেশ! শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—মানব-জীবনের পরম সাধনা শুধু দিব্য-অভিসার। বিশ্বলীলায় শুধু এই-ই তার করণীয়, তার জীবনের নিহিতার্থ। এ-অর্থ যদি সে খুঁজে না পায় তাহলে সে হাজারো কীট-পতঙ্গের অনাতন হয়ে যাপন করবে এক শ্রীহীন মলিন পংকিল জীবন, এই বস্তুজগৎ হয়ে উঠবে শুধু এক নিদারুণ বন্ধ্যভূমির নিরন্ত হাহাকার। এ-অভিসারের উপযুক্ত পরিবেশ বুঝি এই ফুলেরই দেশ! দুপুরে বিশ্রামের অবসরে দরজায় করাঘাত শুনে, বিরক্তি এলো ক্ষণিকের; কিন্তু দ্বার খুলে দেখি এক সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ। পরিচয় পর্ব শেষ করে আলাপ জমালেন উনি। অসহযোগ আন্দোলনের সত্যাগ্রহী শ্রীরঘুনন্দন দাস। নলিনীদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন দেশের লোকের কাছে। উনিও মুর্শিদাবাদের লোক। ১৯৩৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে এসে-ছিলেন পণ্ডিচেরীতে। আর ফেরা হয়নি ওঁর। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ দীর্ঘ চল্লিশ বছরের আশ্রমবাসী উনি। নতুন বই লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দের জীবন নিয়ে। আলাপে আলাপে আসর জমে উঠলো বেশ। শ্রদ্ধাবনত হলেম স্বদেশী যুগের এক যুব-জীবনের মহৎ পরি-ণতির প্রতি। অনেক সম্ভাবনার চিন্তা নিয়ে বিদায় নিলেম উনি। অপরাহ্নের বিনুগ্ধ আলোতে সমুদ্র দেখতে গেলেম সমাধিভূমি স্পর্শ করে। গোধূলির আকাশ তখন গৈরিক। দূরন্ত ঢেউয়ের ফেনিল আবর্ত দেখতে দেখতে খেয়াল নেই আকাশের রঙ কখন মুছে গেছে সে-দিনের মতো।

কোন এক সকালে আশ্রম-প্রাংগণে কথায় কথায় আলাপ জমে উঠলো আশ্রমিক তিন-কড়িদার সংগে। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ সহাস্য তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রমের অভ্যর্থনা বিভাগে কর্মরত। উপযুক্ত কাজ পেয়েছেন উপযুক্ত লোক। কিন্তু আসল পরিচয় পেয়ে-ছিলেম ওঁর সে-দিন সাধক-কবির স্মরণ-সভায়। তিনকড়িদা সুগায়ক। প্রতিভাবান অনুভূতিশীল শিল্পী উনি। দীর্ঘকালের সংগীত-সাধক গানের সুরে সুরে জীবনকে ছন্দোময় করে তুলেছিলেন। আশ্রমের পরিবেশে সাধক কবি নিশিকান্তের অনুপ্রেরণায় ভাষাকে সুরের ছন্দে ছন্দিত করেছেন এক সাধক-সুরকার। শ্রীমার ভাষায়—Music is the best means of inner opening. সে-দিন সন্ধ্যায় সংগীত-শিল্পী তিন-কড়িদার আবাসে গিয়েছিলেম সাবিত্রী উপাখ্যানের গীতি-আলেখ্য শুনতে। অমুপতি, রাণী, সাবিত্রী, নারদের কণ্ঠে গান গাইলেন শক্তিধর শিল্পী অপূর্ব বৈচিত্র্যে। অনেক গানের

সুর খেমে গেলে এক দরদী মনের সান্নিধ্য ছেড়ে উঠে এসেছিলেন এক গভীর বিশ্বাস নিয়ে —তিনকড়িদার সত্যিই Inner opening হয়েছে।

আলাপ হয়েছিল এক দরদী জীবন-শিল্পীর সংগে এক সুরভিত সাহিত্য-আসরে। অনাড়ম্বর সহজ সরল ঘরোয়া সাহিত্য পাঠ এবং আলোচনার বৈঠক। কেন্দ্রবিন্দু শিশিরদা অর্থাৎ ড: শিশির ঘোষ। বিশ্বভারতীর ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। নিরহংকার, নিস্পৃহ মানুষ। জ্ঞানের গর্বিত আত্মপ্রকাশ নয়, প্রজ্ঞার আলোতে উদ্ভাসিত ওঁর জীবন। পোষাক-পারিপাট্যে নির্ভেজাল বাঙালীয়ানা বজায় রেখেও আন্তর্জাতিক ভাবনার ভাবুক উনি। চিন্তার মুক্তিপথ খুঁজে পেয়েছেন হয়তো বা নিজেরই অলক্ষ্যে কোন পরশমণির স্পর্শে। তাই বাঁধা-ধরা নিয়মের কর্ম-জীবন তাঁর কর্ম-সাধনার উপযোগী বলে মনে হচ্ছে না আর। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যোগাশ্রমের বাস্তবিক দূরত্ব যাই হোক না কেন, শিশিরদার মনের জগতে সে দূরত্ব যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সে-ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সদ্য জাপান আর বুলগেরিয়া থেকে ফিরেছেন তাঁর মনের বৃত্তকে অনেক বিস্তৃত করে। শিশিরদা সে-দিনের ঘরোয়া বৈঠকে সেই বৃত্ত-বিস্তারের অনুভূতিকেই প্রকাশ করেছিলেন গভীর দরদ দিয়ে। আমি অভিভূত হয়েছিলেম এই প্রচার-সর্বস্ব যুগের এক ব্যতিক্রমকে মূর্তিমান হতে দেখে। শ্রীঅরবিন্দের বিস্ময়কর জীবন-সত্য উদ্ঘাটনের কথা মনে পড়ছে—"To me the ultimate value of a man is not to be measured by what he says, nor even by what he does, but by what he becomes." শিশিরদা এই 'হওয়া'র কথাই বলেছিলেন তাঁর বিদেশী অভিজ্ঞতার নিরিখে। আশ্রম-প্রাংগণে আর একজনকে পেয়েছিলেন আপন করে। কবি অবনী সিংহকে। কিশোর-পত্রিকা 'পুরোধা'র পরিচালক অবনী সিংহ। তারুণ্যে শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং কর্মী অবনী সিংহ শ্রীঅরবিন্দ যোগাশ্রমের বহুদিনের আশ্রমিক। শান্তমধুর এক অন্তর-সত্তাকে খুঁজে পেলেন ওঁর মধ্যে! তাঁর চলায় বলায় কাজে সেই শান্ত-মাধুর্য রূপায়িত হচ্ছে ফুলের মতো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মানুষের মনের কোলাহল শান্ত হলেই অন্তর-দেবতা আত্মপ্রকাশ করেন।' অবনী সিংহের আধারে বুঝি সেই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা দেখলেম।

অবশেষে গানের সুর আর ফুলের সুরভির দেশ পণ্ডিচেরী ছেড়ে এলেম একদিন। সাগর-কূলের তীর্থভূমিকে অন্তরের প্রণাম জানিয়ে এসেছি সেদিন। আমাকে বিদায় জানিয়েছে বঙ্গোপসাগরের ক্লান্ত সিন্ধু আর অমৃতময় জীবনশিল্পীর শিল্প-রচনা 'অরবিন্দ যোগাশ্রম'। সে বিদায় সম্ভাষণের ভাষা যেন আজও সুর হয়ে বাজে—"আবার এসো আবার এসো।" এ আশ্রম-প্রাংগণে বারবার এসো তোমার পবিত্র প্রণতির অর্ঘ্য নিয়ে। কোনো অবসাদ নয়, কোনো মলিনতা নয়, কোনো মৃত্যু নয় জীবন আর যৌবনের বেলায় এ-প্রাংগণে যুগে-যুগে তীর্থ-পথিক হয়ে এসো। জীবন-তীর্থ পণ্ডিচেরী যেন তোমার অনন্তকালের আপন দেশ। এ-আসা বাহির থেকে অন্তরে আসা।

ঋষি-কবির ভাষায়—'প্রতিদিন এসো, অন্তরে এসো। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হোক, কোনো আঘাত না পৌঁছাক, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন করোনা, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে রেখোনা—কেননা, সেইখানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেব-মন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্যস্থানের ফটক বন্ধ। এসো সেই অক্ষুব্ধ নির্মল অন্তরের মধ্যে এসো, সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এসো। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও। সেখানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও, সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।'

—বার্তিকা বিজ্ঞপ্তি—

১৯৫২ হইতে পুরাণো সংখ্যা পাওয়া যাইবে। অধিক সংখ্যা লইলে (অন্যূন পাঁচ বৎসরের) শতকরা ২৫% মূলতে দেওয়া হইবে। বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

টুকরি

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

ঘুঙুরো ফুল

আজ কিছুখন হাতুড়ি পেটানো রেখে
গুন্‌গুন্ গায় যদুনন্দন কর্ম্মকার।
অঙ্গনে তার ছাই গাদাটার পাশে
ঘুঙুরো গাছে ফুল ধরেছে মেলা।

নাগর দোলা

দোলে বুড়োবুড়ী, যুবকযুবতী
সখাসখী আর খোকা ও খুকি;
ঠোকাঠুকি লাগে মাথায় মাথায়
কেহ ভয় পায়, কেহবা হাসে।

কুলের কাঁটা

কাঠকুড়োনীর কাপড়ে জড়ালো
কুলের কাঁটা,
রাখাল ছেলেটা ছাড়াতে সে কাঁটা
লাগালো অনেকক্ষণ।

সাধনা

ঘুম ভেঙে চায় খোকা,
মা নেই দেখে কাঁদে
ভুলো কুকুর ন্যাজ নেড়ে তার
হাত চেটে দেয় এসে।

বটফল

বটের গাছে সবুজ পাতা,
ছোট ছোট সিঁদুরে ফল
টিয়াপাখী মিলায় তাতে
রাঙা ঠোঁটের রঙ্।
দেওয়া নেওয়া সবান রঙে
উঠ্‌লো রঙীন হয়ে।

জন্মদিন

সকাল বেলায় আলো নাচে
কোঁকড়া কালো চুলে
খুকীর মুখে উব্‌ছে পড়ে হাসি।
আমি বলি—ও খুকী, তোর কিসের খুসী এত।
খুকী বলে—আজ্‌কে আমার জন্মদিনের খুসী।

নিরাশ্রয়

ঝড়ে উড়ে গেছে বাসা,
শ্রাবণের ধারা ঝরে,
উস্কোখুস্কো পাখা,
ডানা দুটো জড়সড়,
সেগুন গাছের পাতায় আড়ালে
ভিজে মরে দাঁড়কাক।

২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮

সোনার আলোয় সোনালী কোরেছ
বাধাভরা শাদা চুল ;
বেগুনে রঙের আবাখানা ঢেকে
লুটিয়ে পড়েছে রাঙা
উত্তরীখানি ;
উনসত্তর বছর কাটিল আজি
উদয়াচলের পানে দুই আঁখি মেলি'

মাটির পটে

একটি ফোঁটা বৃষ্টির জল
চিকন সবুজ ঘাসে
বাদামী রং ফড়িং আরি তলে—
মাটির পটে কে এঁকেছে হঠাৎ আঁকা ছবি।

পরশমণি

ভাঙা দোয়াত দিলেন ফেলে
বাহির পথে,
সকালবেলায় সূর্য্য তারে
আপন করে।

বুনোগাছ

বুনোগাছ,
চিকন সবুজ পাতা,
ছড়িয়ে গেছে আঁকাবাঁকা বেগুনে রঙের ডাল,
হলুদে ফুলের থোকায় থোকায়
কালোকালো একজোড়া বৌবাছি।

বাদলের কবিতা

ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি ঝরে,
মর্মরিয়ে বেজে ওঠে
চালতা গাছের পাতা,
ভাবি বোসে কলম রেখে
আজ কবিতা থাক্
এমন সময় দুটি বোনে ভিজে চুলে এসে
বললে হেসে, আজ কবিতা চাই।

সন্ধ্যামণি

পাশের বাড়ির ফুল বাগানে
ফুটলো সন্ধ্যামণি।
আমি যদি না চাই তবু ব্যগ্রতা ওর নেই,
তাই তো ওরে ভালবাসি সহজ শান্ত মনে।

শিল্পী

সুনীল আকাশে উড়ে উড়ে শেষে
মিলিয়ে যায়
পাখীটিরে আঁকি, হয় না যে আঁকা—
মিলিয়ে যাওয়া।

সাগর

দিগন্ত জোড়া ধানের ক্ষেতের বুকে
আজি দুরন্ত বাতাসে সবুজ সাগরে—
আমার মনের যেন রে—নৌকাডুবি।

কাঁটার বরন

করনচা গাছে কাঁটা ভরা ডালে ডালে
ছোট বুলবুলি বুক রেখে গান গায়।
দেখি, কাঁটাগুলি নরম সবুজ কচি,
যেন আধো আধো শিশুর রাগের ভাষা।

তিন রঙা ছবি

যত দূর চাই
সরল সবুজ মাঠ;
তারি মাঝে চরে অলস পাটল গরু,
দাঁড়কাক তার পিঠে বসে আছে
চিকন কালো।

আপন ছায়া

বৃষ্টিজলে
বুকের পরে
সাজায় বুজোবালা,
ডালে ডালে
ফুলের মুখের বাণী,
লজ্জাবতী লতার লজ্জা আছি
বাদল দিনে কোথায় গেল দূরে।

সাদায় কালোয়

টেলিগ্রাফের তারে
ল্যাজ দুলিয়ে নাচে কালো ফিঙে ;
পিছনে তার সকালবেলার পাৎলা সাদা মেঘ।

বাতায়ন

যে বাদলধারা শালের শাখায় ঝরে,
তারি ছাঁট এসে ভেজায় আমার খাতা।
জান্‌লা আমার এমনি থাকুক খোলা,
মোর মনে আর শালবনে যাক মিলে।

অধিকারী

যেই ভাবলাম গোলাপটি তুলে নেবো,
উড়ে এলো ঐ শাদা ডানা প্রজাপতি
লাল গোলাপের বুকখানি দিল ভ'রে।

গন্ধ

কাঁটার আড়ালে রয়েছে বন্ধ হ'য়ে।
গন্ধে আমার কাঁটার শাসন নেই।

নীরব চাওয়া

আমি বলি, এই দেখেছ
কাঁটাবনের ফুল,
তোমরা কি কেউ নেবে?
সতু বলে, আমি নেবো।
রাণু বলে, আমি।
মীনু কিছুই বলে নাকো
ডাগর চোখে চায়।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

নীলাঞ্জন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী–২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা–১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা–৯

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু গুহের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone : 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

ওতো আপনারই মুখ চেয়ে আছে

ছেলেমেয়ে যখন ছোট তখন থেকেই তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সব বাবা-মারাই চান। তাদের জন্য পদে পদে বাবা-মার কতনা স্নেহ, যত্ন, উৎকণ্ঠা। আদর-যত্নে ছেলে-মেয়ে মানুষ করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তার চেয়ে বড় কাজ তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আর সে দায়িত্ব আপনাদেরই। মেয়ের বিয়ে বা ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন টাকার। সেই টাকা আজ থেকেই আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে। তবেই তো আপনার দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এই জন্য একটি চমৎকার সঞ্চয়-পরিকল্পনা আমাদের আছে। ৫০০০৲ UIB ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২০ বছর পর আপনি পাবেন ২১,২৫০৲ এর চেয়ে ভালো সঞ্চয়-ব্যবস্থা আর কি হতে পারে ?

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করুন, "ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য যতটা করা দরকার সবকিছু কি আমি করেছি ?"

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৭ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-২৭৮৪-৫-৬

অথবা যেকোনো শাখা

চেয়ারম্যান : শ্রী এন. এল. চ্যাটার্জি • জেনারেল ম্যানেজার : শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

শ্রীঅরবিন্দ

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগস্ট ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজীতে : ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ
মূল্যেত্তম রাজ সংস্করণ—১০০Q টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
সুলভ সংস্করণ—৭৫Q টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় : শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত
(গীতার ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী, পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি)
দুর্লভ খণ্ড সহ অন্যান্য রচনার নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬Q টাকা।

আঞ্চলিক ভাষা
হিন্দী গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

MAY 1974

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৪)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাবিত্রী	...	৫
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
একজন কানাডাবাসীর প্রশ্ন	...	১২
"মা রয়েছেন"	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৫
তীর্থযাত্রীর পত্র	বিভা চক্রবর্তী	১৮
পত্রের উত্তর	...	১৯
পলকে নিশ্চলক	শ্রীদিলীপকুমার রায়	২১
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী		২৩
মায়ের সঙ্গে কথা	...	২৭
টুকরী (কাব্য-সংগ্রহ)	নিশিকান্ত রায়চৌধুরী	৪১

গত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় শ্রীমায়ের অন্তিম-শয্যার ছবি এঁকেছেন ভেঙ্কটেশ

বন্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: Nolini Kanta Gupta
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

দুশ্চিন্তা করবে না, অধীর হবে না, সকল অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যাবে কিন্তু একটা সত্যকার ভিত্তির উপর স্থির প্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ময় চেতনার উপর সব প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তার মধ্যে অহংকারের খেলা যেন কোথাও না থাকে।

—শ্রীমা

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব—দশম সর্গ
(বিশ্ব-পর্যটকের পর্ব)

(ক্ষুদ্রতর মনের দেবলোক)

এই শক্তিসকলের মধ্যে শেষেরটি হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ।
উঠে এসেছে সে সকলের পরে চিন্তাবৃত্তির সুদূর এক লোক হতে
যদৃচ্ছার এক নিরেট যুক্তিহীন রাজ্যের মধ্যে
যেখানে সব অনুভবই স্থূল, সব কর্মই অন্ধ,
তবু মনে হয় যথেচ্ছাচারই যেন অনিবার্য ;
এই হ'ল যুক্তিবৃত্তি, হ্রস্বা স্থূলা কারুকৃৎ দেবশক্তি,
এল সে তার সঙ্কীর্ণ আবাসে কালের এক চূড়ার 'পরে।
পরিচ্ছিন্ন কলাকৌশল আর নানা নক্‌শার দক্ষ শিল্পী,
চিন্তামগ্ন মুখমণ্ডল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নিবিড়,
গ্রহণ করল সে তার পূত অবিচল আসন,
দানবাকার ত্রয়ীর মধ্যে বলিষ্ঠ, জ্ঞানগরিষ্ঠ সে।
হাতে তার বীক্ষণ-কাচ, মাপদণ্ড আর সন্ধান-শল্য,
দৃষ্টির বিষয় হ'ল তার বিশ্বজগৎ
আর এত জীবকুল সেখানে জন্ম লয় আর লোপ পায়
আর মহাকাশের কলেবর আর মহাকালের অন্তরাত্মা চিরধাবমান :
হাতে তার তুলে নেয় সে পৃথিবী আর নক্ষত্ররাজি
এইসব অপরূপ উপাদান হ'তে দেখবে সে কি বস্তু গড়তে পারে।
মন তার বলিষ্ঠ লক্ষ্যনিবিষ্ট অক্লান্তকর্মী,
গড়ে তোলে বাস্তবের রচনাধারা যত,
আর তার কাল-পরিকল্পনার জ্যামিতিক রেখারূপ ;
বহুগুণিত ক'রে ধরে সে সত্যের অভিমুখে মন্থর গতি তার সংক্ষিপ্ত পথে :
সহ্য করে না সে প্রহেলিকা আর অজ্ঞাত যা,
সহ্য করে না অনিয়ম আর ব্যতিক্রম,
চায় সে মহাশক্তির প্রগতির উপরে চাপিয়ে দিতে চিন্তার ভার,
অপ্রমেয়ের উপর চাপিয়ে দিতে চায় স্বচ্ছতা,
বোধাতীত জগৎকে বেঁধে দিতে চায় নিয়মের মধ্যে।

কিছুই তার জানা ছিল না, তবু আশা সব সে জানবে।
অন্ধকার নিশ্চেতন রাজ্যে ছিল যা একদা চিন্তাবিহীন,
পরাবুদ্ধির প্রত্যাদেশে চালিত হয়ে
আলো তার ছড়াবে সে ছায়াচ্ছন্ন বৃহতের প্রসারে,
অস্পষ্ট আলোক যেন পথ দেখায় ভ্রান্তির পুলকে
ইন্দ্রিয়জ্ঞানমর্থ্যের, ধারণার আর বাক্যের আশ্রয়ে,
এই দেবশক্তি সেখানে খুঁজে খুঁড়ে বের করে প্রকৃতির প্রক্রিয়া, উপাদান আর হেতু।
চিন্তাশক্তির বশে সমস্ত জীবন সুসঙ্গত করবার জন্য
এই বিপুল জটিল বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সে যুদ্ধ করে চলেছে;
কোন জ্ঞান নাই তার আপন অন্বেষু মন ছাড়া,
এসেছে সে বিশ্বকে অজ্ঞান থেকে মুক্ত করবার জন্য।
পরম কর্মী সে যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
দেখে চলে, গড়ে তোলে নূতন ক'রে যা কিছু রয়েছে এখানে,
আত্মবিশ্বাসী আপন হাতে তুলে নিল সে তার বিপুল কর্মভার।
ঐ যে আসীন ন্যূব্জদেহ বিপুল আকার,
মাথা নত ক'রে ধরণীপিণ্ডতলে আপন গৃহ তার কর্মশালায়
তার ঘোর শব্দমুখর যন্ত্রপাতির মাঝারে।
কঠোর দৃষ্টি এক তার স্বজনপর চক্ষুতলে
বিশ্বজনের নম্য উপাদান সবলে বশীভূত ক'রে
তার বস্তিকের গড়া কঠোর রূপায়ণ যত বেঁধে দেয়
চিরস্থির রেখাচিত্রাকারে
বিশ্বের মুক্ত আকিঞ্চন পৌঁছে না তার কাছে,
অন্তরস্থ সমস্ত জ্ঞানে আসে না তার,
জানে আসে না অনুচ্চারিত চিন্তা আর কণ্ঠহারা হৃদয়;
আনত হয়ে পিটিয়ে গড়ে সে অটল বিশ্বাস আর বজ্র-বিধান
আর ধাতব সৃষ্টি জীবনকে বন্দী করবার জন্য,
গড়ে বিশ্ববস্তুর যান্ত্রিক প্রতিরূপ।
দৃষ্ট জগতের স্থানে বুনে চলে সে ধারণার জগৎ:
বুনে চলে তার আড়ষ্ট অথচ ভারহীন রেখা ধ'রে
বস্তুশূন্য চিন্তার সূক্ষ্মতন্তু বাকৃজাল,
অনন্তের খণ্ডাকৃতি ব্যবস্থা যত তার,
তার দেববৃত্ত, তার সৃষ্টিতত্ত্বের মানচিত্র
আর তার পুরাণ-কাহিনী—এ সব দিয়ে ব্যাখ্যা করে তাকে যার কোন ব্যাখ্যা নাই।
স্বেচ্ছানত পর পর সে সাজিয়ে রেখেছে মনের নম্র আকাশে
বুদ্ধির স্থূল-ধরে টাঙ্গান মানচিত্র যেন একে একে—

সজোরে বন্দী করে সে বৃহৎ সত্যকে সঙ্কীর্ণ সূত্রাবলীর মধ্যে—
বিষাদব্রত যত তার সংখ্যাহীন আত্মনির্ভর দর্শনশাস্ত্র ;
প্রকৃতির ব্যবহারিক আধার হ'তে
সে কেটে তোলে চিন্তার শাণিত ছুরিকা দিয়ে পরিস্ফুট রেখায়—
বিশ্ব-যাদুকরের যন্ত্রশক্তি চলবার জন্য রেলপথ যেন—
তার স্থূল বিজ্ঞান যত অভ্রান্ত অলঙ্ঘনীয়।
মানুষী নিশ্চেতনার শূন্য বিপুল দেওয়ালের উপর
প্রকৃতির গহন নির্বাক সাঙ্কেতিক লিপির চারিদিকে
লিখে তোলে সে সুস্পষ্ট লৌকিক হরফে
তার চিন্তার বিপুলায়তন বিশ্বকোষ ;
তার অঙ্কবিদ্যার চিহ্নাবলী সমন্বিত বীজগণিত,
তার সংখ্যারাজি আর অভ্রান্ত সূত্রাবলী
সৃষ্টি করে সে বিশ্বরহস্য সংক্ষিপ্তসার প্রণয়নের জন্য।
চারিদিকে ছেয়ে রয় যেন বিশ্ব-মসজিদে এক
আপন বিধানের শাস্ত্রবাক্য অঙ্কিত যত
তার বিচিত্র আল্পনার কারুকার্যময় নওলী,
তার শ্রীময় জ্ঞান, তার কৃতিময় বিদ্যা।
তার জ্ঞানের এই শ্রী, তার বিদ্যার এই কৃতি এই তার পূর্ণ তাগ্রায়।
বিশুষ্ক বুদ্ধির পুনশ্চ ক্রিয়াকর্মে তার
ইন্দ্রিয়াবলীর পাশবদ্ধ হতে তার প্রত্যাহারে
মানস প্রাচীরে কোথাও ফাটল ধরে না,
অব্যভিচারী শক্তির দিক্‌বিদারী দীপ্তিশিখা ফুটে ওঠে না,
স্বর্গের সত্যসঙ্ক কোন জ্যোতির্লেখা উদ্ভাসিত হয় না।
লক্ষ মুখমণ্ডলে ঘুরে চলে জ্ঞান তার এখানে,
প্রতি মুখমণ্ডল শিরে বেঁধেছে সংশয়ের উষ্ণীষ।
সবই এখন সন্দেহের বিষয়, সবই এখন শূন্যে পর্যবসিত।
এককালে রচিত হয়েছিল যে বিরাট কৃতি চিরস্মরণীয়
সেই পুরাতন মহাকাহিনী তার বিলুপ্ত হয়ে গেল,
তার স্থানে এল ক্ষণভঙ্গুর আড়ষ্ট সংকেতের মেলা ;
এই নিত্যপরিবর্তন তার চোখে দেখা দেয় ক্রমোন্নতিরূপে :
তার চিন্তাধারা অন্তহীন লক্ষ্যশূন্য অভিযান।
উঠে দাঁড়াবার মত স্থান নেই এমন কোন শিখরে
যেখানে সমগ্র অনন্ত একযোগে ধরা দেয় অখণ্ড দৃষ্টিতে তার।

বেদমন্ত্র

ঋগ্বেদ

ঋষি অত্রির অগ্নিস্তব

৫ম মণ্ডল—১৭শ সূক্ত

১। আ যজ্ঞৈর্দেব মর্তা ইষা তব্যাংসমূতয়ে।
অগ্নিং কৃতে স্বধ্বরে পুরুনীড়ায়তাবসে ॥১॥

আ—এখানে ডেকে আনে, আহ্বান করে
যজ্ঞৈঃ—যজ্ঞশক্তিদের সহায়ে
দেব—হে দেব
মর্তাঃ—মর্ত্যজীব
ইষা—সত্যকার, যথাযথ, যথার্থ
তব্যাংসম্—সামর্থ্য
ঊতয়ে—রক্ষণের জন্য, প্রসারের জন্য
অগ্নিম্—অগ্নিকে
কৃতে—সম্পন্ন, সম্পাদিত
সু-অধ্বরে—সুষ্ঠু যজ্ঞকর্মে
পুরুঃ—বহুরূপী (মানুষ)
ঈড়ীত—আরাধনা করে
অবসে—সংরক্ষণের জন্য, অভিবৃদ্ধির জন্য

হে দেবতা, যজ্ঞসকলের সহায়ে মর্ত্যজীব তোমার সত্যময় সামর্থ্যকে এখানে নিয়ে আসে তার রক্ষীরূপে; বহুরূপী মানুষ যেন আপনাকে সংরক্ষণের জন্য যজ্ঞকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করে অগ্নির আরাধনা করে ॥১॥

২। অস্য হি স্বয়শস্তর আসা বিধর্মন্নন্যসে।
তং নাকং চিত্রশোচিষং মন্দ্রং পরো মনীষয়া ॥২॥

অস্য—এর
হি—নিশ্চয়
স্বয়শস্তরঃ=স্বয়শঃ তরঃ—স্ব-বহিবায় বহত্তর

আস্যা—মুখে
বিবর্হন্—পরম ধর্ষিষ্ঠের
মন্যসে—মনের মধ্যে ধারণ কর
তন্—সেই
সাকম্—সুখস্বর্গ, স্বর্গলোক
চিত্রশোচিষম্—বহুল তেজোময়
মন্দ্রম্—আনন্দময়
পরঃ—পরপারে
মনীষয়া—মানসবুদ্ধির

সেই পরমধর্ষিষ্ঠের মুখে তুমি স্বমহিমায় মহত্তর হয়ে ওঠ, তোমার চেতনায় ধারণ কর সেই বহুল তেজোময় আনন্দময় স্বর্গলোক মানস বুদ্ধির ওপারে ॥২॥

৩। অস্য বাসা উ অর্চিষা য আযুক্ত তুজা গিরা।
দিবো ন যস্য রেতসা বৃহচ্ছোচন্ত্যর্চয়ঃ ॥৩॥

অস্য—এর
বৈ—নিশ্চয়
অসৌ—সে, এ
উঁ—অবশ্য
অর্চিষা—দীপ্তি দিয়ে
যঃ—যে
আযুক্ত—সংযুক্ত হয়েছে
তুজা—বলের সঙ্গে, সামর্থ্যের সঙ্গে
গিরা—মন্ত্রবাক্যের সঙ্গে
দিবঃ—দ্যুলোকের
ন—যেন
যস্য—যার
রেতসা—প্রভায়, প্রভাস্রাবে
বৃহৎ—বৃহৎ হয়ে
শোচন্তি—প্রদীপ্ত হয়
অর্চয়ঃ—দীপ্তিরাজি

এই হ'ল সে যে এই অগ্নির প্রভায় সম্মিলিত হয়েছে মহাবলের সঙ্গে, মহাবাক্যের সঙ্গে, স্বর্লোকের তেজোধারায় যেন যার দীপ্তিরাজি বৃহৎ হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে ॥৩॥

৪। অস্যা ক্রত্বা বিচেতসো দস্মস্য বর্পু রথ আ।
অধা বিশ্বাসু হব্যোঽগ্নিরিষ্কৃ প্র শস্যতে ॥৪॥

অস্য—এর
ক্রত্বা—কর্মশক্তি দিয়ে
বি-চেতসঃ—পূর্ণ জ্ঞানময়ের
দস্মস্য—সিদ্ধকর্মীর
বর্পু—দিব্যসম্পদ
রথে—রথের মধ্যে
আ—এনে ধরেন
অধ—তাই
বিশ্বাসু—বিশ্ব, যাবতীয়
হব্যঃ—আহ্বনীয়, আহ্বানযোগ্য
অগ্নিঃ—অগ্নি
বিক্ষু—জনগণের মধ্যে
প্র—সম্যক
শস্যতে—প্রকাশযোগ্য, প্রকাশনীয় করে ধরতে হয়

এই জ্ঞানময় সিদ্ধকর্মীর কর্মশক্তির কল্যাণে দিব্যসম্পদে তার রথ পূর্ণ, তাই বিশ্বজনরাজির মধ্যে অগ্নিকে আহ্বান করতে হয়, তাঁকে সম্যক প্রকাশ করে ধরতে হয় ॥৪॥

৫। নূ ন ইন্ধি বার্যাসা সচন্ত সূরয়ঃ।
উর্জো নপাদভিষ্টয়ে পাহি শঙ্কি স্বস্তয় উতেবি পৃৎসু নো বৃধে ॥৫॥

নূ—এখন
নঃ—আমাদের
ইৎ—নিশ্চয়
হি—অবশ্য
বার্যম্—বরণীয় বস্তু
আসা—মুখের সহায়ে
সচন্ত—ধরে রাখে
সূরয়ঃ—দিব্যদ্রষ্টারা
উর্জঃ—দিব্য বীর্যের
নপাৎ—সন্তান

অভিষ্টয়ে—অনুপ্রবেশের জন্য
পাহি—রক্ষা কর
শবি—সমর্থ হয়ে ওঠ
স্বস্তয়ে—ক্ষেমের (সাধন) জন্য, সুস্থিতির জন্য
উত—আর
এধি—এখানে এস
পৃৎসু—সকল সংগ্রামে
নঃ—আমাদের
বৃধে—সমৃদ্ধির জন্য

দিব্যাস্ত্রষ্টারা তোমার আত্মানুপের সহায়ে আমাদের জন্য পরম বরণীয়কে ধরে রেখেছে, মহাবীর্য্যের তনয় তুমি, রক্ষা কর আমাদের, আমরা যেন অন্তরে প্রবেশ করতে পারি, শক্তিমান হয়ে ওঠ তুমি আমাদের সুখস্থিতির জন্য আর এস এখানে সকল সংগ্রামে আমাদের সমৃদ্ধির জন্য ॥৩॥

সংশোধন

বর্ত্তিকা—ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪

পৃষ্ঠা—১৯ বেদমন্ত্র—ঋক-৩-অনুবাদ

অশুদ্ধ :	শুদ্ধ :
মহা বিশাল বরন করে মহা দুস্তর বিশাল বিস্তৃতি	বরন করে মহাদুস্তর বিশাল বিস্তৃতি

একজন কানাডাবাসীর প্রশ্ন

(কানাডীয় প্রশ্ন)

"A Practical Guide to Integral Yoga" বইটির ১৭৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে: "শারীর স্তরে সাধনার পরিপূর্ণতার জন্য শ্রীমায়ের শারীর সান্নিধ্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন। দেহের এবং বহিঃসত্তার রূপান্তর অন্যথায় অসম্ভব।"

আমার প্রশ্ন মায়ের এই দেহরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাণী আমরা কি অর্থে গ্রহণ করব? এর অর্থ কি এই পথের সাধকদের পক্ষে পরিপূর্ণ রূপান্তর আর সম্ভব হবে না? না কি পূর্ণ-যোগের পথে স্থূলস্তরে শিষ্যত্বের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে?

উত্তর: অবশ্যই শারীর রূপান্তরের আশু পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখতে হল—তবে তাকে বাতিল করে দেওয়া হয়নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে যা আমরা পেয়েছি তাও কিছু কম অলৌকিক নয়। শ্রীমা আন্তর জগতে, সূক্ষ্ম জড়ের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন তাঁর নবদেহ—সে দেহ তাঁর জড়দেহের মতই ভৌতত্ব ও স্পর্শগোচর যদিও ততখানি স্থূল-কাঠিন্য তার নয়। তাঁর "মন্তব্য" গুলির শেষের দিকের একটিতে তিনি এই নূতন রূপান্তরিত দেহের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে যেমন দেখেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। সে দেহ তিনি গড়ে তুলেছেন সুদীর্ঘ কঠোর শ্রমে, তাকে গড়ে দিয়েছেন পরিস্ফুট রূপে এবং রেখে গিয়েছেন তাকে আমাদের সান্নিধ্যে, মানবজাতির সান্নিধ্যে।

এই যে নবদেহ তাঁর—প্রস্তুত হয়েছে তা জড় আবরণের অন্তরালে—তিনি চেয়েছিলেন তাকে এই জড় আধারের মধ্যে নামিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে, এমন কি জোর করে ভরে দিতে, তাকে বাধ্য করতে এই নূতন উপাদানটি গ্রহণের জন্য; কিন্তু জড় এবং মানুষের শারীর প্রকৃতি প্রস্তুত হয়ে ওঠে নি এখনও: পৃথিবী এখনও তাকে গ্রহণ করল অনধিকার প্রবেশ হিসাবে—যেন বিজাতীয় কিছু। জড় আধারটি ফলে ভেঙ্গে পড়ল—ঠিক ভেঙ্গে পড়ল না হয়ত—বরং ভেঙ্গে চলে গেল: তবে সে হল আর এক কাহিনী।

তবু সে দেহ এইখানেই রয়েছে জাগ্রত, তার শক্তি ও সৌন্দর্য্যে তেমনই মহিমাময় এবং তেমনি সক্রিয় এখনও আমাদের মধ্যে, আমাদের চারিদিকে জগতের মধ্যে তা কাজ করে চলেছে অবিরাম—তার জড় রূপায়ণের শেষ পরিণতির জন্য।

আমাদের করণীয় এই স্বর্ণময়ী মাকে আমাদের অন্তরে দর্শন করা, এবং চেষ্টা করা তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে যা চেয়েছেন—হয়ে উঠতে তাঁর সোনার শিশু অন্তরে ও বাহিরে।

শ্রীঅরবিন্দ এক আন্তর মন, আন্তর প্রাণ ও আন্তর জড়ের কথা বলেছেন। এই ত সেদিন খেলার মাঠে ধ্যানের সময় পড়া হ'ল তারই অধ্যায় একটি। এই সুবর্ণদেহ, নব

কলেবরকে রূপ দেওয়া হয়েছে আন্তর মন, আন্তর প্রাণ ও আন্তর জড় হতে, তাদের নবরূপ দিয়ে নূতন করে গঠন করে। মায়ের প্রতি আমাদের ভালবাসাকে আমরা প্রকাশ করে ধরতে পারি, তাঁর করুণার কাছে আমাদের যে ঋণ, তার একটুকুও আমরা প্রত্যর্পণ করতে পারি যদি তাঁর সান্নিধ্যকে আমাদের শারীর সত্তায় গ্রহণ করি, তিনি যে কর্ম্ম সুরু করেছেন, সেখানে তাঁকে তা পরিপূর্ণ করে চলতে দিই যদি।

(২)

এখন তবে সময় হয়েছে আমাদের দিক হতে অতীতের বিচ্যুতি যত শুধরে নেবার—হাঁ, বিচ্যুতি ঘটেছে অনেক, অত্যন্ত দুঃখজনক বিচ্যুতি যত। এতদিন তাঁর জড়দেহ ছিল আমাদের বর্ম্ম ; আমাদের কর্ম্মের পূর্ণ ফল আমাদের ভোগ করতে হয়নি, কারণ তাঁর দেহ "রক্ষাকবচের" কাজ করে চলছিল। কর্ম্মফলের চাপের যে শক্তি তা সে প্রতিহত করে দিত, তার মন্দ ফলাফলকে যতখানি সম্ভব হ্রাস করে ধরত। তাঁর দেহ বহন করে চলত আমাদের বোঝা, যে দুর্গতি প্রাপ্য ছিল আমাদের তা থেকে আমাদের মুক্ত রেখে। মানব-জাতি, বিশ্বজগৎ জানেও না কোন্ অভয়া করুণা তাঁর জড়দেহ তাদের কাছে এনে ধরেছিল, এতদিনে তারা ধ্বংস হয়ে লোপ পেয়ে যেত যদি না থাকত এই ভাগবতী তনুর সান্নিধ্য।

জগৎ বেঁচে গেছে, মানবজাতি পেয়েছে ভবিষ্যতের আশ্বাস—এবং তা হল তাঁর দেহের কৃতি। এরও অধিক কিছু সে করতে চেয়েছিল, আমাদের দেখাতে চেয়েছিল ভবিষ্যৎ জড়-রূপের কিছুটা, কিন্তু স্পষ্টতঃই তা এখনই হবার নয় কারণ আমাদের দিক থেকেও, বিশ্ব ও মানুষের পক্ষ থেকেও কিছু করণীয়ের কিছু সহায়তার প্রয়োজন ছিল—তাঁর কণ্ঠের সে প্রতিধ্বনি মনে পড়ে—"যদি মানবজাতি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে সম্মত হয়"—ঠিক তাই, ওইটুকুই ছিল ন্যূনতম দাবী --কিন্তু সেই ন্যূনতম মাত্রাটুকুও আমরা তাঁর দেহকে দিইনি। তাঁর দেহ আমাদের কাছে এত সহজলভ্য করে ধরা হয়েছিল—কোন প্রযত্ন বা প্রয়াসের প্রয়োজন হয়নি আমাদের দিক হতে—ফলে যে সব অমূল্য সম্পদ আমাদের এনে দেওয়া হয়েছিল, আমাদের দরজায় ধরে দেওয়া হয়েছিল, তাদের মূল্যের সকল বোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনেকবার দুঃখের সঙ্গে একথা আমাদের কাছে তিনি উল্লেখও করেছেন—ধনীর আদুরে দুলালের মত আমরা ছেলায় সকল সম্পদ অপব্যয় করছি।

দুঃখের কথা ত' নিশ্চয়ই, কিন্তু না আমাদের দুঃখের কারণ কিছু রেখে যাননি। আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন তাঁর অভয়াশক্তির প্রকৃত উৎস যা, তা হল তাঁর জাগ্রত চেতনা যা মূর্ত হয়ে রয়েছে পৃথিবীর আবহাওয়ায়, আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরি-মণ্ডলের মধ্যে। আমাদের করণীয় শুধু কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে ধরা এবং তাঁকে দেখা। সিঁড়ি সরে গেছে বটে কিন্তু তিনি সরে এসেছেন আমাদের আরও কাছে—ঊর্দ্ধে একটু উঠবার প্রয়াস করলেই পৌঁছে যাব সোজা তাঁর কোলে।

তাঁর যে দেহের আশ্রয়ের উপর আমরা প্রায় সম্পূর্ণই নির্ভর করতাম, তা আর নাই, তাই এখন আমরা বাধ্য হয়েছি প্রকৃত নির্ভরের সন্ধান করতে—খুঁজতে তাঁর চেতনার আশ্রয়,

সেই আন্তর সত্য তাঁর আন্তর সান্নিধ্য, তাঁর জাগ্রত আন্তর স্বরূপ, তাঁর দেহ ছিল যার প্রতিনিধি যাকে জানবার প্রয়াস করার মত যথেষ্ট সজাগ ছিলাম না আমরা। এখন আমাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে সেই প্রয়াসের মধ্যে—এ ছাড়া আর কোন পন্থা নাই। পথ হবে শ্রমসাধ্য; তাঁর দেহের আশ্রয়ে এর চেয়ে অনেক সহজেই—প্রায় শিশুর ছেলেখেলার মতই—উঠে যেতে পারতাম চেতনার সিঁড়ি বেয়ে। এখন তবে, নিজের সামর্থ্যে চলতে আর একটু কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন হবে, কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন হবে আমাদের বাহ্য জীবন ও শারীর চেতনাকে তাঁর চেতনার অনুগত করে তুলতে, তাদের গড়ে তুলতে, উপযুক্ত করে ধরতে। তাঁর জড়দেহ দিয়েছিল অযাচিত অহেতুকী অভয় ও সহায়তা—কিন্তু এখন সে সব হবে সর্তাধীন—তা নির্ভর করবে আমরা কতখানি হয়ে উঠি স্বেচ্ছায় তাঁর সহযোগী, সানন্দে ও সচেতনভাবে হয়ে উঠি তাঁর সহকর্মী, তার উপর—অবশ্যই দিব্যকরুণা সর্বদাই সঙ্গে রয়েছে। একবার তিনি স্পষ্টই আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কারণ সঙ্কট শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের —"তোমরা প্রস্তুত?" প্রায় কোন চিন্তা না করেই—বাহাদুরি ও বীরত্বের লোভে অনেকেই বলেছিলাম—"হাঁ, আমরা প্রস্তুত"। কিন্তু সত্যসত্যই আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

আমাদের এবং বিশ্বের কর্তব্য এখন তবে নিজেদের প্রস্তুত করে তোলা, তার অর্থ আমাদের শারীর সত্তা ও চেতনাকে মুক্ত করে ধরা সকল পুরাতন অভ্যাস হতে, তা করা সম্ভব তাদের মধ্যে মায়ের চেতনা, তিনি যা স্বয়ং, যা দিয়ে তিনি আমাদের বাহুপাশে ঘিরে রেখেছেন—সেই চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে পরের বার মায়ের আহ্বান যখন আসবে—আহ্বান ত সর্বদাই রয়েছে—আমরা যেন উত্তর দিতে পারি "আমরা প্রস্তুত" এবং এবার যেন আমাদের মিথ্যা সত্য উচ্চারণ করে।

"মা রয়েছেন"

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

এ যদি হয় "প্রলয়", এমন কি "মহাপ্রলয়"ই হয় ত' বা, তবু সবই হারায়নি, সব কিছুই ধুয়ে মুছে যায়নি। কিছু রয়ে গেছে, অস্পৃষ্ট, অমর—তোমার অন্তরে যে দিব্য অংশ, তোমার মধ্যে মায়েরই অংশ তা, থেকে গেছে তাঁর মূর্ত বাঙ্ময়ী চেতনা।

প্রকৃতপক্ষে তোমার অন্তরাত্মাকেই নিশ্চেতনার গভীর হতে তিনি উদ্ধার করেছেন এবং তোমার অন্তরে তাকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন জীবন্ত সত্য রূপে। তাঁর প্রথম ও প্রাথমিক কাজই ছিল এই এবং সে কাজ তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। অন্তরাত্মা সর্বদাই ছিল, সত্য; কিন্তু তা ছিল সুদূর পরাহত, বহুদূরের বস্তু, প্রায় নিষ্ক্রিয় আলোক-কণার মতই, অচিহ্নিত অপরিচিত নক্ষত্র এক বা বাদুড়ী জ্ঞান ও সম্ভাবনার মধ্যে এখনও ধরা দেয় নি। তাকে তিনি আমাদের সন্নিকটে নিয়ে এসেছেন, আমাদের জাগ্রত সক্রিয় চেতনায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি যেন তাকে তুলে এনেছেন অচেতনার অতল হ'তে কিংবা নামিয়ে এনেছেন অদৃশ্যপ্রায় অবাস্তবপ্রায় আকাশের নীহারিকাপুঞ্জের পার হতে, তারপর ক্রমে তাকে গড়ে তুলেছেন, পুষ্ট করেছেন, দিয়েছেন তাকে একটা অটুট আবাস আমাদের অন্তরলোকে। তাকে তিনি রূপায়িত করে তুলেছেন নানারূপ-ময় ব্যক্তিস্বরূপে। প্রায়ই—যখবা সব সময়ে—আমরা যে তাকে চিনতে পারি না, তার কারণ ইন্দ্রিয়বোধের বাহ্যখোলসটি এখনও তার দিকে নিজেকে সম্পূর্ণ খুলে ধরেনি। তবু সে এখানেই রয়েছে আমাদের আন্তর অধীশ্বর হয়ে, সকল অন্ধকার ও অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে দিয়েই সে আমাদের দিশারী হয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

ঠিক এর পরের ধাপ, তাঁর কর্মের পরের অধ্যায় ছিল, এই যে অন্তরাত্মা, আন্তর স্বরূপ, তাকে ঘিরে একটা দেহ একটা জড় আধার গড়ে তোলা যা তাকে প্রকট করে ধরবে। এই পর্যায়ে তাঁর প্রথম প্রয়াস ছিল এই একমাত্র গন্তব্যকে একটা স্থূল দিব্য রূপ দেওয়া। অন্তঃপুরুষ সেখানে ত ছিলই, এক দেবসত্তা তার মধ্যে নেমে আসবে, সেখানে আসীন হবে; এই দেবসত্তা অর্থাৎ মায়ের নিজের স্বরূপেরই এক শক্তি, একটি রূপ, তাকে নামিয়ে আনতে হবে এবং তার মধ্যে অন্তরাত্মাকে লয় হয়ে যেতে হবে। ঠিক এমনই অবস্থাতে বাহ্যতঃ মনে হয়, কর্মটি থেমে গেছে, সম্পূর্ণ হয় নি।

ব্যক্তিগত সিদ্ধি, এমনকি কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধিও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল না, লক্ষ্য ছিল মানবজাতির একটা পরিপূর্ণতা, তার অর্থ তার বৃহৎ অংশ একটা, অন্ততঃ একটা বিশিষ্ট অংশ তার অধিকারী হবে এবং সেই পরিণতির দিকেই সকল

প্রয়াস প্রয়োগ করা হয়েছিল। মানুষী চেতনাকে এমন উর্দ্ধতর পর্যায়ে তুলে ধরা প্রয়োজন যাতে সে যে চিন্ময়প্রবেগ নেমে আসছে রূপান্তর করবার জন্য তাকে ধারণ ও মূর্ত্ত করতে পারে। অন্যথায় মানুষী চেতনার স্তরে তার প্রতিনিধি হয়ে, জড় চেতনার অন্তর্গত থেকে কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাকে ধারণ করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র পার্থিব চেতনা নয়, পৃথিবীর জড় গঠনটি পর্যন্ত রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ যে জড় দেহ, ব্যক্তি বিশেষের জড় দেহ রূপান্তরের সকল স্তর অতিক্রম করবে, তাদের সম্পূর্ণ করে তুলবে, তার সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজন অনুরূপ পরিবর্ত্তন আরও অন্যান্যের মধ্যেও—স্বভাবতঃই তার অর্থ নয় সমগ্র মানবজাতির পরিবর্ত্তন, তবু পূর্বেই যেমন বলেছি, তার অর্থ নগণ্য নয় বেশ একটা গণ্য অংশের পরিবর্ত্তন। তা না হলে এ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য—একটা সামগ্রিক সমষ্টিগত পরিবর্ত্তন—সিদ্ধ হবে না। পৃথিবীর বুকে একটি মাত্র একক অতিমানস দেহ হবে প্রকৃতির খেয়াল মাত্র—চাপিয়ে দেওয়া অলৌকিক ঘটনা একটা যেন, প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির বহির্ভূত সৃষ্টিছাড়া বস্তু এক, মানবজাতির পুরোধা যারা, সর্বোচ্চশীর্ষ যারা, তারাও তার সঙ্গে কোন সংযোগ বা সম্বন্ধ খুঁজে পাবে না।

কাজেই সে লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য পার্থিব প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে, প্রথমে প্রস্তুত করতে হবে জড় উপাদানের মধ্যে যে পার্থিব চেতনা তাকে, তারপরে সেই স্থূল উপাদানটিকেই। এবং আমাদের জীবনে আজ অবশ্যকর্ত্তব্য হিসাবেই তা করতে হবে এখনই।

আমি বলেছি, পার্থিব চেতনা এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নি মায়ের দেহের অর্থাৎ তাঁর দেহের জড় উপাদানের পরিপূর্ণ রূপান্তরের জন্য। সেই জন্যই যে রূপান্তরকারী শক্তি নেমে এসেছিল, তাকে সে ধারণ করতে পারল না, ভেঙ্গে পড়ল, বরং ভেঙ্গে দিয়েই চলে গেল, ভেদ করে গেল জড়ের কঠিন ঘন বাহ্যতন আবরণটিকে—তার ফলাফল ভবিষ্যৎকালে প্রকাশ পাবে।

আমরা যারা রয়ে গেলাম, তারা শুরু করি তবে একেবারে গোড়া থেকে। আরম্ভ করা যাক একেবারে হাতেখড়ি থেকেই। মায়ের জীবন-কাহিনী আমরা জানি, তিনি যখন শ্রীঅরবিন্দের কাছে এলেন, নিজে তিনি যা করেছিলেন। তাঁর পুরাতন ব্যক্তিসত্তাকে নিঃশেষে মুছে ফেলেছিলেন তিনি, মুছে ফেলেছিলেন নিজের সব কৃতি, সব সিদ্ধি, নিজের চেতনাকে সদ্যধৌত মসীপত্রের মত করে নিজেকে ধরে দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের চরণে সদ্যোজাত শিশু যেন, সমস্ত অতীত হ'তে নিজেকে মুক্ত ক'রে। আমরাও তবে তাই করি—আগামী দিনের মুখোমুখী দাঁড়াই আমাদের শিশু অন্তরাত্মাকে সামনে রেখে—কারণ সেই ক্ষুদ্র সত্তাটিই হল আমাদের অন্তরে মায়ের সান্নিধ্য, তাঁর চেতনার এখনও ভাস্বর।

* * *

তোমাদের কাছে এটি পড়তে আমি অনেক ইতস্তত: করেছি।
এক দিক থেকে যা লিখেছি তা ভাল কিন্তু...তবু...

আসলে এটা হ'ল মনোগত বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা, এবং তা এমন একটা বিষয়ে যা মন ও বুদ্ধির নাগালের সম্পূর্ণ ওপারে। বিষয়টি যে শুধুই বুদ্ধির অতীত মনের অতীত তা নয়, তা বিশ্বগত চেতনারও অতীত, তার অর্থ ও ফলাফল প্রকাশ পাবে কালক্রমে।

ততদিন পর্যন্ত, আমার মনে হয়, শ্রেষ্ঠ করণীয় হবে শান্ত হয়ে থাকা, শ্রদ্ধা ও আস্থা নিয়ে আর আমাদের অন্তরাত্মার সমস্তটুকু আস্পৃহা নিয়ে—আমাদের অন্তরাত্মা, তা হ'ল আমাদের অন্তরে স্বয়ং মায়েরই মূর্ত্ত সান্নিধ্য, এবং তা রয়েছে আমাদের মধ্যে সদাসর্বদা।

তীর্থযাত্রীর পত্র*

বিভা চক্রবর্তী

মহাসমুদ্র তীরে—
কত দেশ হতে কত লোক আসে কত লোক যায় কিংবা।
পায়ে পায়ে কত চিহ্ন আঁকিয়া
ক্ষণিক স্মৃতির রেখাটি রাখিয়া
চলে যায় কোন দিগ্‌দিগন্তে বাসার বাঁধনে ঘিরে।
সেই রেখা হায়
মুছে মুছে যায়—
ক্ষণিকের দাগ ক্ষণিকে হারায়,
বিশাল বেলার বিকারবিহীন অসীম ছড়ায়ে থাকে;
চিরদিবসের স্মৃতিরেখাগুলি
সিন্ধু কুড়ায়ে রেখে দেয় তুলি
মহাতরঙ্গে ছড়ায়ে ছড়ায়ে অরূপের পাকে পাকে।

মহাসমুদ্র-তীরে
কতবার আমি এসেছি আবার কতবার গেছি ফিরে।
কোনই চিহ্ন রেখে যাই নাই
তার লাগি কোন ক্ষোভ নাই নাই,
নূতন করিয়া চিনেছি, ভুলেছি পুরাতন পৃথিবীরে।
খুঁজে খুঁজে পাই,
আবার হারাই
সেই চির-পুরাতনে।
যাহা ভুলে যাই, যাহা মনে নাই, নাই বা রহিল মনে?
মহাসমুদ্র আছে চিরদিন,
আছে তরঙ্গ বিরামবিহীন,
সুনীল সুদূর অনুপম ওই নীলাকাশ দিয়ে ঘেরা।
আমরা না রই কোন ক্ষতি নাই,
ক্ষণিকের প্রাণ তাই তো হারাই,
চিরদিন আছে চিরদিন রবে চিরদিনকার এরা।

---

* শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জনৈক সাধককে লিখিত

পত্রের উত্তর

এই মহাসাগরের তীরে
কত জন আসে যায়, কত জন পুন আসে ফিরে।
কত জন সব যায় ভুলে,
কত জন স্মৃতির ভাণ্ডার ভরি' সব রাখে তুলে।
কত জন বারবার আসে
লভিতে পরম শান্তি দিশাহারা চরম তিয়াসে।
আর কিছু বোঝে বা না বোঝে,
নিরানন্দ এ ধরায় আনন্দপরশটুকু খোঁজে।
তাই ছুটে আসে দলে দলে—
আছে কি সুধার স্বাদ এ-সিন্ধুর লবণাক্ত জলে?
নিষ্ফল আসা বা যাওয়া নয়—
অজানা অচেনা জনে আপনার জন করি' লয়।
যাহা দেখে তাই তার প্রিয়,
সন্ধানের শেষে যেন মিলিয়াছে আত্মার আত্মীয়!
মিটিয়াছে অন্তরের ক্ষুধা
হেরি' অপরূপ রূপে জাগিতেছে নূতন বসুধা।
কোন্ যাদুদণ্ড-স্পর্শ লেগে
অতীতের স্মৃতি লয়ে জন্মান্তর যেন ওঠে জেগে।
তুমি তাই জাতিস্মর-সম
চিনেছো আমারে আজি ভ্রাতা বলি, হে ভগিনী মম!

এই মহাসাগরের তীরে
উঠিছে মঙ্গলধ্বনি অবিরাম দেবতা-মন্দিরে।
মহাসমাধিতে আছে জাগি
মহাদেব-মহাদেবী ধরণীর রূপান্তর লাগি।
আহ্বান ধ্বনিছে অনিবার—
অণু-পরমাণু মাঝে করে তার শকতি-সঞ্চার।
ইচ্ছায় বা হোক অনিচ্ছায়,
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সে আহ্বানে শক্তি বুঝি পায়
নিখিল ধরার নরনারী
তুচ্ছ করি' নানা ক্লেশ, নানা বাধাবিঘ্ন অপসারি'

এই পুণ্যতীর্থক্ষেত্রে আসি
সম্মিলিত হয় সবে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা পরকাশি'।
একটি পরম শুভক্ষণে
দেবতার এ আহ্বান পশি' তব অন্তর-শ্রবণে
জাগিয়াছে দিব্যভাব-দ্যুতি,
জাগায়েছে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে রাধার আকূতি।
সে-ধ্বনির তীব্র আকর্ষণে
আবার আসিবে তুমি তাঁরি কাছে আত্মসমর্পণে।
এ যে তাঁরি কর্মলীলাভূমি,
তাঁরি লীলাসাথী মোরা, তাঁরি অংশসম্ভূতা যে তুমি।

পলকে নিষ্পলক
(ETERNITY IN HOUR)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ওকি? সন্ধ্যায় কে ও গান গায় ক্লান্ত অস্ত-লগনে
নিমেষের তরে—তবু নির্ঝরে কে চারু চারণী উছাসে
শুভ আগমনী বরণহরণী রাগিণী নূপুরনটনে?
প্রাণ পথ যার চেয়ে থাকে—তার ঘরায়ে আভাষ কে আসে?

সীমা-পিঞ্জরে মন কেঁদে মরে, তাই সে পল-কে গণে পল,
জানে না তো আজো—নিষ্কপনা, রাজো তুমি সীমাবুকে অসীমা,
তাই উদ্ভাসি' খনে খনে হাসি দেখা দাও আলো-শতদল!
অঘটনী মায়া—ছায়াবুকে কায়া বিকশি' অপারমহিমা!

তুমি আছ, ধরে নয়নের জলে তাই সংশয়গ্রন্থি,
তোমায় সাধন যে করে বরণ করে লঙ্ঘন হিমাচল,
বেদনাতিমিরে সেই আখিনীরে ডাকি—তুমি অভিনন্দি'
হাত ধরো এসে আলাপি' বিদেশে স্বদেশের রাগ উচ্ছল।

তারার দেয়ালি—সোনালি রুপালি—করে ঝলমল অমনি,
শাখাশাখী দোলে ফুলহিল্লোলে, আশায়ও রাতে নিরাশে,
অছন্দ বাঁধে মৃদঙ্গ বাজে, পোহায় বিরহ-রজনী!
কার-গে উদয়পুলকে অভয় চাহনি বিছায় আকাশে?

তুমি আছ, শুনি তব সুরধুনী, তবু কেন আজো পারি না
তোমার চরণে পরম শরণে সঁপিতে আমারে নিত্য?
তুমি হৃদে বাঁশি বাজায়ে উদাসী করো, তবু কেন হারি না?
প্রতি পদে হায় অতিথি তোমায় পায় না কেন এ-চিত্ত?

সুর তব রবা, আজ সাধিব না—গাহি' শুধু জয় তব জয়
আশিসে যাহার লুপ্ত আমার পরাজয়-গ্লানি-নিশা না!
তোমার মন্ত্রে হৃদয়তন্ত্রে ঝঙ্কারি' গুঠে বরাভয়,
অকূল পাথারে জপিয়া তোমারে মিলিল কূলের দিশা না।

আর পরীক্ষা নয় মা—দীক্ষা দাও আজ শরণাগতির,
আর সংশয় সন্দেহ নয়—এসো ধ্রুবতারা-মালিনী।
করিতে বরণ পারে এ জীবন যেন তব কৃপামন্ত্রীর,
এসো জাদুকরী প্রেম-অপ্সরী, তৃষ্ণাতাপনতারিণী।

অন্ধ আঁধার জ্যোতির্ঝঙ্কারবরে তব হ'ল লুপ্ত।
এ কী। মরি মরি। কান্না শিহরি' হ'ল হাসি কার পরশে।
বহিল সমীর, চিরন্তনীর তীর্থের পথমুক্ত।
বাধা বিদলিয়া পাষাণ ভেদিয়া ঝর্ণা উধাও হরষে।

গণিত-গণনা থাক—কল্পনা নয় তো তোমার স্নেহানন,
কোথা বন্ধন, ব্যথা, ক্রন্দন, উষরতা ?—অয়ি করুণা !
কী যুগান্তর ঘটে—অন্তর যেই গায় তব কীর্তন,
তোমার চাহনি-প্রসাদে অমনি মরুভূমে বয় যমুনা !

চকিত চমকে যে-তুমি পলকে নন্দিতা সৌদামিনী
দিক্‌দিগন্ত করো নিরন্ত শিহরণে প্রোজ্জ্বল মা,
সে-তোমার ভালোবাসাশিখা জ্বালো হৃদয়ে নর্মবাসিনী।
থেকো না অতনু —প্রতি তনু-অণু ছুঁয়ে করো নির্মল মা !*

---

* এ কবিতাটির প্রেরণা উৎস—সান্ধ্যপ্রার্থনার এক বিষণ্ণ লগ্নে একটি অভাবনীয় অঘটন। কিন্তু ব্রেক-এর কবিতার অনুভাবে লেখা নয়।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(Thoughts and Aphorisms)

(মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৩৫২—নিজের ধনগর্ব'ও করবেনা, আবার এও চাইবেনা যে তোমার দারিদ্র্যবরণ ও আত্মবিসর্জন দেখে লোকে প্রশংসা করুক। কারণ দুইই অহংকার জাগায়, একটা স্থূলভাবে আর একটা সূক্ষ্মভাবে।

৩৫৩—পরোপকার করা মানুষের পক্ষে ভালো বটে, কিন্তু তাতে যদি আত্মশ্লাঘা জন্মায় আর অন্যদের মধ্যে স্বার্থপ্রবৃত্তি জাগায় তাহলে তা ভালো নয়।

৩৫৪—পরোপকার সাধন করে আপন আত্মাকে বাঁচাতে পারো, কিন্তু দেখো যেন তাতে তোমার ভাইএর সর্বনাশ করা না হয়।

৩৫৫—আত্মশুদ্ধির পক্ষে আত্মত্যাগ খুব বড়ো অস্ত্র, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, বা জীবনের চূড়ান্ত পন্থা নয় কৃচ্ছ্র সাধন নয়, তোমার লক্ষ্য হবে কেবল ভগবানকে তুষ্ট করা।

৩৫৬—পাপ কাজ ও দুষ্কৃতির ফলে যে অনিষ্ট ঘটে তাকে চিনতে পারা কঠিন নয়, কিন্তু সাধুতাবোধ ও পুণ্যগর্বের ফলে যে অনিষ্ট ঘটবে তাকে চিনে নেবার মতো প্রখর দৃষ্টিও থাকা চাই।

বা এতে শ্রীঅরবিন্দ সকল দিকের সকল কোণ থেকে ধাপে ধাপে দেখাচ্ছেন যে সত্য আছে সকল বিপরীত ও বিভক্তিকে ছাপিয়ে, কেবল সামগ্রিক ও জ্যোতির্ময় ঐক্যের মধ্যে।

২৫।২।১৯৭০

৩৫৭—আগের কালে রাজত্ব করতো ব্রাহ্মণেরা তাদের যত শাস্ত্রাদি ও অনুষ্ঠানাদির জোরে; পরে ক্ষত্রিয়েরা রাজত্ব করলে তাদের চাল তলোয়ারের জোরে; এখন চলছে বৈশ্যদের রাজা তাদের কলকারখানা ও অর্থসামর্থ্যের জোরে; এর পরে শুদ্রশ্রেণী বা মুক্তিবাদী দাসের দল চাপ দিচ্ছে তাদের সমষ্টিগত কর্মশক্তিকে হাতিয়ার ক'রে রাজ্য চালনা করতে। কিন্তু পুরোহিত, বা রাজা অথবা বণিক কিংবা শ্রমিক, কেউই মানুষদের প্রকৃত নিয়ন্তা নয়; কাস্তেকোদালির স্বেচ্ছাচারও ব্যর্থ হবে আগেকার স্বেচ্ছাচারের মতো। কেবল যখন মানুষের ভিতরকার অধিবিকা নরে গিয়ে তার আত্মস্থ ভগবান প্রকট হয়ে বিশ্বজনীন শক্তির বিকাশ করবে তখনই পৃথিবীতে হবে সন্তোষ ও সুখের যুগ।

মা : এতে ব্যাখ্যার কিছু নেই, স্পষ্ট বলা হয়েছে ভগবানের রাজ্যই শুধু নিখুঁত। ২৬।২।১৯৭০

৩৫৮—মানুষ সুখ পেতে চায় সুখের আলাদায়ক বস্তুকে তাদের তাপিত বুকে চেপে ধরে ; অথচ এদিকে ভগবানের নির্মল আনন্দ তার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে, কেবল তাকে চিনতে পেরে ডেকে নিয়ে আত্মস্থাধীন করার জন্য।

৩৫৯—মানুষ যত তুচ্ছ সাফল্য ও সামান্য প্রভুত্বের জন্য প্রাণপাত ক'রে ক'রে শেষে বলহীন ও অবসন্ন ও ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে ; অথচ এদিকে ভগবানের অনন্ত শক্তি বৃথাই অপেক্ষা ক'রে আছে, কেবল তাকে সাদরে ডেকে নেবার জন্য।

৩৬০—মানুষ টুকরো টুকরো জ্ঞানবৃত্তান্ত খুঁজে খুঁজে একজোট ক'রে গেঁথে নেয় তাদের বিভিন্ন চিন্তাতত্ত্বের ক্ষণস্থায়ী শাস্ত্রবিভাগে, আর এদিকে সর্বময় অনন্ত প্রজ্ঞা মাথা ছাড়িয়ে আপন জ্যোতির্ময় মহিমার ডানা মেলে হাসতে থাকে।

৩৬১—মানুষ কেবল চেষ্টা করে তার আপন তুচ্ছ ও সংকীর্ণ অহংকে জড়িয়ে মনের ধারণাগুলি জড়ো ক'রে ক্ষুদ্র সত্তাটিকে তৃপ্তিদান করতে ; অথচ এদিকে স্থানকালাতীত আত্মা বঞ্চিত থাকছে এক অপূর্ব আনন্দময় অভাবাতীত সম্ভাবনা হতে।

মা অর্থাৎ এখন ঐসব অবস্থার পরিবর্তন দরকার যাতে ভগবৎ অতিমানস চেতনা পৃথিবীতে কার্যকরী হয়। সে চেতনা এখানে কাজ শুরু করেছে প্রায় বৎসরাধিক কাল, কিন্তু এখনও কি তাতে অবস্থার কিছু ইতরবিশেষ হলো ?...

২৮।২।১৯৭০

প্রশ্ন : মা, পৃথিবীতে অতিমানস চেতনা যখন সক্রিয় হয়েছে তখন তা সত্ত্বেও কি পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা বদলাবে না ?

মা বস্তুত তা এইভাবে হবে, প্রথমে চেতনার পরিবর্তন আসবে কেবল তাদের মধ্যে যাদের তেমন গ্রহিষ্ণুতা থাকবে, তার পরে ক্রমশঃ তার আরো সংখ্যা বাড়বে। সমষ্টিগত জীবনের পরিবর্তন আসবে অনেক পরে, হয়তো ব্যক্তিগত রূপান্তর ক্রিয়ার শেষকালে। কিন্তু এখনকার দিনে তার ফল দেখছি যে গণ্ডগোল আরো বেড়ে উঠেছে, আগেকার বাঁধা আইন আর খাটছে না, মানুষে (অল্প কয়েকজন ছাড়া) অন্ধ হয়ে থেকেছে, ভগবৎ বিধান মেনে চলতে পারছেনা।

১।৩।১৯৭০

৩৬২—হে ভারত আত্মা, কলিযুগের আচ্ছন্ন পণ্ডিতদের সঙ্গে কেবল মন্দিরে বা রান্নাঘরে লুকিয়ে থেকোনা, যত প্রাণহীন অনুষ্ঠানাদি ও দক্ষিণা প্রাপ্তির মধ্যে নিজেকে

আড়াল কোরোনা, আপন আত্মাকে চিনে ও ভগবানকে ডেকে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব ফিরিয়ে আনো, শাশ্বত বেদের প্রভাব নিয়ে ; বৈদিক যজ্ঞের গুপ্তসত্য প্রকাশ ক'রে আদি বেদান্তের মহিমা প্রকট করো।

মা : শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ধর্মীয় নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান ও বিধিবিধান থেকে মুক্তির কথা। অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃত জ্ঞান ফিরে পেয়ে স্বয়ং ভগবানের দেওয়া নির্দেশগুলির সত্যেরই মধ্যে জীবনযাপন করতে হবে। ২।৩।১৯৭০

৩৬৩—ত্যাগ মানে কেবল যে তা বস্তুত্যাগ ও কামনাবাসনা ত্যাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমন নয় ; কিন্তু, তোমার প্রতিটি চিন্তা ও ক্রিয়া ও মনভবকেও আপন অন্তরস্থ ভগবানের কাছে নিবেদন করো। তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং ঘুম ও জাগরণ পর্যন্ত যেন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হয়।

৩৬৪—নিয়মপালকরা বলে—এটা আমারই তৈরি শাস্ত্র বা আমার রচিত বিজ্ঞান নয়। মূর্খ। শাস্ত্রে লেখা জিনিস ছাড়া কি ভগবান আর কোথাও নেই, তার বাইরে ভালো এবং সত্য কিছুই নেই?

৩৬৫—কোন্ নির্দেশ অনুযায়ী আমি চলবো—ভিতর থেকে ভগবান বলছেন "হে আমার সেবক এই আমার ইচ্ছা" তাই কেবল শুনবো, কিংবা কয়েকজন মৃত লোকেরা যে শাস্ত্রবিধি লিখে গেছে তাই কেবল মানবো? না, যদি কাউকে ভয় করে তার আজ্ঞা মেনে চলতেই হয় তাহলে পুঁথিতে লেখা আইন বা পণ্ডিতের শাসানিতে ভয় না পেয়ে সেই ভগবানকে মেনে চলাই ভালো,

৩৬৬—তুমি হয়তো বলবে, তাতে যদি ঠকি, যদি তা ভগবানের সত্যি নির্দেশ না হয়? কিন্তু এটা আমি জানি যে তাঁকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলেও ভগবান কখনো কাউকে ঠকান না ; আমি দেখেছি যে আপাতত ঠকানো বোধ হলেও তিনি তাকে তার ঠিক রাস্তাতেই নিয়ে যান। তা ছাড়া আমি মনে করি যে মৃত শাস্ত্রবিধি মেনে বাঁচার চেয়ে, বরং জীবন্ত ভগবানের দেওয়া আঘাত মেনে নেওয়াও ভালো।

৩৬৭—আপন কামনা-বাসনাকে দমিয়ে রাখতে তখন শাস্ত্র মেনে চলবে, তাতে বল পেয়ে ভিতরকার শকুনিকে শাসিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু যদি শাস্ত্রের বদলে ভগবানকে মানো তাহলে শাস্ত্রসীমাকে ছাড়িয়ে তাঁরই চূড়ান্তে উঠবে।

৩৬৮—শাস্ত্রবিধান কেবল অন্ধ ও বৃদ্ধ লোকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য, না থাকলে সে টলে পড়ে ; কিন্তু তুমি পেয়েছ কৃষ্ণের জীবন্ত মুক্তির স্বাদ, সেই বন্ধুর হাত ধরে তুমি এগিয়ে যাবে বেদের আলো নিয়ে।

৩৬৯—বেদান্ত হলো ভগবানের বর্তিকা, অন্ধ অহমিকা ও বন্ধনের মধ্যেও সে পথ দেখাবে; কিন্তু ভিতরে যখন বেদের আলো দেখা দেবে তখন আর সেই বর্তিকা দরকার হবে না, কারণ সেই শাশ্বত সূর্যালোকে তুমি সুনিশ্চিত পথে অনায়াসে চলবে।

মা : ভিতরে পরম প্রভুর কি আদেশ তা কান পেতে শুনে নিতে চেষ্টা করো, যদি ঐকান্তিক হও তাহলে তিনিই তোমাকে তা শোনবার উপায়টি বাতলে দেবেন ও নির্ভুল আদেশ চিনিয়ে দেবেন। যারা খাঁটি সত্যকে অনুসরণ করতে চাইবে তাদের জন্য ঐগুলি হলো ধ্রুব নিশ্চয়তার কথা।*

১৩-১১-৭০

* অনুবাদ পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

প্রশ্নোত্তর

৩ মার্চ ১৯৫৪

প্রশ্ন : (বুলেটিন ১৯৫৪ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত "মৃত্যুভয় ও তা নিবারণের চারটি উপায়" নামক প্রবন্ধ থেকে)—মা, ওকে যা লিখেছেন তার মধ্যে এই শেষের উপায়টির অর্থ আমি বুঝিনি : "মৃত্যুভয় দূর করবার আরো একটি উপায় আছে যা খুব কম লোকেই পারে, কেবল জানিয়ে দেবার জন্য তা বলা হচ্ছে। তা হলো স্বেচ্ছায় সচেতনে জীবিত থেকেই মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশ করা ও আবার নরদেহে ফিরে আসা, সেখানকার ব্যাপার জেনে পুনরায় পার্থিব জীবন যাপন করা। অবশ্য এর জন্য রীতিমত শিক্ষা থাকা চাই।"

উত্তর ও-কথার অর্থ বোঝোনি? সেটা আশ্চর্য নয়। কেউ কি বুঝেছে?

এ পর্যন্ত আমি এ সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলিনি, কারণ তার জন্য আগে দরকার নিজেকে পুরোপুরি ভাবে জানা, নিজের ভিতরকার সব প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বশে রাখা, আর ভয় পাবার সম্ভাবনা মাত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া। এ হলো এমন একরকম জ্ঞান যাকে আধুনিক জগতে বিজ্ঞান বলা চলে না তবু বিজ্ঞান বলব এই অর্থে যে এর একটা নির্দিষ্ট রকম প্রণালী আছে যা ঠিক ঠিক মেনে চলতে পারলে নির্দিষ্ট রকমের ফলই মিলবে। আর এই চেষ্টা নিয়ে যদি লেগে থাকো তাহলে ক্রমশ উন্নতিও ঘটবে, নিয়মিত অনুশীলন করলে আধুনিক বিজ্ঞানের মতোই যুক্তিযুক্ত সাফল্য লাভ হবে। কিন্তু এর বাস্তবতা স্থূল জগতের বাস্তবতার মতো নয়। এর সঠিক অনুভূতি পেতে স্বতন্ত্র রকমের নৈপুণ্য অর্জন করা চাই, কারণ তা মামুলী ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়।

আমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ও নানারকম আছে, স্থূল দেহ ছাড়াও আছে আমাদের একটা সূক্ষ্মদেহ, তার ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি সূক্ষ্ম মার্জিত ও নিখুঁত, আর স্থূল ইন্দ্রিয়ের থেকেও জোরালো। কিন্তু সে সম্বন্ধে বর্তমান কালে কোনোরূপ শিক্ষা বা অনুশীলন না থাকায় তা এখন আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। কিন্তু শিশুরা প্রায় আপনা হতেই কতকটা সেরূপ অনুভূতির রাজ্যে থাকতে পারে। তারা স্থূল জিনিসের মতোই এমন অনেক কিছু দেখতে পায় এবং তার কথা তারা বলেও থাকে,—যদিও বড়োরা তাকে বোকামি বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু তাদের কাছে তা চোখে দেখার মতোই বাস্তব সত্য। তাদের দেখা সেই স্বপ্নগুলি তাদের কাছে বাস্তবের মতোই গুরুত্বপূর্ণ, কেবল পার্থিব ধরনের ভিন্নমুখী শিক্ষার ফলে ক্রমশ তাদের সেই সূক্ষ্ম শক্তি লোপ পায়। তবুও কেউ কেউ এমন আছে যারা বিশেষ আভ্যন্তরীণ অনুভূতির শক্তি নিয়েই জন্মেছে, সে শক্তি তাদের কিছুতে লোপ পায়না। এরা যদি তেমন ধরনের লোকের কাছে উপযুক্ত রকমের শিক্ষা পায় তাহলে তারা অদৃশ্য জগতের অনেক কিছুই জানতে ও আয়ত্ত করতে পারে। জগতে সকল যুগেই এমন ধরনের গুণীজনেরা তেমন শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এরূপ শিক্ষা

দেবার মতো নানা গুপ্তপ্রতিষ্ঠান থাকতো, কারণ সাধারণকে তা জানতে দেওয়া হতো না, তাতে ক্ষতি হতে পারতো,—কিন্তু মানব ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন সেগুলি ছিল সবিশেষ আদরণীয়,—যেমন প্রাচীন মিশরে, চাল্‌দিয়াতে, প্রাচীন ভারতে এমন কি খানিকটা গ্রীসে এবং রোমেও। মধ্যযুগের ইউরোপে এই জাতীয় শিক্ষার গোপন প্রতিষ্ঠান ছিল, কারণ ক্রীশ্চান রাজতন্ত্রে তা জানতে পারলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো, কোনো পুরুষ বা মেয়ে গুপ্তবিদ্যার কারবার করছে জানলে ডাইনি বলে তাদের পুড়িয়ে মারা হতো। আমাদের কালে এ বিদ্যা প্রায় লোপ পেয়ে আসছে, অল্প কয়েকজন মাত্র জানে, তবে এখনকার দিনে তার জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। লোকে যদিও সাধারণত এগুলি পছন্দ করেনা, কিন্তু এটা অপরাধ বলে শাস্তি দেওয়া বা পুড়িয়ে মারা হয়না। এখন অনেকে আস্ফালন করে বটে যে এই বিদ্যা আমি জানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুব কম লোকই তা জানে।

যাই হোক, এ বিদ্যা শিখতে হলে, যেমন বলেছি, প্রথমেই চাই আত্মজয়শক্তি, ত্যাগ-শক্তি, অহমিকাবর্জিত নিস্পৃহতা, তবেই নিরাপদে এতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। যদি কোনো স্বার্থের ভাব ওর মধ্যে থাকে, কামনার কিছু মাত্র গন্ধ থাকে, তাহলে এতে মারাত্মক বিপদ ঘটতে পারে। তাই এমন অদম্য সাহস থাকা দরকার যাতে বিন্দুমাত্র ভয় না ঢুকতে পারে কারণ ঐ সকল অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করলে প্রথমেই যা দেখা দেবে তা ভয়াবহ। তাই দেখে যদি ভয় না পাও তাহলে কোনো বিপদ নেই, কিন্তু কিছুমাত্র ভয় ঢুকলেই মহা মুশকিল হয়। তাই আগেকার দিনে এ বিদ্যার শিক্ষার্থীকে বহুদিন ও এমন কি বহু বছর পর্যন্ত কঠোর নিয়ম পালন করতে হতো, যতক্ষণ পুরো নির্ভীক নিরাপদ হতে না পারে। এই সব কারণেই আমি তোমাদের কাছে এতদিন এ বিষয় নিয়ে কিছু বলিনি। বুলেটিনের ঐ প্রবন্ধ তোমাদের জন্য লেখা হয়নি, সারা জগতের এখানে ওখানে যারা প্রস্তুত আছে কেবল তাদের জন্য। কিন্তু তবু এখন তোমাদের কাছে বলছি, এর মধ্যে কারো যদি এ বিষয়ে প্রকৃত আগ্রহ থাকে, কেউ যদি সমস্ত ভয়কে ও দুর্বলতা ও অহংকারকে জয় করতে পারে, তাহলে তাদের আমি সাহায্য করতে পারি এবং এই গুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে প্রকাশ করে বলতে পারি। এই যাঃ! কিন্তু এর জন্য তোমাদের আরো কিছু প্রস্তুত ও পরিণত হওয়া দরকার।

প্রশ্ন : মা, কখন প্রস্তুত হতে পারা যাবে?

উত্তর : তা নির্ভর করবে তোমার নিজেরই উপর গো ছেলে! আমি এ বিদ্যা শিখে-ছিলাম বারো বছর বয়সে। তবে আমার মধ্যে ভয় বলে কোনো কিছু ছিল না! দেহ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যখন যাওয়া হয় তখন থাকে দেহের সঙ্গে অতিসূক্ষ্ম একটা সংযোগসূত্রের বাঁধন মাত্র, সেটুকু ছিঁড়ে গেলেই সব খতম, জীবনের শেষ। আর বেরিয়ে গিয়ে যা নজরে পড়ে তা ভয়ংকর। তুমি দেখবে যে তুমি বাতাসশূন্য, হয়তো কিছু একটা কেবল নীল বা সাদা মতন, আর চারদিকে মেঘপুঞ্জ, সূর্যরশ্মিও আছে, তা সুন্দর হলেও দেখবে যে অসংখ্য ক্ষুদি ক্ষুদি সত্তা, বা অসংখ্য পরিত্যক্ত ও তুচ্ছ কামনা ও মনঃসত্তার বিকৃতিমাত্র, তারা ভিড়

ক'রে তোমাকে চেপে ধরবে, কখনো বা অতি কুৎসিত হবেন। তাদের আক্রমণে ভয় পেলে তারা আরো বীভৎস হবে। কিন্তু নির্ভয়ে লক্ষ্য করলে দেখবে যে কুৎসিত হলেও ভয় করার কিছু নেই।

এখানে একটা ছোটো গল্প বলি। একজন সুদক্ষ ডেনিশ চিত্রকর আমার কাছে এ বিদ্যা শিখতে চেয়েছিল। সে লোকটি এখানেও এসেছে এবং শ্রীঅরবিন্দের ছবিও করেছে, গত যুদ্ধের সময়—সে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আমার কাছে শিক্ষা নিতে চাইলে। আমি তাকে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে কিছু বললাম, আর বিশেষ ক'রে বলে দিলাম যে ভয় পেলে চলবেনা। এরপর সে একদিন এসে বললে যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তা আসলে স্বপ্ন নয়, কারণ দেহত্যাগ শিখে সেই কাজই সে করেছিল। দেহ থেকে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে যে এক ভীষণাকৃতি বাঘ খারাপ মতলব নিয়ে তার দিকে তেড়ে আসছে। কিন্তু তার স্মরণ ছিল যে আমি বলেছি কোনো কিছুতে ভয় পেলে চলবে না "ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ অভয়ের শক্তি আমাকে রক্ষা করছে, কেউ আমার অনিষ্ট করতে পারবেনা", এই ভেবে সে নির্ভয়ে চেয়ে রইল। তখন দেখলে যে বাঘটা ক্রমশ সংকীর্ণ হতে হতে খুব ছোটো আকারের একটা বেড়ালে পরিণত হয়ে গেল। (হাস্য)

প্রশ্ন না, ঐ বাঘ হলো কিসের প্রতীক ?

উত্তর বোধ করি ..সেদিন ঐ লোকটি একজন কারো উপর খুব রেগে তার অমঙ্গল চিন্তা করে, ভেবেছিল যে তার নিশ্চয় কিছু অমঙ্গল হবে। গুহাবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ধরণের চিন্তা প্রক্ষেপ আবার "ফিরে আসে।" অর্থাৎ কারো মন্দ হোক ভাবলে সেই ইচ্ছাশক্তি ফিরে এসে তোমায় প্রত্যাঘাত করতে পারে। সেই কারণে বলা হয় চিন্তাকে ও মনোভাব ও অনুভবাদিকে সংযত রাখতে, কারণ যদি রাগের বশে ভাবো যে কারো ক্ষতি হোক, তখন হয়তো স্বপ্ন দেখবে যে সেই লোকই এসে তোমাকে আক্রমণ করছে। তুমি হয়তো না জেনে বলবে," আমি তো উচিত কাজই করেছিলাম !" কিন্তু তা হয়না, তোমার মন্দ চিন্তা আবার তোমার দিকেই ফিরে আসে। যার বিরুদ্ধে তুমি ঐ চিন্তা করেছ সে হয়তো কিছু জানেনা, (গুহাবিদ্যার ক্ষেত্রে এইরকমই হয়) অথচ তুমি ইচ্ছা করেছ যে তার কিছু দুর্ঘটনা ঘটুক, আর সেই ব্যক্তি যদি উচ্চ ধরণের চেতনা নিয়ে নিবিকার ভাবে থাকে, তাহলে তোমার সেই অনিষ্ট চিন্তা তার আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকতে না পারায় আবার তোমারই দিকে ফিরে আসে। এমনি করে অনেক মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এমন হয়েছে যে কেউ হয়তো একজনের উপর এমনি হীন ধরনের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে গেছে কিন্তু সে লোকটি উচ্চ স্তরের হওয়াতে তাকে স্পর্শ করতে না পেরে প্রয়োগকারীর দিকেই ফিরে মারাত্মক হয়েছে। যদি এইভাবে কেউ মৃত্যু কামনা করে তবে ঐ কারণে তার নিজের মৃত্যু হতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দের বাড়িতে ঢিল পড়ার গল্প হয়তো তোমরা জানোনা কিন্তু সকলেই জানে সে কথা, সুতরাং তা আর এখানে বলবনা।

প্রশ্ন : সেই বস্তু ইচ্ছা অনিষ্ট করার পর কি হয়? তার ক্রিয়া কি পরে আরো হয়?

উত্তর : না তা নয়, সে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একটা কাজই করে। সে কাজ শেষ হলে আর তার টিকে থাকার কোনো কারণ নেই। তার কাজটি ফুরিয়ে গেলে সেও নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে অল্পবিস্তর স্থায়ী ধরণের ক্রিয়াও নানারকম আছে। এও তো একটা বিদ্যা, তুমি কি একঘন্টার মধ্যে গোটা কেরিস্ট্রী শিখে ফেলতে পারো? মোট কথা, সে শক্তির ক্রিয়া যদি ফিরেও আসে তবে সেখানেই তার কাজ শেষ, আর কিছু তার কাজ নেই।

প্রশ্ন না, সকলেই সেই চিল পড়ার কথা জানেনা। আপনি শুধু ছোটদের বলেছেন।
উত্তর হাঁ, ছোটদের বলেছি...

প্রশ্ন : বড়োরা সেখানে ছিলনা। (হাস্য)
উত্তর : এখন নটা বেজেছে। আর কোনো প্রশ্ন নেই? সে গল্প এখন বলতে...

প্রশ্ন আজ সকালে বলেছিলেন যে সেটা বলবেন...
উত্তর তা, ও ছাড়া আরো অনেক গল্প আছে। কতগুলো বলব?

অন্য একটা ছোট গল্প বলি, তাও শোনবার মতো। ভয় নিবারণের গল্প। একজন ফরাসী বিজ্ঞানী (নামটা বোধ হয় পবিত্র জানে) তার বইতে লিখেছে Jardin des Plantes-এ তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা। অর্থাৎ ভয়ের প্রতিক্রিয়ার উপর বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রিয়া সম্পর্কে। তার নাম ভুলেছি কিন্তু গল্পটা বেশ মনে আছে। সে জানতে চাইছিল যে স্বতঃস্ফূর্ত অবচেতনিক প্রতিক্রিয়ার উপর যুক্তিবুদ্ধির কাজ কতখানি ফলতে পারে। প্যারিসে সে গিয়েছিল Jardin des Plantes নামক স্থানে, সেখানে নানা গাছপালাও আছে আর জন্তুজানোয়ারও অনেক রাখা আছে। অনেক বড়ো বড়ো সাপ সেখানে থাকতো। তার মধ্যে একটি সাপ ছিল খুব বদরাগী ও ক্রূর প্রকৃতির (আমি জানতাম তাকে)। সামান্য একটু উস্কানি দিয়ে তাকে রাগানো যেতো। নিখুঁ কালো প্রকাণ্ড সাপ, দেখতে খুব সুন্দর। রক্ষক বললে, সে তেড়ে আসে বলে তাকে পুরু কাচ দিয়ে ঘেরা খাঁচার মধ্যে রাখা হয়েছে। সেই বিজ্ঞানী গেল ঐ সাপটির কাছে, তখন সে অভুক্ত ও ক্ষুধিত অবস্থায় খুব সজাগ আছে (খেতে পেলেই সে ঘুমিয়ে পড়তো)। বিজ্ঞানী তার খাঁচার সামনে খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে ইঙ্গিতে তাকে উত্তেজিত করতে থাকল। সাপটা রেগে স্প্রীংএর মত ছিটকে লাফিয়ে এসে সজোরে ওর মুখের সামনে কাঁচের উপর ছোবল মারলে। বিজ্ঞানী যদিও বেশ জানে যে তাতে তার কোনো ক্ষতি হবেনা, তবু সে তৎক্ষণাৎ চমকে উঠে পিছু হটে গেল। যতবার সে ঐরকম করলে ততবারই সাপ ছোবল মারলে, কিন্তু চেষ্টা ক'রে একবারও সে নিজেকে সংযত রাখতে পারলেনা। একবারও সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেনা। প্রতিবারেই সে পিছু হটতে বাধ্য হলো।

ঐভাবে সে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছে। কিন্তু একটা কথা তার বলা হয়নি,

ঐ সাপটির প্রাণসত্তা থেকে তীব্র স্নায়বিক শক্তি প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাতেই বিজ্ঞানীকে যত বিচলিত করেছিল। সে বৃথাই চেষ্টা করেছিল স্থির হয়ে থাকতে, বৃথাই নিজেকে বোঝাচ্ছিল, "সামনে তো পুরু কাঁচের আড়াল রয়েছে তবে ভয় কিসের।" (হাস্য) বস্তুত সে তারই আঘাতে শক্ পেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল।

আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। চিল পড়ার গল্প অন্যদিন হবে, এখন দেরি হয়ে গেছে।

১০ মার্চ ১৯৫৪

প্রশ্ন : ঠিক এই সময়টিতেই আপনি মৃত্যুভয় সম্বন্ধে বুলেটিনে লিখলেন কেন?
উত্তর এখন ঐ সম্বন্ধে বলার দরকার হয়েছিল।

প্রশ্ন আগে তো কখনো বলেন নি, তবে এখন কেন?

উত্তর : আ! তা, আগে তো অনেক কিছুই আমি বলিনি। একদিন তো বলা দরকার, আগে কারণ ঘটেনি তাই বলিনি। হয়তো কোনো অনুভূতি থেকে তা এসেছে ...হাঁ, পরে অবশ্য ভেবেছিলাম যে কেউ হয়তো ওর বিশেষ তাৎপর্য ধরে নেবে, কিন্তু তা কিছু নেই! (হাস্য) সেগুলো তোমাদের নিজের মধ্যেই হয়তো তৈরী হয়।

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, আশ্রমের মধ্যে যখনই কেউ মারা যায় তখনই অনেকের মনে খুব আতংক জাগে। এটা আমি ভালো মনে করি না! হয়তো এই কারণেই মৃত্যুভয়ের কথা লিখেছিলাম। কারণ এখন ঐরকম হৃৎকম্প বা আতংকের ভাবকে ছাড়িয়ে ওঠা দরকার। প্রথম এই আশ্রমে যখন একটি মৃত্যু ঘটল তখন যে কি ভয় ও উদ্বিগ্নতা দেখেছি সে কথা আমার মনে আছে। এমন অনেককে জানি, তাদের নাম করতে চাইনা, যারা এখানে থাকতে এসে (বেশি বয়সে) ধারণা ক'রে নিলে যে এখানে এসেই যখন বাস করছে তখন বুঝি তারা আর মরবে না। এটা অনেক দিন আগের কথা। তার পর যেমনি একজন মারা গেল অমনি তাদের মনে আতংক ঢুকল। আমাদের কাছে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল "এমন কেন হলো? তাহলে তো আমরা নিরাপদ নই।" আমি তাদের বলতে বাধ্য হলাম যে তেমন অমর জীবন লাভ করতে চাইলে অনেক কঠিন প্রচেষ্টার দরকার, শুধু তাই নয় অনেক আসক্তি ত্যাগ করা দরকার, যা তোমরা কেউ পারো না। অর্থাৎ তারা বরং পুরোনো অভ্যাসগুলোকে বজায় রেখে মরতেও রাজী হবে কিন্তু সমস্ত ত্যাগ ক'রে অমর হতে নয়। কিন্তু তা চাইলে অনেক কিছু ছাড়তে হয়।...আমি ঐ প্রবন্ধে এ কথা বলেছি বটে কিন্তু তা ছাড়া আরো অনেক কথা আছে। ব্যক্তিগত সুখ বলতে যা কিছু সমস্তই ছাড়া চাই। অনেক দিন আগে একজনকে বলেছিলাম দৈহিক রূপান্তরের কথা, যে সেই অবস্থাতে আর খাদ্য গ্রহণের দরকার হবেনা, সরাসরি বিশ্বশক্তি বা ভগবৎ শক্তি থেকে শক্তি সংগ্রহ করবে। এই কথা শুনে সেই লোকটি মহা উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, "এত সব ভালো ভালো জিনিস খাওয়া একেবারে বন্ধ করতে হবে?" (হাস্য)

প্রশ্ন : না, ধরুন আমরা যদি অমর হই, তাহলে সৃষ্টিও তো থেমে যাবে?
উত্তর কিসের সৃষ্টি?

প্রশ্ন : এই মানুষ সৃষ্টি।
উত্তর : ও, হাঁ, তা ঠিক কথা। এমন কি অমর হবার অনেক আগের থেকেই তা হবে। কেউ যদি প্রকৃতই খাঁটি রূপান্তরের একটুও চায় তাহলে তাই হবে। সেকথা আমি আগেও যেন বলেছিলাম...

প্রশ্ন ভয়ই কি মৃত্যুর একমাত্র কারণ?
উত্তর না না, তা নয়, এমন কথা কখনো বলিনি। আমি বলেছি যে মৃত্যুকে জয় করতে হলে প্রথমে মৃত্যুভয়কে দূর করতে হবে, কিন্তু সে হলো স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ভয়ই যে মৃত্যুর কারণ তা বলিনি।

প্রশ্ন আপনি বলেছেন "মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়াও যায়না আর এগিয়ে দেওয়াও যায় না। জীবনে অগ্রগতির বেগ্রাদ থেমে গেলে তখন মৃত্যু আসে। সুতরাং যদি অগ্রগতির কাজ চলতে থাকে তখন মৃত্যুকে পিছোনো যায়।" কিন্তু এর অর্থ কি এই হবে যে মৃত্যুর সময়টা জন্মের সময় থেকেই পূর্বনির্দিষ্ট করা থাকে?

উত্তর না। ও হলো অন্য স্তরের কথা। কোথায় যেন বলেছিলাম মৃত্যুকে ডেকে নিলে মৃত্যু আসে। যদিও সেটা হলো ওকথার বিপরীত, কিন্তু তবু তা সত্য। আমি আগে কোথায় লিখেছি, এ সম্বন্ধে দুইরকম দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এ প্রবন্ধে যা বলেছি তা হলো স্থূল চেতনার তরফের কথা। কিন্তু আগে অন্যত্র বলেছি যে নিয়তিবাদ বিভিন্ন স্তরের হয়। যেমন, দেহ অস্তিত্বের নিয়তি, প্রাণের অস্তিত্বের নিয়তি, মনের অস্তিত্বের নিয়তি, উচ্চমানস ও চৈত্য অস্তিত্বের নিয়তি, অতিমানস অস্তিত্বের নিয়তি। এই সবগুলিকে একত্রে মিলিয়ে হয় মানুষের নিয়তি। কিন্তু যখন দেহের নিয়তি অনুযায়ী হঠাৎ মৃত্যু অবধারিত, তখন যদি অতিমানস নিয়তির মতো কোনো উচ্চ নিয়তির আওতার মধ্যে চলে যাও এবং দুই নিয়তি মিলে যায়, তখন দেহের মৃত্যু অবধারিত থাকলেও সে নিয়তি বদ্‌লে গিয়ে মৃত্যু পিছিয়ে যাবে।

ও প্রবন্ধে এ সব কথা বলা হয়নি, কেবল স্থূল দিকের কথাই বলেছি। আমি বলেছি তাদের কথা (যারা মন প্রাণ দেহের স্থূল চেতনাতে আছে)—যারা পঞ্চাশের পর থেকেই মৃত্যুর প্রত্যাশা নিয়ে থাকে, অথচ বাঁচে হয়তো সাতাশি বছর। এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা, আবার এমনও জানি যে কোনো ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচতে চেয়েছে, কারণ তার অনেক কিছু করা বাকী আছে, সুতরাং তাড়াতাড়ি মরে গেলে চলবেনা—কিন্তু খুব সাবধানে থাকলেও সে তাড়াতাড়ি মারা গেছে। এ সব ঘটনা বিপরীত মনে হলেও তার হেতু থাকে, ভিন্ন নিয়তির বিধান অনুযায়ী। কিন্তু ঐ প্রবন্ধে বলেছি কেবল স্থূল দিকের কথা।

উচ্চতর নিয়তির স্তরে না যেতে পারলে তুমি কোনো কিছু বলতে পারো না তোমার

নিয়তি সম্বন্ধে। তোমার দেহ-অস্তিত্বের নিয়তিকে বদলাবার পক্ষে তাই একমাত্র উপায়। স্থূল চেতনাতে থেকে তোমার নিয়তি বদলাবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে একটি ছেলেকে জানতাম, সে শুনেছিল যে বন্দুকের গুলিতে তার মৃত্যু অবধারিত, এমন কি তার একটা সম্ভাব্য তারিখও বলা হয়েছিল। তাইতে সে ভয় পেয়ে লম্বা ছুটি নিয়ে প্যারিসে ফিরে গেল। পকেটে তার সঙ্গে পিস্তল থাকত। একদিন সে ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গেল, তাইতে পকেটের পিস্তলের গুলি ছুটে তাকে লাগল, তাতেই তার মৃত্যু হলো।

এমনতরো দৃষ্টান্ত আমি অনেক বলতে পারি। সেগুলি সবই মন-প্রাণ দেহগত স্থূল নিয়তির স্তরের কথা। কিন্তু উচ্চতর স্তরের ও উচ্চতর জ্ঞানের সংস্পর্শ ঘটলে ও তার নিয়তি নেমে এলে অনেক অঘটনঘটন হতে পারে। যদি পার্থিব জীবনে অতিমানসের অবতরণ হয় তাহলে তাতে দিব্য রূপান্তর হয় অর্থাৎ সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। কিন্তু তা কেবল ঐ শর্তে। প্রবন্ধে তা বলিনি।

তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন : আমরা ভয় কেন পাই?

উত্তর : প্রাচীন প্রবাদবাক্যে বলে যে অমঙ্গলকারী বিরোধী শক্তিরা পৃথিবীতে মানুষদের জন্য এই ভয়ের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। কিন্তু শুধু তো মানুষ নয়, পশুপাখিদেরও ভয় আছে। সুতরাং ঐ যুক্তিটা ঠিক খাটে না, কারণ পশুদের উপর বিরোধী শক্তিদের কোনো অধিকার নেই।

ভয় হলো অচেতনার ক্রিয়া, অজ্ঞানতা জনিত একরকম নিপীড়ন। কোন একটা জিনিস সম্বন্ধে তুমি কিছু জানতে পারছ না, তার কি কাজ ও কি তার ফল হবে তা আগে তোমার জানা নেই, যে আজ করতে যাচ্ছ তার যে কি ফলাফল তা টের পাচ্ছ না, এমনি আরো অনেক কিছুর সম্বন্ধেই তুমি অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানতা থেকে ভয় জন্মায়। তুমি যা জানোনা তাকে ভয় করো। একটি শিশুকে তার অজানা একজন লোকের কাছে নিয়ে যাও (সাধারণ শিশু, যার আভ্যন্তরীণ চেতনা জাগেনি), সে তাকে দেখে প্রথমেই ভয় পাবে। খুব কম শিশুই এমন আছে যাদের চেতনা ওর থেকে অন্যরকম, যারা সাহসী। আর তা ছাড়া সহজাত প্রবৃত্তি হতে বিপদের সম্ভাবনা বলে হলেও তখন ভয় আসে। যখন দেখ যে কোনো বিপদ আসন্ন যার প্রতিকার নেই, নিজেকে রক্ষা করা যাবেনা, তাতেও ভয় আসে। আরো কারণ আছে অসংখ্য। কিন্তু সবই অচেতনার থেকে,

যে জেনেছে তার ভয় থাকে না। যা জাগ্রত ও সচেতন ও সজ্ঞান তার মধ্যে ভয় নেই। কেবল যা অদৃশ্য, অন্ধকার, অজানা, তাকেই ভয়।

ভয় জয় করবার পক্ষে বস্তু ওষুধ হলো যাকে ভয় করছ তার সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়ানো। বিপদের সামনে দাঁড়াতে পারলে আর ভয় থাকেনা। যোগ ও তপস্যার সাফল্যের পক্ষে এই জিনিসই শেখানো হয়। প্রাচীন নিশরে গুহ্য বিদ্যার শিক্ষারীতিতে মৃত্যুভয়কে একেবারে নির্মূল করা শেখানো হতো। প্রথম ও আনাড়ি শিক্ষার্থীকে পাথরের শবাধারের মধ্যে মড়ার মতো ক'রে শুয়ে থাকতে হতো। অবশ্য তাতে খাদ্য ও

নিঃশ্বাস গ্রহণ করা বন্ধ হতো না, কিন্তু তা ছাড়া মৃতের মতো থাকতে হতো। ওতে নাকি ক্রমশ মৃত্যুভয় জিনিসটা ঘুচতো।

ভয় উপস্থিত হলে তখন যদি তার উপরে চেতনার, জ্ঞানের, শক্তির আলো ফেলতে পারো, তাহলে তা চলে যাবে। খ্রীষ্ট ধর্মে বলে যে ইডেনের উদ্যানে নিষিদ্ধ আপেল ফল খাওয়াতে যে জ্ঞানচৈতন্য প্রবেশ করল তারই থেকে ভয়ের সৃষ্টি, আর সেই ভয়ই কাজ করছে পৃথিবীর সমগ্র মানব জীবনে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমি সেই যুক্তিটা দিতে চাই যে পশুদের মধ্যেও ভয় আছে, তারা তো নিষিদ্ধ ফল খায়নি, কোনো পাপও করেনি, সুতরাং তাদের মধ্যে ভয় থাকা তাহলে উচিত নয়। আসলে একটা অর্ধচেতনার সঙ্গে অন্ধ প্রবৃত্তি জড়িয়ে থাকাতে বিপদকে দেখা হয় খুব বড়ো ক'রে, অথচ তাকে নিবারণ করার উপায়ও জানা নেই। আর এটাও ঠিক কথা যে বিরোধী শক্তিরা যারা ভগবানের কাজে বাধা দিতে তৎপর, তারা এই ভয় জিনিসটারই যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে। এরাই তারা মানুষকে সব চেয়ে বেশি অভিভূত করে ফেলে। আর কেবল ওরাই নয়, আমাদের মধ্যে অনেক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাও ঐ জিনিসের প্ররোচনা দেয়। এমন অনেক ধর্ম আছে যাতে বলে যে অমুক অমুক নিয়মগুলি মেনে না চললে মৃত্যু আসতে পারে এবং মৃত্যুর পরেও তার জন্য অনেক দুঃখভোগ হতে পারে।

আরো একরকম অসুস্থ বা বিকর্ষণ প্রকৃতি থেকেও ভয় জন্মায়। কেউ বা ভয় করে আগুনকে, কেউ ভয় করে জলকে, কেউ বা কোনো জন্তুকে। সেখানে প্রাণের স্পন্দনে অসাবধানতা ঘটে। এইরূপ দৈহিক অচেতনা থেকেও ভয় আসে। দেহ তো অচেতনাময়, তার মধ্যে চেতনা আনতে কতই বেগ পেতে হয়।

দেহ অচেতনেও বাঁচে কেবল অভ্যাসের দ্বারা। ওতে আর কি বা হবে?

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, "মৃত্যুর সবটা যেন বাকিই থাকে, কেবল বিরল কয়েকজনের পক্ষে ব্যতিক্রম হয়, যাদের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বিশিষ্ট শক্তি থাকে।"

উত্তর : হাঁ, তাই তো এতক্ষণ বললাম। দৈহিক অস্তিত্বের নিয়তির মধ্যে খুব কম লোকই অন্যরূপ নিয়তি আনতে পারে এবং তারাই পারে মৃত্যুকালের অদলবদল করতে। তার মানে স্থূল চেতনার মধ্যে আরো উচ্চতর চেতনাকে নামিয়ে আনা বা সঙ্গে আনে উচ্চতর নিয়তি, তাতেই দেহ নিয়তির পরিবর্তন হয়। কিন্তু তেমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম, নিতান্তই অল্প।

প্রশ্ন : মৃত্যুজয়ের শেষ উপায় বলেছেন জীবিত থেকেই মৃত্যুর রাজ্যে সচেতনে প্রবেশ করা।

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : সচেতনে কেবল দেহ ছেড়ে যাওয়া আর মৃত্যুরাজ্যে ঢোকার মধ্যে প্রভেদ কি? অনেকে তো দেহ ছেড়ে বেরোতে পারে এমনিতেই, তা নয় কি?

উত্তর : হাঁ, কিন্তু তারা মৃত্যুর রাজ্যে যায় না।

প্রশ্ন : কিন্তু দুই জিনিসের পক্ষে উপায়টা কি একই রকমের?

উত্তর : হাঁ, কিন্তু তা কেবল গোড়ার দিকে। প্রথমে শিখতে হয় কেবল দেহ ছেড়ে বেরোনো, অনেকে ঘুমের সময়ে দেহ ছেড়ে যায়। তার মধ্যে অনেকে যায় অজ্ঞানে, কিন্তু কেউ কেউ যায় সজ্ঞানে। কিন্তু তবু তারা থাকে স্থূল জগতেরই মধ্যে। বড় জোর মনোময় জগৎ পর্যন্ত যেতে পারে কিন্তু মৃত্যুর রাজ্যে নয়।

কেউ কেউ এতটা যেতে পারলেও কিন্তু...দেহ ছেড়ে বেরোলেও দেহের সঙ্গে তার একটা সূক্ষ্ম বন্ধন থাকে—তা হতে পারে মনের বা প্রাণের বা চৈত্যের সূক্ষ্ম বন্ধন। তার সঙ্গে যদিও দেহ বা প্রাণ বা মনের অনেক কিছু বেরিয়ে যায় তথাপি অবশিষ্ট জিনিস দেহের মধ্যে থাকাতে দেহ সমাধিস্থ হয় না। কেউ কেউ সেই ঘুমের মধ্যে নড়াচড়াও করে, কারণ প্রাণসত্তার স্থূল অংশ দেহের মধ্যেই রয়ে গেছে। যতক্ষণ তা রয়েছে ততক্ষণ তুমি প্রাণরাজ্যেই আছো। প্রথম কথা, প্রকৃত মৃত্যুর সময় যে অংশ দেহ থেকে বেরোয় তাকে এমনি বের করা সহজ নয়। তার জন্য বহুকালের দীর্ঘ ও কঠোর শিক্ষা ও সাধনা চাই। তার জন্য যে বিশেষ প্রণালী আছে তার অনুসরণ করতে হয়। সে ক্ষমতা আয়ত্ত হলে দেহ তখন থাকে মূর্ছার অবস্থাতে, যেমন হয় মৃত্যুকালে। এমন কি দেহটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যায়। এতখানি আয়ত্তে আনা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। আর ঐ অবস্থার কালে একজন রক্ষকের কাছে থাকা চাই, যাতে সেই দেহের কোনোরূপ অনিষ্ট ঘটতে না পারে। একা একা এমন কাজ হয়না, পাহারা দিতে একজন তখন থাকা দরকার।

কিন্তু তবু আমি যে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি তা ওর চেয়ে আরো কঠিন। তাতে দেহ এমন মূর্ছিতবৎ হয় যে সংযোগসূত্রও ছেড়ে গিয়ে মৃত্যুর অবস্থাই আসে, এমন কি হার্টের ক্রিয়াও থেমে যায়। তথাপি থাকে "দেহজীবন", কারণ সে অবস্থা সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃত; কাজেই পরে আপন শক্তিতে সে আবার জীবনসূত্রকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তবে এটি সহজ কথা মোটেই নয়, খুবই কঠিন জিনিস। কাগজে কলমে বলা সহজ কিন্তু কাজের বেলাতে তা নয়।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন—কয়েকজন মাত্রই তা পারে। তার মানে নিশ্চয় কেউ কেউ তা পেয়েছে। তাহলে তারা অমরত্ব পেয়েছে, কারণ...

উত্তর : না না, তা নয়, অমরত্বের কথা আমি কোথাও বলিনি। কেবল বলেছিলাম মৃত্যুভয় দূর করার সম্পর্কে। তা হলো স্বতন্ত্র কথা।

প্রশ্ন : কিন্তু তারা তো মৃত্যুর রাজ্যে যাতায়াত করতে পারে?

উত্তর : হাঁ, তা পারে, কিন্তু তখন দেহটি থাকে অটুট অবস্থাতে। তাই তাকে

আবার স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরিয়ে আনা চলে,—আর খুব বহুক্ষণের জন্য কেউ ঐ অবস্থাতে দেহ ছেড়ে বাইরে থাকেনা।

প্রশ্ন : কিন্তু তারা যখন এমন করতে পারে, তখন আসল মৃত্যুর বেলাতেও তো পারবে?

উত্তর : দেহ ভালো অবস্থাতে থাকলে পারে। কিন্তু মৃত্যুকালে তা তো হয় না। তার আগে দেহই যে বিগড়ে যায়, দেহে কোনো বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় আসে। আর যদি কোনো মারাত্মক অবস্থা ঘটে তখন আর ফিরে আসার ক্ষমতা থাকে না, যেমন বুকে ছুরি মারা বা মুণ্ডচ্ছেদ করা। কেবল দেহ যদি বেশ সুস্থ থাকে, হয়তো সামান্য ভারসাম্য মাত্র নষ্ট হয় তাহলে ফিরে আসা যায়।

প্রশ্ন : না, যদি তার সংযোগসূত্র কেটে যায়, তখন কি হয়?

উত্তর : সংযোগসূত্র কেটে গেলে? তখন মৃত্যুই হয়।

প্রশ্ন : আর যে অংশ দেহ ছেড়ে গেছে তার কি হয়?

উত্তর : সে যদি যথেষ্ট চেতনপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সে চেতনা তার থাকেই। পুরোপুরি চেতন থেকে সে তার মুক্তজীবন যাপন করে। দেহশূন্য হলেও তার অস্তিত্ব বদলায় না। সে চেতনা বাড়েও না কমেও না, তার চেতনা ও জ্ঞান ও শক্তি তেমনি বজায় থাকে। এমন অবস্থায় তার দেহনির্ভরতার দরকার হয়না। তার চেতনা বজায় রাখতে যে দেহ থাকা চাই এমন নয়। সে চেতনা তার মুক্ত।

প্রশ্ন : "মৃত্যুর সত্তা" কথাটার অর্থ কি?

উত্তর : বিভিন্ন ধর্মে ওর বিভিন্ন অর্থ। গ্রীকরা বলতো Elysium (অর্থাৎ দিব্যধাম) যেখানে "নৌকাতে" পার হতে হয়। এমনি স্বর্গ নরক বলা হয় নানাবিধ।

প্রশ্ন : না, আমি ধর্মের দিকের কথা বলছি না।

উত্তর : সাধারণত "মৃত্যুর জগৎ" বলা হয় প্রাণময় জগৎকে, যেখানে মৃত্যুর পরে প্রথম গিয়ে পড়তে হয়। ব্যক্তির জীবনের সব চেয়ে চেতন অংশ হঠাৎ ওখানে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই প্রাণময় জগৎটা অন্ধকার, সেখানে থাকে কামনাময় নানা বিরোধী সত্তা, তারা ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে মুমূর্ষু রক্তশোষকের মতো তাকে তখন ঘিরে ধরে। মৃত্যুকালে যে শক্ লাগে (কারণ খুব লোকই তা এড়াতে পেরে চেতনভাবে যায়, যেহেতু ব্যাপারটি হয় আকস্মিক দুর্ঘটনার মতো), তারই সুযোগ নিয়ে ঐ সকল সত্তা তাকে ছেঁকে ধরে। জীবন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তা পারে না। ঘুমের সময় যখন ভয়াবহ স্বপ্নাতংক থেকে তুমি জেগে ওঠো, তখন আবার দেহে ফিরে আসতে পারো বলে সে ভয়টা তখনই কেটে যায়, দেহই তখন তোমাকে রক্ষা করে। কিন্তু দেহ ছেড়ে যে চলে গেছে, সংযোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন বিশেষ সাহায্য ব্যতীত তার রক্ষা মেলে না, যেমন, তার প্রিয়জনেরা যদি ভালোবেসে

আন্তরিকভাবে তার মঙ্গল কামনা করে তাহলে সে ব্যক্তি ঐ সব বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা পায়; কিন্তু কারো যদি তেমন প্রিয়জন কেউ না থাকে, কিংবা এমন লোকেরা তাকে ঘিরে থাকে যারা ওর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, কিংবা এমন থাকে যারা অন্ধ ও অজ্ঞান, তাহলে সে ক্ষেত্রে ওদের হাতে গিয়ে পড়তে হয়। সেটা খুব কষ্টকর অবস্থা, আপন প্রাণসত্তাটুকু ছাড়া তার কোনো সহায়সম্বল নেই: যা ছিল উচ্চতর প্রাণসত্তা তাও বিপদে পড়ে। তার পর সেই প্রাণসত্তার বিলয় হলেও তখন থাকে বাকি মনোময় সত্তা। শেষে যা বাকি থাকে তা আত্মা অথবা চৈত্যসত্তা, তার অবশ্য কোনো ক্ষতি হয় না, সে থাকে মুক্ত ও স্বাধীন, সে চৈত্যের জগতে গিয়ে বিশ্রামলাভ করে (বিশেষ উন্নত চৈত্য ছাড়া)। সেই অবস্থাতে সে আপন পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে জীর্ণ করতে থাকে, এবং তা সমাপ্ত হলে সঞ্চিত বিশ্রামের শেষে আবার নতুন জীবনে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এমন উন্নতিপ্রাপ্ত চৈত্য কজনেরই বা আছে। বেশির ভাগ লোকই তাদের স্থূল দেহজনের চিন্তা ও চরিত্র ও অভিজ্ঞতা-টুকু দিয়ে তৈরি; মৃত্যুর পরে সেগুলি কিছুই থাকে না, যদি চৈত্য চেতন না হয়। সব ঘুচে সেই চৈত্যটুকু থাকে শিশুর মতো, বা চেতনার মতো।

এই হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ওর মধ্যে আবার নানারকম সেতুর যোগ আছে যা "আশ্রয়" দিয়ে রক্ষা করে, তেমনি রক্ষাকরী আবহাওয়াও আছে। যারা সাধারণের চেয়ে কিছু উন্নত তাদের পক্ষে তদনুরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও আছে। তাদের সত্তা আদৌ দেহনির্ভর নয়।

কিন্তু তেমন উন্নত অবস্থা কেবল একটু ইচ্ছা করলেই হতে পারে না। তার জন্যও রীতিমত সাধনা চাই, যা আধ্যাত্মিক সাধনার চেয়ে কম কঠিন নয়। তেমন উন্নতির জন্যই আমরা এসেছি এই পৃথিবীতে। মানুষ তো সেইভাবেই তৈরি, আমরা সে চেষ্টা করিনা বলেই জগতে এত দুঃখদুর্দশা। চেষ্টা থাকলে ভালোই হয়।

শোনো ছেলেরা, এখন বেজেছে ৯টা ২০; তোমরা আর বিশেষ কিছু জানতে চাও? তাহলে প্রশ্ন করতে পারো।

প্রশ্ন আপনি বলেছিলেন, আপনি সেই চিল পড়ার গল্পটা বলবেন।

উত্তর সে তো অন্য রাজ্যের কথা, মৃত্যুরাজ্যের নয়। সে হলো নিতান্ত স্থূল প্রাণময় জগতের জিনিস, দেহজগতের ঠিক পিছনে, দেহের উপর তার যথেষ্ট ক্রিয়া থাকে।

আমরা ছিলাম তখন ঐ "গেস্ট হাউসে"। শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন দোতলার ডানদিকের শেষ কুঠরিতে, যেখানে এখন "বোর্ডিংএর" ধ্যানঘর। ওখানে ছিল আরো দুটো পাশাপাশি ঘর, একটা তখনকার বাথরুম, তার পাশের ঘরে থাকতাম আমি, বাথরুম আলাদা। শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন তার একপাশে।

ক'জন থাকতাম ঐ বাড়িতে? অমৃত সেখানে ছিল (তার দিকে ফিরে), তোমার মনে আছে? (হাস্য)। আমাদের একজন রসুইকর ছিল, নাম তার ভাটেল। লোকটা ছিল বদমেজাজী, কারো তিরস্কার সইতে পারতনা। আর তার বন্ধুত্ব ছিল কয়েকজন গুপ্তবিদ্যা জানা মুসলমানের সঙ্গে, তাদের ছিল ভূতপ্রেত সম্বন্ধে নানারকম বই, তাই দেখে

তারা ঐ বিদ্যার ক্রিয়া চালাতো। এক দিন কিছু দোষ করায় দত্তা ঐ রসুইকরকে খুব বকুনি দেয় (দত্তাকে তোমরা চিনবে কিনা জানিনা), সে দারুণ খাপ্পা হয়ে ওঠে। সে আমাদেরকে শাসিয়ে বলে, "দেখে নেবো, এর ফল পাবে, এ বাড়ি তোমাদের ছাড়তে হবে।" আমরা অবশ্য গ্রাহ্য করিনি।

দুই তিন দিন কেটে যাবার পরে একজন এসে আমাকে জানালে, বাড়ির উঠনে তিন চারটে ঢিল পড়ল কোথা থেকে। আমরা ভাবলাম, পাশের বাড়ি থেকেই হবে। কিন্তু ছেলেদের নিষেধ করি যে কাজে তাই আমরা করলাম, অর্থাৎ চারিদিকে আশপাশে আর ছাদে অনেক ঘুরে বেড়ালাম দেখতে, কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

ব্যাপারটা ঘটলো বিকেল চার পাঁচটার সময়। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠনে ঢিল পড়া আরো বাড়ল। পরের দিন হলো আরো বেশি। বিশেষ ক'রে রান্নাঘরের দরজাতে এসে পড়ছিল, একটা ঢিল এসে লাগলো দত্তার বাহুতে, উঠন পার হয়ে গিয়ে। উৎসুক্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢিল পড়া বেড়ে গেল। নানা দিকে পড়ছিল, এমন কি যেখানে দরজা জানলার ফাঁক নেই সেখানেও। একটা সিঁড়ি ছিল, তাতে একটি ঘুলঘুলি মাত্র ছাড়া আর কোনো ফোকর নেই, সেখানেও উপর থেকে সোজাসুজি ঢিল পড়তে লাগল উপর-নিচের (ইঙ্গিত), ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে এলে তেরছা ভাবে পড়তো (তির্যকের ইঙ্গিত)। এতে সকলে উৎসুক হয়ে উঠল। ভাটেল দুদিন থেকে রাঁধতে আসছিলনা। অসুখ করেছে বলে (ঢিল পড়ার পর থেকেই), তার বদলিতে রেখে গিয়েছিল তেরো চোদ্দো বছরের একটি মোটা নতুন নিরীহ প্রকৃতির ছেলেকে। আমরা দেখলাম যে সেই ছেলেটি যেখানেই যায় সেখানেই ঢিলের সংখ্যা বাড়ে। তখন আমাদের ছেলেরা (অব্রতও ছিল তার মধ্যে) সেই ছেলেটিকে একটি ঘরে সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে আটকে রাখলে, দেখতে চাইলে যে ঢিল তখন কি করে (হাসা)। তাকে বলা হলো "সব দরজা জানলা এঁটে রাখো। সেই ছেলেটি তার মধ্যেই বসে রইল। তবু সেখানেও ঢিল পড়তে থাকল। শেষে তার পায়ে আঘাতও লাগল। তখন ব্যাপারটা আরো গুরুতর হয়ে দাঁড়াল।

আমি আর শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চিন্ত ছিলাম আমাদের ধ্যানের কাজ নিয়ে। আমাদের ছেলেরা আমাদের কাছে এসে সব কথা জানিয়ে বললে, সমস্যাটা গুরুতর হয়েছে, একটা কিছু প্রতিকার দরকার। আমি তখনই বুঝলাম জিনিসটা।

তবে এতে বাহ্যভাবের যা প্রতিকার নেওয়া যায় তা সবই আমরা করেছি। পুলিসে বলেছি ঢিল পড়ার কথা, তারা দেখতেও এসেছে। ওর মধ্যে একজন পুলিস বললে, "ও, সেই ভাটেল বুঝি এখানে রসুই করে? তাহলে বুঝেছি কি ব্যাপার।" ওরা হাতে পিস্তল নিয়ে উঠনে দাঁড়ালো, তখন একটিও ঢিল পড়লনা। আমি ও শ্রীঅরবিন্দ ছাদে ছিলাম। তাঁকে বললাম, "পুলিস আসাতেই ঢিল পড়া থামল, ওরা ভাববে আমরা মিথ্যা বলেছি।" যেই বলা আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢিল পড়ল (হাসা)। তবে সবই আমাদের দুজনের কাছ থেকে দূরে পড়ছিল, কাছাকাছি একটাও পড়েনি।

পুলিসের লোক বললে, "এখানে আমার থেকে কিছু লাভ নেই, আমি জানি যে তোমাদের

ভাটেল এই কাণ্ড করছে।" সেই লোকটি তখন চলে গেল।

সেই রাঁধুনি ছেলেটিকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হলেও সেখানেও ঢিল পড়তে থাকে। তাই আমি বললাম,"ওকে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও পাঠাও, এখানে আর রেখে কাজ নেই। আর তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, কোনো ভয় নেই।"

আমি ছিলাম শ্রীঅরবিন্দের ঘরে। আমি ধ্যানে বসে "ভাবলাম, দেখা যাক ব্যাপারটা কি,"—এই ভেবে সেই অদৃশ্য শক্তিকে ডাক দিয়ে বললাম, "কে তোমরা ঢিল ফেলছ আমার কাছে এসে বলো।" এতে প্রাণময় রাজ্যের তিনটি ক্ষুদ্র সত্তা এসে হাজির হলো, তাদের শক্তি অল্প, চেতনা সামান্য, তারা কেবল একটা কাজই করতে জানে, গুণীদের আদেশে তারা সেই ভুতুড়ে কাণ্ড করে। যারা তেমন মন্ত্র জানে তাদের হুকুমে ঐরূপ করতে ওরা বাধ্য হয়। আমার কাছে ওরা ভয়ে ভয়ে এলো। আমি বললাম, "তোমরা ঢিল ফেলছ কেন? এই বিকট রসিকতার অর্থ কি?" তারা বলল, "নিতান্ত বাধ্য হয়ে ওটা করেছি...(হাস্য), আমাদের কোনো দোষ নেই।"

আমার যদিও খুব হাসি পাচ্ছিল, তথাপি গম্ভীর হয়ে বললাম,—"এসব বন্ধ করা চাই বুঝলে?" তারা বললে,—"আপনি আমাদের রাখুন, আপনি যা করতে বলবেন তাই করব।" আমি বললাম,—"কী কাজ তোমরা করতে পারো?" তারা বললে—"আমরা ঢিল ফেলতে পারি।" আমি তখন বললাম, "সে কাজ আমি চাই না, কাউকে ঢিল মারতে আমি চাই না। তোমরা ঢিলের বদলে ফুল এনে ফেলতে পারো? গোলাপ ফুল আনতে পারো?" তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে শেষে বললে—"না আর কিছু করতে আমরা জানিনা।" আমি বললাম—"তবে তোমরা চলে যাও, এদিকে কখনই আর এসোনা, আমার এলে বহু বিপদে পড়বে।" তারা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল।

আমি এটা লক্ষ্য করেছি যে ঢিলগুলি বাড়ির ছাদের উচ্চতা বরাবর থেকেই আসে, তার চেয়ে বেশি উপরে আকাশে ঢিল দেখা যায়না। অর্থাৎ সেগুলো বাড়িরই আবহাওয়ার মধ্যে তৈরি হয়ে পড়ছে, উপর থেকে আসছে না।

পরের দিন সকালে আমি রান্নাঘরটা দেখতে গেলাম। ঘরের বাইরের থানগুলির মধ্যে একটিতে দেখলাম, কয়লা দিতে তাতে কি সব হিজিবিজি আঁক কাটা হয়েছে আর তামিল ভাষাতে কি সব লেখা। সে সমস্তই আমি একেবারে মুছিয়ে দিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলাম। এর পর সব থেমে গেল।

কিন্তু তবু ঘটনার শেষ হল না। ভাটেলের একটা মেয়ে ছিল, সে ছিল বাড়ির আয়া। সে বিকেলের দিকে খুব আতংক নিয়ে এসে বললে—"আমার বাবার হঠাৎ খুব বেমারি হয়েছে, তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে, সে আর বাঁচবে না। আমার বড় ভয় করছে।" আমি জানতাম তার কি হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দকে গিয়ে বললাম "ভাটেলকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে, তার এখন মরণাপন্ন অবস্থা।" তিনি একটু হেসে বলেন "ও। সামান্য কিছু ঢিল ফেলেছে বলে।" (হাস্য)

সেই দিনই সন্ধ্যার মধ্যে ভাটেল সেরে গেল। তার পর সে আর কোনো গোলমাল করেনি।

প্রশ্ন : চিলগুলো কেমন ক'রে দেখা যাচ্ছিল ?

উত্তর : সেটাই আশ্চর্য। ঐ সব সত্তাদের এমন ক্ষমতা থাকে যাতে কোনো কিছুকে দৃশ্যরূপ দিতে পারে আবার মিলিয়ে দিতেও পারে। সাধারণ চিলের মতোই জিনিস, কিন্তু কেবল নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই তা গড়ে ওঠে। ঐরূপ ম্যাটিরিয়ের ক্রিয়া করা হয়েছিল কেবল ঐ বাড়িতে, বিশেষ করে সেই উঠানের মধ্যে। প্রাণময় সেই শক্তিগুলি কেবল ঐখানেই তাদের ক্রিয়া করছিল। সেই রাঁধুনি ছেলেটিকে যেমনি ঐ বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো অমনি তার কাছে আর কোনো চিল পড়ল না। চিল পড়া কেবল ঐ বাড়ির উঠানের মধ্যেই হতে পারছিল, বিশেষ আক্রোশ দত্তার উপরে, সে কিছু আঘাতও পেয়েছিল।

আরো কিছু কথা আছে...হাঁ, আমরা পরে জেনেছি যে ভাটেল এর জন্য কোন্ গুপ্তবিদ্যা জানা লোকটির কাছে গিয়েছিল। তাকে এখানকার সকলেই জানতো। সে নাকি বলেছিল যে আমাদের ঐ বাড়ি থেকে তাড়াবে, কেন তা কে জানে। ভাটেল তাকে বলেছিল ঐ রকম চিল ফেলতে। সে লোকটি আপত্তি করে বলেছিল—"ও বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দ আছেন, ওখানে আমি কিছু করতে চাইনা, তুমি বরং যা পারো করো।" কিন্তু ভাটেল খুব চেপে করলে, আরো বেশি টাকা দিতে চাইলে। সে তখন বলে, "আচ্ছা, তবে একটা নিয়ম রইল যে শ্রীঅরবিন্দের চারপাশে পঁচিশ মিটার জায়গার মধ্যে কোনো চিল পড়বেনা।" ওটুকু ফাঁক বরাবর থাকবে। তাই ছিল, সেই ভাবেই চিলের ক্রিয়া হচ্ছিল। একটাও চিল আমাদের কাছে আসেনি। সবই পড়েছে অন্য দিকে।

এ রকম প্রক্রিয়া করতে ওরা জানে, ওদের বইতে লেখা থাকে। সেই সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের জোরে ওরা কোনো প্রাণময় শক্তিকে আহ্বান করে। তাছাড়া সামান্য কিছু মনোময় শক্তিও থাকতে পারে এবং তা ঐ সব সত্তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। সেই সব সত্তা এদের খুব ভয় করে, কারণ এরা তাদের ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। কিন্তু তাদের উপর যদি বিশুদ্ধ সত্যের শুভ্র আলো একটুমাত্র ফেলা যায়, তাহলে তারা তখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে শক্তি ধ্বংসকারী নয়, সৃষ্টিকারী, কিন্তু তার স্পর্শে ওদের অস্তিত্ব লোপ পায়। আমি সেই আলো একটু দেখিয়ে তাদের বলেছিলাম,—"দেখছো তো, এবার এসো দেখি।" তারা তাতেই মহাভয় পেয়ে বললে, "আপনি যা করতে বলেন তাই আমরা করবো"। আমি বললাম—"কেমন কাজ তোমরা করতে পারো ?"—"পারি চিল ফেলতে।" (হাস্য)*

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

টুকরি

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

বিনিময়

রেখে এনু তার গানের খাতার পাশে
বনের খুসিটি জানাবার তরে
দুটি কদম্ব ফুল।

উপহার

তোড়ার বাঁধন সইবে না ও যে
মালার গাঁথন মানবে না
কেয়াফুল এই মোর হাত হোতে
হাত তুলে লও তুমি।

আলোর পোকা

পোকাগুলো—ওদের কি এই
আলোর মদের নেশা,—
তারাগুলো—ওরা কি সব
আঁধার মদে মাতাল?

উদাসী

ও পাশের বাড়ি ছোটো ছেলেটির অন্নপ্রাশন;
এ পাশের বাড়ি মেজো মেয়েটির বিয়ে;
শিশু ভাই তার দীঘির ঘাটের ধারে
খেলা ভুলে বোসে আছে।

রক্তকমল

শুভ্রশাড়ীর কালোপাড় দিয়ে ঘেরা
আলতা-পরানো চরণ দুটির চলা
কোন ঘরে গিয়ে হয়েছিল অবসান
মোর মন তারি ঠিকানা খুঁজিয়া মরে।

রক্তের পরশ

কালী-দীঘির বুকের তলায় সূর্য ডুবে যায়
সেই ডোবা রক্ত পদ্ম হোয়ে ফোটে।

বিদ্যুৎ

কমলার গুঁড়ো ছড়ানো রয়েছে উঠোনের
এক পাশে,
এক পলকেই চলে গেল তার বুকের উপর দিয়ে
একটা হলদে সাপ—মেঘের উপরে
তন্বী বহ্নিরেখা।

পুকুর

পুরোণো পুকুর ; শ্যাওড়া গাছের ছায়া ;
শ্যাওলা ভরানো কালো জলে ঐ
ফুটেছে শালুক ফুল ;
দক্ষিণ-পারে দুটো শাদা বক
দাঁড়িয়ে এক পা তোলা।

করকমল

রসে ভরা যেন আঙুর তোমার আঙুল কটি।
করতলে কচি গাবের পাতার গোলাপী আভা!
ঐ হাতখানি মোর হাতে তুলে ধ'রে
দিবে কি গণিতে করকোষ্ঠির ফল?

মিষ্টিমুখ

পল্লীর মেয়ে জল নিয়ে যায়
আমবাগানের পথে।
বিদেশী পথিক বলে—"জল দেবে কী?"
কিছুখন চেয়ে মেয়ে ভারে কয়—
"শুধুমুখে জল খাবে?
ঐ আমাদের বাড়ি—হোথা চল,
কোরবে মিষ্টি মুখ।"

বড়োবাজার

কত লোক আসে কত লোকে যায়,
কত গাড়ী ঘোড়া চলে আর চলে—
চলে সারা দিন ধ'রে;
কত বকাবকি হাসি ও কান্না,
কত যে দোকান পাট,
আপনারে আর চেনাতে পারিনে
নিশে যাই বার বার
বড়ো বাজারের ভিড়ে।

রক্তকুণ্ডল

হায়রে অসাবধানী!
কাল্‌কে বিকেলে আমার বাড়ির পথে
পড়ে গেছে দেখি, তোমার কানের
লাল পাথরের দুল।

চোখ

কোনো দিন কোন কথাই বলে না,
রূপ নেই, নেই গুণ;
কেবল তাহার আছে যেন দুটি চোখ।

যে পড়ে সে আবার তোরা

এখনি কি তুই ইস্কুলে যাবি?
এখনো বাজেনি ন'টা।
আয় না লক্ষ্মী সন্দেশ দেবো,
আয় ভাই শুনে যা।"
খাতা বই রেখে ছেলেটি বোসলো
ছেঁড়া মাদুরের পাশে।
বৌটি তখন আঁচলের থেকে খুলে তাঁজ করা চিঠি
ছেলেটিকে বলে—"পড়ো ভাই, ভালো কোরে।"

রেলগাড়ী

রাতের প্রহরে ঢেউ তুলে তুলে
দুলে চলে রেলগাড়ি।
অসীম ঘুমের আকাশে সে যেন
অনিদ্রা ধূমকেতু।

পরাণ কেষ্ট

আষাঢ় চলেছে আঁধার আকাশে
মেঘের ঝুলিটা নিয়ে,
বর্ষণ তার পাড়ায় পাড়ায় দিতে।
ঝুলি নিয়ে কাঁধে ঘন্টি বাজিয়ে
নির্জন পথে ছোটে
পোষ্টাপিসের পরাণ কেষ্ট রাণার্।

গোরুগাড়ী

খড়ের বোঝাই
গোরুগাড়িটা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে।
আমি বলি ডেকে, কোন গাঁয়ে যাবে গাড়ী?
কোনো উত্তর নেই।
গাড়োয়ান নিজে ঘুমোয় হেলান দিয়ে।
বাঁধা পথে চলে বাঁধা নিয়মের গাড়ি।

বাজারফেরতা

হাতে ছাতা দোলে, তাতে লণ্ঠন বাঁধা,
আর এক হাতে একটা ঝাল্‌তি
আলুতে পটলে ভরা ;
মুখে তার বিড়ি, কোমরে জড়ানো
পুরোণো কেটের চাদরখানি ;
গায়ে শাদা কালো ডোরা কাটা কাটা কোট ;
ঘন ঘন চায় বুক পকেটের পানে ;
সেখানে রেখেছে একটি প্যাকেট
গ্যাটাপার্চার কাঁটা,
আর এক শিশি জবাকুসুমের তেল।

যদুকামার

হাটে যাবার পথে দেখি, কামার যদু
গোরুর গাড়ীর লাগি গড়ে লোহার চাকা।
ঘরে ফেরার পথে দেখি, কামার যদু,
কলু-বৌয়ের লাগি গড়ে হাতের "নোয়া"।

গিন্নি ও ঝি

গিন্নি বলেন—
মাছ পাঁচ-শিকে, আলু আনা ছয়, পটল চার আনা,
দু আনার চাই কলা ;
ওরে মোক্ষদা, টাকা দুই নিয়ে যা।
মোক্ষদা বলে—
আরো দুটি আনা বেশী দিতে হবে মাগো,
বাড়িতে আমার কুটুম এসেছে আজ ;
দুই পয়সার কচি কচি পুঁই শাক ;
আর দুটো দিয়ে সুপুরি ও পান কেনা।
ঝন্ ঝন্ কোরে গিন্নি দিলেন ফেলে,
মাথায় ঠেকিয়ে মোক্ষদা তার আঁচলের কোণে বাঁধে
দুটো টাকা আর দুটো ছোট এক-আনি।

হাটের ফুল

সারাটা হাটেই কেনা বেচা চলে
যাহা শাক তরকারী।
বেলা প'ড়ে যায়—শেষ হয়ে যায়
সকলের বেচা কেনা,
একজন শুধু বসে থাকে ঐ হাটের একটি কোণে।
এতক্ষণেও বেচ্‌তে পারেনি কিছু;
ডালা ভরা তার পদ্মপাতায়
শুকায় পদ্মফুল।

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX **Phone :** 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

ওতো আপনারই মুখ চেয়ে আছে

ছেলেমেয়ে যখন ছোট তখন থেকেই তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সব বাবা-মারাই চান। তাদের জন্য পদে পদে বাবা-মার কতনা স্নেহ, যত্ন, উৎকণ্ঠা। আদর-যত্নে ছেলে-মেয়ে মানুষ করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তার চেয়ে বড় কাজ তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আর সে দায়িত্ব আপনাদেরই। মেয়ের বিয়ে বা ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন টাকার। সেই টাকা আজ থেকেই আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে। তবেই তো আপনার দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এই জন্য একটি চমৎকার সঞ্চয়-পরিকল্পনা আমাদের আছে। ৫০০০৲ UIB ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২০ বছর পর আপনি পাবেন ২১,২৫০৲ এর চেয়ে ভালো সঞ্চয়-ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করুন, "ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য যতটা করা দরকার সবকিছু কি আমি করেছি?"

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৭ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-৯৭৮৪-৫-৬

অথবা যেকোনো শাখা

চেয়ারম্যান : শ্রী এন. এল. চ্যাটার্জি • জেনারেল ম্যানেজার : শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB 6/73

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

নীলাঞ্জন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী-২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী বহ
একমাত্র আধ্যাত্মিক মাসিক পত্রিকা

শৃণ্বন্তু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রতি সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ

★ শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ধারাবাহিক অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

★ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সাহিত্য দর্শন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তামূলক একাধিক গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ।

★ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ জীবনালেখ্য
"ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

★ দৈনন্দিন সমস্যাপীড়িত জীবনের পথে দিশারী ও প্রেরণাস্বরূপ শ্রীমায়ের বাণী ও মায়ের আলাপ।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) : দশ টাকা।
বৈশাখ সংখ্যা হইতে বর্ষ আরম্ভ।
বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

শৃণ্বন্তু
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo		
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·০০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		১·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৩·৫০
দিব্য জীবনের সন্ধানে	,,	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	**D. P. Chattopadhyaya**	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

24 JUN 1974

শ্রীঅরবিন্দ
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগষ্ট ১৫, ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজীতে : ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ
সুশোভন রাজ সংস্করণ—১০০০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
সুলভ সংস্করণ—৭৫০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত (গীতার ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী, পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি) দুর্লভ খণ্ড সহ অন্যান্য রচনার নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬৲ টাকা

আঞ্চলিক ভাষা
হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

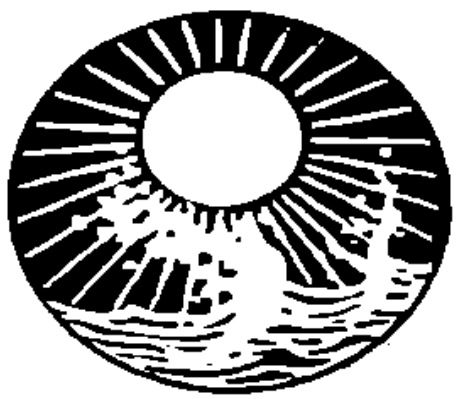

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

উমা-হরণ কাব্য	শ্রীঅরবিন্দ	৫
একটি পত্র		৭
সাবিত্রী	...	৮
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১১
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	১৭
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী		২৪
মায়ের সঙ্গে কথা	...	২৭
সরলতা	দিলীপকুমার রায়	৩৭
এই আমি	সুমিত্রা রায়	৩৮
বিবস্বান	শ্রীঅরবিন্দ	৩৯
মাতৃবন্দনা	শ্রীঅরবিন্দ	৪০
বৈদিক যজ্ঞ	গৌরী ধর্ম্মপাল	৪১
সুধীরকুমার সরকার	সমীরকান্ত গুপ্ত	৬০
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু	৬৫
টুকরী (কাব্য-সংগ্রহ)	নিশিকান্ত রায়চৌধুরী	৭১

বন্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

Be always
faithful to your
faith and you
will feel no
sorrow.

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম সর্গ

মেঘনাদ বধ। প্রথম সর্গ।

গাও মুদু হে কোকিল এ সান সাহিয়া
আজীন মুকুলিত বৃক্ষ শাখি-রূপে বীণা
ত্রিদিবে বিরোধি দাহ, মহাযুদ্ধ প্রতে
ঘটাইলে কুহুরিয়া মুকুলের আড়ালে
কহিল যে কথা যবে দিব্যবালা ত্রিজা
কুসুম-শয়ন ত্যজি দিব্য বাসপুরে।
উঠিয়া অনুজা বলা মোহিল বাহির
প্রভাতকালের মুখপুটিত কোকনদ আর,
মোহিল আকাশ সোভা, খেলিছে বিদ্যুৎ
একলীলা, ঘনমাঝে লুকোচুরি ছলে
পূর্বের তরুণ অংশু। অমীরস ধীরে

উষা-হরণ কাব্য

শ্রী জগদীন্দ্র

প্রথম কাণ্ড

কোকিল নাম প্রথম সর্গ

ওহে ধরা, ধাত্রী নম, বুকে মোরে ধর
কি সুন্দর কি বিশাল মূর্তি আজি তোর
হাস্যময়ী প্রকৃতির সুচঞ্চল আভা
নৃত্য করে জলে স্থলে। সূর্য্যের সে হাসি
লুকাইছে দেখাইছে চপল ক্রীড়ায়
স্নিগ্ধ তরুশাখা। মাঝে বায়ুর হিল্লোল
আলোড়ি সমুদ্রে যেন অরণ্যের ক্রোড়
ধরতে তীব্র উল্লাসে। সূক্ষ্ম চক্ষে দেখি
চিন্তাশূন্য জীবনের মধুময় দল
হেসে হেসে নেচে কুদে (কুঁদে) হেথা সেথা ধেয়ে
তাড়াইছে পরস্পরে বনে উপবনে
পবন বালক যত। ক্ষুদ্রপদ ভরে
শিহরে উঠেছে দেখ পুষ্করিণী জল
কম্পমান মাতৃভাবে। পর্ব্বত চূড়ায়
পবনের অত্যাচারে নতশির রাজী
সহ্য করে.....জনতা.....
.....ইহার। এই সর্য্য বায়ু
জল, বৃক্ষাচ্ছন্ন ধরা বিস্তীর্ণ আকাশ,
এই বিশ্বময় রৌদ্র সুবর্ণদেবের,
ঈশ্বর, সুব্যক্ত আজি তোমার মহিমা
এ বিশালতায় যেন। শুধু নহে ইহা
তোমার মহতী সৃষ্টি, ইহা যে তুমিই
কৃষ্ণ, বিশ্ববৃন্দাবন-বিহারী। অস্তিত্ব,
চৈতন্য আনন্দ প্রকাশিত এই জড়ে
(বৃথা কেন জড় বলি সচেতন গ্রন্থে)

অনন্ত এ শান্ত ছন্দে, অরূপ এ রূপে
স্পষ্ট অনুভব করি। আকাশ পৃথিবী
তীক্ষ্ণ (?) তেজ বিশ্বদীপ্তি, অজেয় পবন
মহৎ জগতীছন্দে গাইতেছে আজি
বেদ-বেদান্তের উক্তি মম বিশ্বপ্রাণে।
বেড়ায় যে শূন্যে সূর্য্যে প্রদক্ষিণ করি
এ বিস্তৃত নীলিমায় শান্তমুখে নুয়ে
অনন্ত চুম্বন করে, মুক্তি লীলা মধ্যে।*

---

* অতি পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত বাংলা কবিতার ভগ্নাংশ

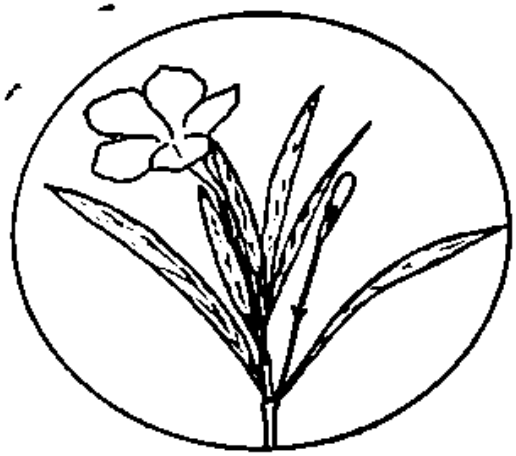

একটি পত্র

Extract from a letter written by Manmohan Ghose (Sri Aurobindo's brother) to Rabindra Nath Tagore, dated Oct. 24th, 1894. C/o Rajnarayan Bose, Deoghar. Published in Visva-Bharati News, Dec. '68, pp. 153-54.

"Aurobindo is anxious to know what you think of his book of verses* but I have explained to him how busy you are just now, and that you will write later when you have a little more leisure to do justice to his book. I myself think that he is possessed of considerable powers of language and a real literary gift, — but he is lacking in stuff and matter, perhaps in warmth of temperament. But those pieces on Parnell† consisting of fine philosophic reflection, show, I think, that he might do great things. Unfortunately he has directed (or rather misdirected) all his energies to writing Bengali poetry. He is at present engaged on an epic (inspired I believe by Michael Madhusudan) on the subject of Usha and Aniruddha."

(অরবিন্দ জানতে উৎসুক তার কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আপনার কী মত, কিন্তু তাকে বুঝিয়ে বলেছি আপনি আপাতত কতখানি ব্যস্ত, এবং পরে আরও একটু অবসর পেলে তার বইটির উপর সুবিচার করতে পেরে পত্র লেখেন। আমি নিজে মনে করি ভাষার উপর তার অগাধ অধিকার এবং সত্যকার সাহিত্য-প্রতিভা আছে.—তবে অভাব বিষয়বস্তুর, হয়ত স্বভাবে ভাবুকতার উত্তাপের। তবে পার্নেলের উপর ওই কবিতা কটি, মনে হয়, ইঙ্গিত বহন করছে যে ভবিষ্যতে মহৎ কিছু সে করতে পারে। দুঃখের বিষয় সে তার সমস্ত উদ্যম প্রয়োগ (কিম্বা অপপ্রয়োগ) করছে বাংলা কবিতা লেখায়। বর্তমানে সে উষা ও অনিরুদ্ধের বিষয় নিয়ে এক মহাকাব্য রচনায় ব্যাপৃত (মনে হয় মাইকেল মধুসূদনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে)।

---

* *Songs to Myrtilla*. First publised in Bombay for private circulation : 1894. (Sri Aurobindo : *Collected Poems*. The Centenary Library : Vol. 5, Pp. 1 et seq.)

† Charles Stewart Parnell 1891, and Hic Jacet, Glasnevin Cemetry. (*Collected Poems*. The Centenary Library: Vol. 5, Pp. 15 and 11 respectively.)

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

দ্বিতীয় পর্ব—দশম সর্গ

ক্ষুদ্রতন বনের দেবলোক

(৭)

বিচারবুদ্ধি সদা নিরত এক পরিণামহীন লীলায়।
বলিষ্ঠ যে কোন ধারণা যন্ত্ররূপে তাকে ব্যবহার করে ;
তার পক্ষ সমর্থনের জন্য যে কোন প্রমাণপঞ্জী সে গ্রহণ করে।
যে কোন চিন্তার দিকে আপনাকে খুলে ধরে, জ্ঞান তাই পায় না।
চিরন্তন ব্যবহারজীবী সে বিচারকের আসন নিয়ে
ন্যায়শাস্ত্রের অভেদ্য বর্মে সজ্জিত করেছে
সহস্র যুযুৎসুকে সত্যের আবৃত সিংহাসন তলে,
বিতর্কের সমুচ্চ অশ্বপৃষ্ঠে আসন গ্রহণ ক'রে
বাগাড়ম্বরের বর্শা উঁচিয়ে ছুটে চলেছে বিপক্ষকে হটিয়ে দেবার জন
সে এক নকল লড়াই যেখানে কারও জয় হয় না।
চিন্তার মূল্য নিরূপণ করে সে তার কঠোর বিধিবদ্ধ পরীক্ষা দিয়ে,
স্থিরাসনে বসে আছে বিশাল শূন্য আকাশের পরে
নিঃসঙ্গ নির্মল সে, নিরপেক্ষ স্থিতি তার।
মনে হয় সিদ্ধান্ত তার অব্যভিচারী, কিন্তু সবই অনিশ্চিত ;
কালের পুনর্বিচারে তার সকল নির্দেশ খণ্ডিত হয়ে যায়।
জোনাকির মত মন আমাদের, সূর্যের কিরণরূপে সে দেখে
বিচারবুদ্ধির জ্ঞান, নেমে এসেছে যেন নির্মল আকাশ হতে,
কিন্তু তার রশ্মিসব হল রাত্রির অন্ধকারে প্রদীপের ছটা ;
অজ্ঞানের উপরে ছড়িয়ে দেয় চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ এক।
কিন্তু বর্তমানে হারিয়ে ফেলেছে সে পুরাতন সর্বেসর্বা দাবী তার,
নিরঙ্কুশ স্বাধিকার যার বলে চায় সে শাসন করতে মনের সমুচ্চ রাজ্য,
চায় সে চিন্তাকে বেঁধে দিতে ন্যায়শাস্ত্রের দৃঢ়বদ্ধ অকাট্য শৃঙ্খল দিয়ে
অথবা সত্যকে দেখতে নগ্নরূপে উজ্জ্বল বস্তুহীনতার কুয়াশায়।
প্রভু সে, দাস সে রূঢ় বাহ্য বাস্তবের,
বেয়ে চলে সে ভ্রান্তদৃষ্টির পথ,

চোখে পড়ে তার বাঁধা নিয়মের জগৎ-যন্ত্র এক—
নিজেরই জন্য নিজের হাতিয়ারে গড়া সে-জগৎ।
মনে যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে সুপ্রমাণিত ঘটনাবলীর ভারবহ শকটে,
টেনে চলে জ্ঞানের বিপুল বোঝা যত জড়ক্ষেত্রের ধূলিরাশি পার হয়ে
পৌঁছাতে গিয়ে প্রয়োজনের বিশাল বিপণিবাজে।
পুরাতন নিত্যকর্মে তার শিক্ষানবিশী ক'রে বেড়ে উঠেছে সে,
অনুগত ইন্দ্রিয় হল তার অনুসন্ধানের দিশারী।
তাকে এখন সে ব্যবহার করে নিকষ-পাথরের কাজে।
যেন জানে না সে বাহ্য বাস্তব হল সত্যের খোসামাত্র,
খোসা সে রেখে দেয়, ফেলে দেয় শাঁসটি।
প্রাচীন প্রজ্ঞা এক নিলিয়ে যায় অতীতের মাঝে,
যুগযুগান্তের অভিজ্ঞা হয়ে পড়ে কল্পনাকাহিনী যত,
চিন্তার জাগরণে ভগবান সরে যায় দূরে,
পুরাতন পরিত্যক্ত স্বপ্ন যেন, প্রয়োজন নাই কোন তার :
খুঁজে বেড়ায় সে শুধু যন্ত্ররূপী প্রকৃতির চাবিকাঠি।
প্রস্তরীভূত অনিবার্য বিধানসকলের ব্যাখ্যা দেয় সে,
খুঁড়ে চলে সে পৃথিবীর কঠিন মাটির গুপ্ত কন্দরে,
চায় সে উদ্ধার করতে যা কিছু করা হয়েছে তাদের প্রক্রিয়া যত।
ভারগ্রস্ত বিরাট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এক ভেসে ওঠে
তার উদ্‌গ্রীব বিনম্র দৃষ্টির সম্মুখে,
জটিল অর্থশূন্য যান্ত্রিক কারিগরী এক,
যদৃচ্ছার খেলা সেখানে বাঁধা নিয়তির অনিবার্য শৃঙ্খলায় :
চতুর, নিখুঁত, সূক্ষ্মহস্ত
রূঢ় চেতনাহারা অভ্রান্ত কলাকৌশল তার
খুলে ধরে নির্ভুল গতিধারা, মেপে চলে নিশ্চিত পন্থা ;
চিন্তাশক্তি নাই তার তবু পরিকল্পনা করে চলে,
ইচ্ছাশক্তি নাই তবু চলে কর্ম ক'রে,
লক্ষ উদ্দেশ্য সেবা করে চলে, নাই কোন লক্ষ্য,
মন নাই, তবু গড়ে তোলে যুক্তিসিদ্ধ জগৎ এক।
চালক নাই তার, নাই স্রষ্টা, নাই কোন আন্তর ভাব :
স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট কর্ম তার, নাই কোন হেতু ;
প্রাণহীন ক্রিয়াবল এক অপ্রতিহতবেগে চালিত হয়,
যেন প্রয়োজনের দেহের উপর মৃত্যুর মস্তক,
প্রাণের সৃষ্টি করে যার জন্ম দেয় চেতনার,
যার বিস্ময়ে অভিভূত—কেন এসব হয়েছে, এসেছে কোথা হতে।

আমাদের চিন্তারাজি বিপুল যন্ত্রটির অঙ্গ,
আমাদের গভীর ভাবনা যত হল জড়-নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু,
অতীন্দ্রিয়ের আভা হল মনের খেয়াল অথবা অবগুণ্ঠন মাত্র ;
অন্তরাত্মার, চিন্ময়পুরুষের প্রয়োজন নাই আর আমাদের :
জড়ই হল অপূর্ব সম্ভব,
প্রত্যক্ষ অলঙ্ঘ্য অত্যাশ্চর্য,
সৃষ্টির নিখুঁত সত্য, সহজ, সনাতন, অদ্বিতীয়।

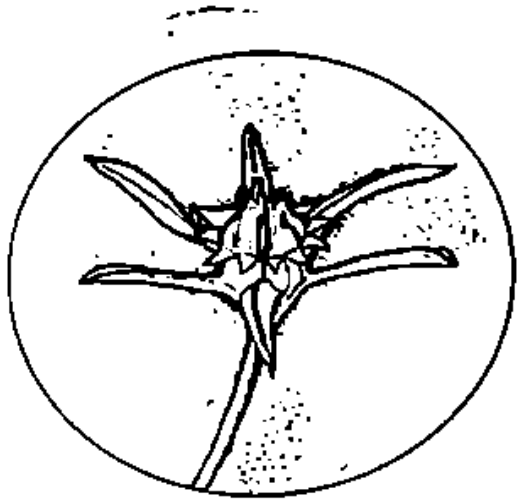

বেদমন্ত্র
ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

পঞ্চম মণ্ডল—ত্রয়োদশ সূক্ত

১। অর্চন্তস্ত্বা হবামহেঽর্চন্তঃ সমিধীমহি।
অগ্নে অর্চন্ত ঊতয়ে ॥১॥

অর্চন্তঃ—অর্চনা করে, জ্যোতির্ময় মন্ত্র পাঠ করে
ত্বা—তোমাকে
হবামহে—আহ্বান করি
অর্চন্তঃ—অর্চনা করে, জ্যোতির্ময় মন্ত্র পাঠ করে
সম+ইধীমহি=সমিধীমহি—সমিদ্ধ করি
অগ্নে—হে অগ্নি
অর্চন্তঃ—অর্চনা করি
ঊতয়ে—অভিবৃদ্ধির জন্য

আমাদের জ্যোতির্ময় মন্ত্র দিয়ে তোমাকে আহ্বান করি, জ্যোতির্ময় মন্ত্র দিয়েই তোমাকে প্রজ্বলন্ত করি, হে অগ্নি, জ্যোতির্ময় মন্ত্র দিয়ে আমাদের অভিবৃদ্ধির জন্য ॥১॥

২। অগ্নেঃ স্তোমং মনামহে সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশঃ।
দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ ॥২॥

অগ্নেঃ—অগ্নির
স্তোমম্—প্রতিষ্ঠামন্ত্র
মনামহে—মনন করি, মনের মধ্যে ধারণ করি
সিধ্রম্—সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিকারক
অদ্য—আজ
দিবিস্পৃশঃ—স্বর্গস্পর্শীর
দেবস্য—দেবতার
দ্রবিণস্যবঃ—সম্পদকামী, পদার্থকাঙ্ক্ষী

সত্যপদার্থকামী আমরা, মনের মধ্যে আজ আমরা ধারণ করি স্বর্গস্পর্শী দেবতা অগ্নির সিদ্ধিপ্রদ প্রতিষ্ঠামন্ত্র ॥২॥

৩। অগ্নির্ঋষত নো গিরো হোতা যো মানুষেষু।
স যক্ষদৈব্যং জনম্ ॥৩॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
ঋষত—সাদরে গ্রহণ করে যেন
নঃ—আমাদের
গিরঃ—বাক্য
হোতা—আহ্বানকর্ত্তা
যঃ—যিনি, যে
মানুষেষু—মানুষের মধ্যে
আ—(যক্ষৎ)
সঃ—তিনি
আ + যক্ষৎ—যজ্ঞসাধন করেন
দৈব্যম্—দিব্য
জনম্—জনের জন্য

হে অগ্নি, তুমি আমাদের বাক্যকে সাদরে গ্রহণ কর, মানুষের মধ্যে এখানে তুমি আহ্বানকর্ত্তা, দিব্যজনের জন্য তুমি যজ্ঞ উদ্‌যাপন কর ॥৩॥

৪। ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ।
ত্বয়া যজ্ঞং বি তনুতে ॥৪॥

ত্বম্—তুমি
অগ্নে—হে অগ্নি
সপ্রথাঃ—বিশাল, বৃহৎ
অসি—হও
জুষ্টঃ—প্রীতিকর, প্রেয়
হোতা—আহ্বানকারী
বরেণ্যঃ—বরণীয়
ত্বয়া—তোমার দ্বারা
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে
বি-তনুতে—প্রসারিত করে ধরে

হে অগ্নি, বৃহৎ বিশাল তুমি, সর্ব্বপ্রিয় বরেণ্য আহ্বানকারী হোতা তুমি, তোমার সহায়ে যজ্ঞকে তারা বিপুল প্রসারিত করে ধরে ॥৪॥

৫। ত্বামগ্নে বাজসাতমং বিপ্রা বর্দ্ধন্তি সুষ্টুতম্।
স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্ ॥৫॥

ত্বাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
বাজসাতমম্—পরমপূর্ণতাবিধায়ী
বিপ্রাঃ—জ্ঞানদীপ্তেরা
বর্দ্ধন্তি—বৃদ্ধিসাধন করে
সু-স্তুতম্—সুমন্ত্রে সম্যক স্থাপিত হয়েছে যে
সঃ—সেই তুমি
নঃ—আমাদের
রাস্ব—দান কর
সু-বীর্য্যম্—পূর্ণ বীর্য্য

হে অগ্নি, তুমি পূর্ণতাকে পূর্ণ জয় করেছ, তুমি সুমন্ত্রে সম্যক প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানদীপ্তেরা তোমার বৃদ্ধিসাধন করে, তাই তুমি পূর্ণবীর্য্যে আমাদের ভরে দাও ॥৫॥

৬। অগ্নে নেমিররা ইব দেবাংস্ত্বং পরিভূরসি।
আ রাধশ্চিত্রমৃঞ্জসে ॥৬॥

অগ্নে—হে অগ্নি
নেমিঃ—চক্রবলয়
অরান্ ইব—চক্রদণ্ডদের যেমন
দেবান্—দেবতাদের
ত্বম্—তুমি
পরিভূঃ—চারিদিক ঘিরে
অসি—রয়েছ
রাধঃ—আনন্দ
চিত্রম্—বহুবিধ
আ-ঋঞ্জসে—আনয়ন কর, নিয়ে এসে।

হে অগ্নি, চক্রের বলয় যেমন চক্রদণ্ডদের চারিদিকে ঘিরে রাখে, তুমিও তেমনি দেবতাদের ঘিরে রয়েছ, তুমিই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ বহুবিধ আনন্দ ॥৬॥

পঞ্চম মণ্ডল—চতুর্দ্দশ সূক্ত

১। অগ্নিং স্তোমেন বোধয় সমিধানো অমর্ত্যম্ ॥
হব্যা দেবেষু নো দধৎ ॥১ ॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
স্তোমেন—স্তবনমন্ত্রে
বোধয়—জাগিয়ে তোল
সম্-ইধান:—প্রজ্বলন্ত করে
অমর্ত্যম্—অমর্ত্যকে
হব্যা—আহুতিসব
দেবেষু—দেবতাদের কাছে, দেবতাদের মধ্যে
ন:—আমাদের
দধৎ—প্রদান করে, স্থাপন করে

অগ্নিকে স্তবনমন্ত্রে সমৃদ্ধ কর, অমর্ত্যকে সমিদ্ধ করে সে, আমাদের আহুতিসব দেবতাদের মধ্যে স্থাপন করে ॥১॥

২। তমধ্বরেষুীড়তে দেবং মর্তা অমর্ত্যম্।
যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥২॥

তম্—তাকে
অধ্বরেষু—যজ্ঞযাত্রায়
ঈড়তে—পূজা করে
দেবম্—দেবতাকে
মর্তা:—মর্ত্যজনে
অমর্ত্যম্—অমরকে
যজিষ্ঠম্—সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞসমর্থ
মানুষে—মানুষে, মানুষী
জনে—জন

মর্ত্যবাসীরা সেই অমর দেবতাকে পূজা করে তাদের যজ্ঞযাত্রায়, মানুষীজনের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা ॥২॥

৩। তং হি শশ্বন্ত ঈড়তে স্রুচা দেবং ঘৃতশ্চুতা।
অগ্নিং হব্যায় বোঢ়বে ॥৩॥

তম্—তাকে
হি—নিশ্চয়
শশ্বন্তঃ—শাশ্বত মানবসন্ততি, চিরন্তন জন্মপরম্পরায় মানুষেরা
ঈড়তে—পূজা করে, স্তুতি করে
স্রুচা—হস্তক বা চমস দিয়ে
দেবম্—দেবতাকে
ঘৃতশ্চুতা—স্বচ্ছতার ধারায় পরিপ্লুত
অগ্নিম্—অগ্নিকে
হব্যায়—আহুতির জন্য
বোঢ়বে—বহন করতে

মানুষ সন্ততিপরম্পরায় চিরকাল সেই দেবতাকে পূজা করে, ওজঃ-পরিপ্লাবী চমসের আশ্রয়ে পূজা করে অগ্নিকে তাদের আহুতি বহনের জন্য ॥৩॥

৪। অগ্নির্জাতো অরোচত ঘ্নন্দস্যূন্ জ্যোতিষা তমঃ॥
অবিন্দদ্‌গা অপঃ স্বঃ ॥৪॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
জাতঃ—জন্ম গ্রহণ করে
অরোচত—দীপ্ত হয়ে ওঠে
ঘ্নন্—হত্যা করে
দস্যূন্—শত্রুকে
জ্যোতিষা—জ্যোতি দিয়ে
তমঃ—তমসাকে
অবিন্দৎ—আবিষ্কার করেছে, লাভ করেছে
গাঃ—গাভীকে, আলোকযূথকে
অপঃ—জলধারাকে
স্বঃ—জ্যোতির্ময় লোককে, জ্যোতির্লোককে

জন্মমাত্রই অগ্নি দীপ্ত হয়ে উঠেছে, দস্যুদের হনন করেছে, হনন করেছে তমোরাজি আপন জ্যোতির সহায়ে, আবিষ্কার করেছে আলোর যূথ, জলরাশি আর জ্যোতির্লোক ॥৪॥

৫। অগ্নিমীড়েন্যং কবিং ঘৃতপৃষ্ঠং সপর্যত।
বেতু যে শৃণবদ্ধবম্ ॥৫॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
ঈড়েন্যম্—পূজ্য যিনি
কবিম্—দ্রষ্টা যিনি
ঘৃতপৃষ্ঠম্—দীপ্তায়তন (সায়ণ দীপ্ত উপরিভাগম্)
সপর্যত—সেবা কর
বেতু—সে যেন আসে
মে—আমার
শৃণবৎ—শোনে যেন
হবম্—আহ্বান (সায়ণ)

অগ্নির সেবা কর, পূজ্য যিনি, কবি যিনি, উজ্জ্বলদর্শী যিনি, আমার আহ্বান যেন তিনি শোনেন, এখানে যেন এসে উপস্থিত হন ॥৫॥

৬। অগ্নিং ঘৃতেন বাবৃধুঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণিম্।
সুধীভির্বচস্যুভিঃ ॥৬॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
ঘৃতেন—ওজঃধারায়
বাবৃধুঃ—বর্দ্ধিত করেছে
স্তোমেভিঃ—প্রতিষ্টানমন্ত্রের সহায়ে
বিশ্বচর্ষণিম্—বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তাকে
সু-ধীভিঃ—চিন্তাকে যথাযথ স্থাপন করে
বচস্যুভিঃ—সম্যক বাক্যকে আবিষ্কার করে যা, সুষ্ঠু বাক্য অনুধাবন করে যা

বিশ্বকর্ম্মকৃৎ অগ্নিকে তাঁরা বর্দ্ধিত করলেন ওজঃধারার সহায়ে আর সেই সব মন্ত্রের সহায়ে যার মধ্যে চিন্তা সুব্যবস্থিত আর যার লক্ষ্য সিদ্ধ বাক্য ॥৬॥

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা কর

(৩৪)

সচ্চিদানন্দের অনুভব নিয়ে যে আলোচনা করা হল, তার বাধা সম্বন্ধে এর পরের অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের বিচার মন নিয়ে। অর্থাৎ মনোময় পুরুষ ব্রহ্মোপলব্ধির পথে সম্যকজ্ঞানযোগে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে। পূর্ণতার কাঙ্ক্ষা যেখানে, সেই পরমলক্ষ্য অধিগত করার ক্ষমতা তার আছে কি? এই ব্রহ্মের সংজ্ঞা কিন্তু সব বিশেষণের অতীত। সৎ চিৎ আনন্দ আমাদের পরিচিত শব্দ। ঐ সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ অনন্ত লক্ষণটি যুক্ত করে সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে ধারণা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম...আনন্দশ্চ" (তৈ. উপনিষৎ) এই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্ম—যদি তা অনন্ত হয়। এখন ওই 'অনন্ত' সংজ্ঞাটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে ধ্যান সহায়ে।

যোগ দর্শন 'অনন্ত' সংজ্ঞাটি বিকল্পের কোঠায় ফেলেন। বিকল্প ক্লিষ্ট বৃত্তি। কেননা শব্দ থেকে অর্থ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তব অনুভব হয় না। বৌদ্ধরা বলতেন, কথার ফেরে পড়না, জ্ঞানকে বোধ নির্বিকল্পক করে, সেখানে পৌঁছও। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনেও জ্ঞানের ধারা নির্বিকল্পক, কিন্তু বোঝাতে বা বুঝতে গেলে বিকল্প আসে। এক চমকে সমগ্র তত্ত্ব যদি ধারণা হয়, তা নির্বিকল্পক; বোধে বোধ হওয়া। ন 'বেদ' বা 'অবেদ' অর্থ করা হয় যে নাকি জানেনা। তার আসল অর্থ হল সাধারণ ভাবে জানা নয়, কিন্তু আর এক রকমে জানা, যে জানা মন বুদ্ধি দ্বারা বাঁধা পড়েনি। মন দিয়ে ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন জানতে চাই, তখন একটা সীমার মধ্যে পড়ি। কিন্তু আভাসে বোধ হয়, তার ওপারে কি যেন আছে, যা এই মন দিয়ে জানা যায়না। এই হল, বোধি (Intuition). তাকে যদি জাগাতে পারি, তাহলে সেই সঙ্গে নতুন বৃত্তিও খুলে যেতে পারে যা মন দিয়ে জানা যায়না। মন নেতি নেতি করে চলে, কেননা মনের বৃত্তি দ্বন্দ্বাত্মক। এ নয় এ নয় করে ধরা-অধরার দ্বৈতের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তার সত্যের সংস্কার হয়। নেতি নেতি করে শেষ পর্যন্ত শূন্যে পৌঁছে অসৎবোধে নির্বিকল্প জ্ঞান হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন তা লোকোত্তর। লোকের সংস্কারও পেরিয়ে যেতে হয়। বৌদ্ধেরা অধ্যাত্মমানসকে কতক-গুলি লোকে বা ভূমিতে ভাগ করেছেন, কামাবচর ভূমি, রূপাবচর ভূমি ইত্যাদি। এখানে বিষয় কিন্তু বিষয়ীর সঙ্গে অনেকটা একাকার হয়ে যায়, আসে তাদাত্ম্যজ্ঞান—নিজেকে দিয়ে জানা। বস্তু তখন বাইরে নয় ভেতরে। এরপর আকাশানন্ত্য আয়তন, অধ্যাত্ম মনোবিজ্ঞান যা অতি উচ্চ অবস্থা। অনন্ত আকাশ-বোধে যে বোধ, সেই আনন্ত্যে উপসন্ন হলে যেখানে আর বিকল্প থাকে না তাকে বলে বিজ্ঞানানন্ত্য আয়তন। সেখানে 'জ্ঞানম্ অনন্তম্', 'জ্ঞেয়ম্ অল্পম্'। তারপরে "যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। বা নিরুপাধিক দশা, যাজ্ঞবল্ক্যের "নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা"। তখনও কিন্তু মানসসংস্কার থাকে। এ-ও

লোক। তারপর লোকোত্তর—Infinite Pure Existence। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন এই লোকোত্তর ও সচ্চিদানন্দ একই সঙ্গে ধারণা করতে পারলে পূর্ণ ব্রহ্মের অনুভব হবে। সগুণ না নির্গুণ, ইহা কি না এই রকম আলাদা করে জানা পর্যন্ত সম্যক জ্ঞান হল না, বৃহতের অনুভব এল না। তাই "এর বাহ্য—আগে কহ আর", এই ভাবে অগ্রসর হয়ে দুদিক মিলিয়ে নিয়ে বুঝতে হবে। মানুষের মনে দ্বৈতের আভাস আগাগোড়া থাকে, চরমে গিয়েও যায় না। সত্যের উপলব্ধি যে তারও উজানে, এটা সর্বক্ষণ জানা চাই। এ কাজ সোজা নয়। সমগ্রকে জানতে ও ধরতে হলে কত যে গ্রহণ করতে হয় ও ছাড়তে হয়, সমন্বয় করতে হয়, তার কি সীমা আছে? শেষ পর্যন্ত লোকান্তরে আমার চেতনা ও ব্রহ্মচৈতন্য একাকার হয়ে গেল। কিন্তু আমার ভেতরে তার প্রতিষ্ঠা অত সহজে একদিনে পাকা হয় না। লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি "লোক" সমূহের মূল বস্তুকে ধরা যায়, তবেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভব সত্য হয়ে ওঠে। যেমন কিনা বন্যায় পলি পড়তে থাকে, সেই পলি পড়ে পড়ে মাটি হয় চর জাগে, সেই ভাবে সত্যের সংস্কারও ধীর হয় পাকা হয়।

দেখছি চরমে গিয়েও মনের যে বিকল্প, এক প্রহেলিকার সামনে তাকে পড়তে হয় —এটা না ওটা। এই দ্বিধা বা সংশয় শেষ পর্যন্ত তাকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু মন চরম সত্যকে জানতে চায়। যে মন তাকে জানতে চায় সে-ই নচিকেতা, সে কিশোর, শ্রদ্ধাবিষ্ট তার চেতনা। মৃত্যুতে যে সব শেষ হয় না, তা ছাপিয়ে আরও যেন কি আছে, এই আভাসে সে উতলা। তাই তার প্রশ্ন আমাকে নিয়ে মন কি করবে? এ প্রশ্ন কিশোরের, পণ্ডিতের নয় বৃদ্ধের নয়। এরই জোরে সে তিন রাত্রি মৃত্যুপুরীতে উপবাসী হয়ে অবিদ্যা পার হয়ে ফিরে আসতে পারল। সে 'অবেদা' হয়ে মৃত্যুর কাছেই তার রহস্য জানতে চাইল। সে রহস্য এই সচ্চিদানন্দ ও তার আনন্ত্য। যেমন সম্ভূতিতে তেমন অসম্ভূতিতে দুদিক দিয়েই তাকে সে জানবে। তাই যে বলে "ন বিত্তেন তর্পণীয়: মনুষ্য:।" নচিকেতা মন নিয়ে এমন করেই মানুষকে নেতে হবে "ন বেদা" চেতনায়। আর অসম্ভূতি এবং সম্ভূতি যুগপৎ জানতে হবে, জানতে হবে অনন্তকে, এ-ই মানুষের দায়। দেহ প্রাণ মন নিয়ে মানুষ, কিন্তু সে মনন করে, মনই তার জানবার প্রধান অবলম্বন। কামপুরুষ হয়েই সে যাত্রা করেছে বিশ্বের পথে। তারপর যখন সে বোঝে তার আত্মধারা তর্পণ ওতে হবে না, নচিকেতার অভীপ্সা নিয়ে উজানপথে অগ্রসর হয়। তখন সে হয় চৈত্য পুরুষ শুদ্ধ মন শুদ্ধ আত্মা।

সচ্চিদানন্দ বোধে যে মন জেগেছে, সে spiritualised mental being. দেহ প্রাণ মনের অতিরিক্ত যে বোধ, সে বোধ মানুষের আত্মবোধ। তাকে যদি সোজা-সুজি জাগিয়ে তোলা যায় তখনই অধ্যাত্মপুরুষের সচ্চিদানন্দের বোধ হয়। আবার তার মনোময় পুরুষও তো আছে। মন সাধকের যেমন সহায় হয়, তেমন আবার নিজের রঙে তাকে রাঙিয়ে দেয়। মনের সংস্কারে এই বাধাটা থেকেই যায়। মনের নীচে প্রাণ, তার নীচে দেহ। মনশ্চেতনার কিছুটা প্রাণে কিছুটা দেহেও সঞ্চারিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। প্রথমেই আসে দেহের কথা, কেননা প্রাকৃত দশায় সেটাই সব চেয়ে বাস্তব সত্যের অনুভব। সেই দেহবোধ যদি আকাশ হয়ে যায় তবে জানি "আকাশশরীরং ব্রহ্ম..."। শুদ্ধ সত্তামাত্রের বোধে দেহবোধ পর্যবসিত হতে পারে আকাশ-চেতনায়। এরপর

চৈতন্যের কথা আসে, মনের মধ্যেই তার প্রকাশ। তাই আত্মবোধের অনুকূলে মনকে শুদ্ধ করে নিতে হবে। আর প্রাণের মধ্যে নিতে হবে শুদ্ধ প্রাণকে। প্রাণ সাধারণত পাখীর মত ডানা ঝাপটে ছট্‌ফট্ করে। কিন্তু যেখানে মন নেই সেখানেও সে যেতে পারে, যায়ও। দেহগ্রস্ত মন আছে, প্রাণগ্রস্ত মন আছে, তারপরে আছে বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই আনন্ত্যের সন্ধান দেয়। মন ইন্দ্রিয় দিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখে। বুদ্ধির উন্মেষে এই মনের জ্ঞানই ছড়িয়ে পড়ে, এবং সেই সামান্য জ্ঞানে অনন্তের আভাস পায়। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে হয় বিজ্ঞান, তারপরে প্রজ্ঞান।

তাহলে দেখছি মন যদি দেহে ও প্রাণে আবদ্ধ থাকে, তাহলে মনের ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছাই হয় না। বুদ্ধি দিয়েই প্রথম জানার চেষ্টা আসে। কিন্তু বুদ্ধিরও শুদ্ধি চাই, না হলে ঠেকে যেতে পারে। শুদ্ধবুদ্ধি হলে পরে মন যদি বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের প্রসাদ নাও পায়, তাহলেও একটা যেন প্রেরণা পায়, কার এষণায় সে ছুটে চলে। সে তখন বলে—ব্রহ্মকে, অনন্তকে কি জানা যায়? মন ক্ষণে ক্ষণে অনন্তকে ধরতে চায়। অনন্তের সন্ধানে মনের যে জ্ঞান, তাতে তার আয়তন বেড়ে চলে। কিন্তু মনের সংস্কার দ্বিধা নিয়ে অধ্যাত্মবোধের উচ্চতর ভূমিতে পৌঁছান যায় না।

এরপর আনন্দের কথা আসে, তার সঙ্গে জড়িত আছে 'অহং'বোধ। অহংবর্জিত হলে সেই স্বরূপের আনন্দে মনও বাদ পড়ে যায়, কেননা তাকে ধরা মনের পক্ষে কঠিন। মন সুখ বোঝে, তাই আনন্দ বলতে সে সুখ চায়। সুখে উদ্দীপ্ত দুঃখে ম্রিয়মাণ অথবা শুদ্ধ জড়, মনের এই তিন দশা। কিন্তু আনন্ত্য, আকাশ-আনন্দ! মন সেখানে দীন হীন হয়ে পড়ে।

ব্রহ্ম লোক হয়েছেন আবার লোকোত্তর হয়ে আছেন। আরও কত কি হতে পারেন, মন দিয়ে তা কি ধরা যায়: তাতে শক্তিরই দৈন্য রয়েছে, সচ্চিদানন্দের আনন্ত্য তো অনেক দূরের কথা। এই দীনই শিব হবে, সেটা কেমন করে সম্ভব মনের তা অজানা। বাইরে যে বহুর মেলা, তাকে এক বলে জানতে গিয়ে, বিচ্ছিন্ন বহির্বিষয়গুলি সব জুড়ে জুড়ে সমষ্টির দল বেঁধে বৃহৎ হওয়ার ভাবনা সে করে। মনের মধ্যে ঐ ভাবে, তার বাইরে কে সে জানতে পারে না, এই তার দৈন্য।

'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা' সিদ্ধের (realised being) কথা। মন বহুকে এক করে সামাল দিতে না পেরে জীব হয়েই থাকে। ভাবে, জীব শিব হবে কেমন করে? এই ভাবে spiritual being আর mental being-এর মধ্যে অনেক ফাঁক, যেমন কিনা ভারতের দর্শন আর পাশ্চাত্য দর্শনে অনেক বিভেদ আছে। সমগ্র মনের বোধ যার হয়, তিনি আধিকারিক পুরুষ। মনোময় চেতনা বিস্ফারিত হয়ে যায়, পরিব্যাপ্ত হয় বিশ্বচেতনায়, পরিবর্তিত হয়ে তখন মনের রূপান্তর ঘটে। এই সম্ভাবনা অধ্যাত্মবোধে স্বীকৃত। অসম্ভ সংজ্ঞাটি মনের কাছে প্রহেলিকা। তবুও একথা সত্য যে, মনের ঐ রূপান্তরেই অনন্তকে জানবার সম্ভাবনা ঘটে। সীমার বাঁধন না মেনে, মতুয়ারী না করে তৌষ্টিকতায় মজে না গেলে তার পক্ষে ঐ অনন্তে সমাপন্ন হবার পক্ষে বাধা 'কোথায়'? এরকম করেই অনন্তের সংস্কার হয়।

নেতিমূলক সাধনায় যে অমনীভাবের কথা পাই, সেখানে তাদের লক্ষ্য মনের বিকল্প যেন কোনও তরঙ্গ না তোলে। আর এক দিকের সাধনায় আছে মনের ব্যাপ্তি, যখন হৃদয়ের সঙ্গে তার যোগ হয়, উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যেমন বলেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেছেন, মনো বৈ অনন্তম্—মন অনন্ত হয়ে যায়। ব্রহ্মের বা অনন্তের সংস্কার মনে জাগলে মন হয়ে যায় শুদ্ধ মন। সেই মনই যজমান। তারপরে আছে দৈবচক্ষু মনের কথা। এই রকম করে উপনিষদেও মনের বহুস্তর দেখানো হয়েছে। সংহিতায় পাওয়া যায় চিকিত্বান্ মন বোধিমনের কথা। "যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যেখানে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর অনন্ত, মন তাকে ধরতে পারে না। কিন্তু অনন্তের আভাস ছাড়া মন কিছু করতেও পারে না। আমরা সাধারণভাবে মনোময় আর বিজ্ঞান বা আনন্দময়ের পার্থক্য ধরতে পারি না বলে কথার ফাঁদে আটকে যাই, অর্থবোধ হয় না। মনের পিছনে বোধির বিরাট এলাকা যেখানে, সেখানেই চিন্ময় পুরুষ আত্মা, আত্মবোধ দিয়ে চেতনার মাঝে তাঁকে ধরতে হয়।

মন যজমান, তার আকুলি বিকুলি আছে। কিছু সে পায় আভাসে, না হলে বাঁচে কি করে? কঠোপনিষদে নচিকেতার যে যজমান-মন, সেখানে শ্রদ্ধার আবেশই আগল কথা। "তোরা শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি...সে আসে আসে..." এই হল শ্রদ্ধার প্রথম আবেশ। বোধি হৃদয়েরই বৃত্তি আর মনের বৃত্তি আসে বোধ থেকে। ঐ বোধিই অজানা লোক থেকে এমন একটা প্রত্যয় আমার মনে এনে দেয় যে, সে সম্বন্ধে আমার বোধ নিশ্চিন্ত হয়। তখন "যুক্তি তারে পারিহাসে মন তারে সত্য বলে জানে।" ভালোবাসায় যেমন এই মনেরই একটা পর্দা যেন খুলে গিয়ে আর একটা দিক উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দেয়, সেইরকম একটা আভাস পেলে মনও সেই দিকে চলতে চায় "দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচেনা, ওগো দরদী প্রাণ আমার উদাসী হতে চায় যে—" এইরকম একটা বেদনা ব্যাকুলতা এসে প্রত্যয় দৃঢ় হলে, মনের আগড় একেবারে খুলে যায়। অনন্তের বোধি আসে, ক্ষুদ্র মন বুদ্ধি তবে ছাপিয়ে তা উপচে পড়ে। তখন আমার এই 'মাটির কলস' যদি অক্ষীয়মান উৎসের শত ধারার সেই স্বর্ণধারায় উপচে পড়ে ছাপিয়ে যায়, তাকে কি তখন অনন্তের বোধে ভরা বলব না? মন তখন নিজেকে শান্ত ক্ষুদ্র বলে বেশ বুঝতে পারে। সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদ তেমনি সেই একের মধ্যেই যেন বহু ফুট কাটে, যেমন কিনা একটা পর্দার পরে অনেক আলোর ফুট পড়ে। একে অন্যকে জানে না বলে যেমন বিরোধ সৃষ্টি হয়ে পড়ে, তেমনি ভালবাসায় আবার পরস্পরের মিলন হয়। তখন মুক্তিরও প্রয়োজন। ওই একের মধ্যে তাঁকে দেখলে বা বুঝলে অধ্যাত্ম চেতনা জাগে, নিজেকে ছাড়িয়ে, তখন ছাপিয়ে যেতে চাই। এখানে সেই সঙ্গে সহজ প্রত্যয়কে ধরতে হবে। ওই একের বোধ দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হলে অধ্যাত্ম চেতনার ভূমিও পাকা হয়। একের মধ্যে বহুকে ধরতে পারা যায় যখন, তখনই মন আর অধ্যাত্মচেতনার মাঝে সেতুবন্ধন হয়।

সে এক ব্যক্তিচৈতন্যের বোধ, অনন্ত তার বিস্তার। আকাশ আমার চারিদিকে, আমি এতটুকুর মধ্যে আর আবদ্ধ নই। এইভাব আনতে গিয়ে কিসে আবদ্ধ থাকি, আর কিসে থাকিনা, তা দেখতে হবে। দেখি, ছোট ছোট কামনা বাসনায় নিজেকে বোঝাই

করে চাওয়ার জঞ্জাল জমা করেছি। অল্প পেয়ে 'ভূমা'কে চিনিনে আবার অল্পতেই বা তুষ্টি কোথায়? তাই বৃহতের বোধ চেতনার পশ্চাতে অনুক্ষণ জাগিয়ে রাখতে হবে, অনন্তে সমাপত্তি চাই। অল্পকে আঁকড়ে ধরবে না। অসীম অনন্তের বোধ সত্যের নিষ্ঠায় চৈতন্যের দীপ্তিতে ও আনন্দে সীমার মাঝে প্রকাশ পায় ঐ তিনটি সংজ্ঞাতেই, সৎ চিৎ আনন্দ। আবার তারই মাধ্যমে ঐ অসীম অনন্তের বোধ চিরন্তন আশ্রয় পায় আমারই হৃদয়ে। আকাশ সমুদ্র ফুরাবে না। বুদ্বুদ উঠবে, ভেঙে যাবে মিলিয়ে যাবে ঐ সমুদ্র হৃদয়ে। তাই এক প্রসন্নতা, কোথায়ও কোনও নালিশ নেই। এক সব জুড়িয়ে যাওয়া আরাম, সম্প্রসাদ! সচ্চিদানন্দের গাঢ়তর অনুভব এইভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে।

অসীম ও সসীম মুখোমুখি হলে আবার এ থেকেও প্রখর দিকে বাধা আসতে পারে। কিন্তু পরমের সঙ্গে ভাবের ও রসের সম্পর্ক ঘটলে এক মহিমার বোধও দেখা দেবে। তিনি বিরাট মহান, তাই সেই বৃহতের সঙ্গে, মহান্ পরমের সঙ্গে যোগে এক উদ্দীপনা জাগবে। তাতে দুয়ের মাঝে ভেদ অনেকটা লুপ্ত হয়। "সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না," "তোমার গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমার রূপে" ইত্যাদিতে ঐ ভাব ফুটে উঠেছে। আর নিবেদনে সব কিছু তাঁকেই লুটিয়ে দিই, আমি যে তাঁরই, তা তো ভুলতে পারি না। তারপর এমন সময় আসবে যখন বলতে পারব "তুমি আমার"। ভক্তেরই এই গরিমা এই ভোর থেকেই আসে ওই মহিমবোধ।

আবার মহিমবোধ যখন শুধু শ্রুতিজনিত বোধ, হৃদয়ের বোধ নয়, তখন প্রশ্ন ওঠে, তাঁকে কি অত আপন করে পাওয়া যায়? জ্ঞানের কথা ও দর্শনের তত্ত্বে বুঝেছি তাঁতে আর জীবে যে প্রবল দূরত্ব ভেদ। নেতিবাদে দেখানো হয়েছে তিনি সব কিছুর ওপারে। কিছুই সেখানে থাকেনা। এ সত্য কিন্তু তা থেকেও চিত্তে এক ধীর্য উদ্ভূত হয়। বিরাটের বোধ নিয়ে চলে জিজ্ঞাসু সসীমের ঐ মহাশূন্যেই তখন ঝাঁপ দিতে পারে। এপারের কিছুই থাকলনা, সব নির্মূল করে মৃত্যুর গহ্বরে নির্ভয়ে অবতরণের দ্বারা সব শেষ করে দিতে চাই। ভক্তির দিক থেকেও এরকমের অবস্থা আসে। সেখানে ভক্ত বলে তুমি বৃহৎ মহতো মহীয়ান, আমি তো তোমারই অণু, আমাকে তুমি গ্রাস কর। তোমার ওই ভূমায় আমি লয় পেয়ে যাই। কিন্তু ভক্তের বাধা—যে জীব ও ভগবান এক হবে কি করে? কিন্তু নরনিয়ার অনুভব বলে "জান্ত মরা" হয়ে থাকি, হারাতে চাই অথচ একেবারে হারাতে পারিনে। দশনী দশায় "মুক্তির" কথা আছে। তাঁর দ্বারা এভাবে পূর্ণগ্রস্ত হলে ভেদবুদ্ধি কি আর থাকতে পারে? সর্বনাশা সেই গ্রাস কিন্তু প্রাকৃত জগতে ফিরে এলে থাকেনা। আবার মন বাধা পায়। মহাশূন্যে ঝাঁপ দিতে সাধক মরণ কবুল করে এগিয়ে যান। তারই পরিচয় পাই নির্বাণষট্‌কে, "মনবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানি নাহং" ইত্যাদি। এ অবস্থায় এমন এক চোখধাঁধানো প্রত্যয় আসে যখন জগৎকে বা সমগ্র বিশ্বকেই মায়া বলে বোধ হয়। তাতে জগতের ব্যাপারে দেখা দেয় ওপবৈতৃষ্ণ্য, তখন এদিকের কোন ব্যাপারে মন নামতে পারেনা। যতই রস আসুক, সব ছাপিয়ে এক তীব্র বৈরাগ্য—নেতি নেতি। তখনকার এই প্রবল বাধার অনুভবও কিন্তু এই দেহেরই প্রাণে ও মনে, জীবদ্দশায় জীবন্তেরই অনুভব। এইভাবে প্রচণ্ড ঐশ্বর্যও যেমন আসতে পারে, তেমনি আসতে পারে প্রবল

বৈরাগ্যের বন্ধন। কেননা নাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে না যেতে পারলে ফিরে আসতে হয়, নামতে হয় আবার। কিন্তু যা দেখে ফিরে আসা, তাকে না পাওয়ার বিপুল বেদনায় আসে বারবার ওঠা আবার নামা। যেখানে বাসনা সংস্কার প্রবল, যেখানে মন প্রাণ নিরুদ্ধ করে দেহ নিঃশেষ করে ওর নিরোধ জন্য নিরোধ চায়। যেন এই দেহটাই বন্ধ বাধা। তাই পরমপ্রাপ্তির জন্য এটা ছেড়ে দেওয়া—দুঃসাহসিক সাধনবীর্যে মৃত্যুতে দেহ নিঃশেষ করে দেওয়া।

কিন্তু দেহগতি রুদ্ধ করলেও কি মহাশক্তির গতি রুদ্ধ করা যায়। তাই এরকমও বলা যায় যে দেহতত্ত্ব সম্যকরূপে জানা হয়নি বলেই এই সব মৃত্যুমুখিক নেতিপথের সাধক সুদীর্ঘ এক মৃত্যুতে ডুবে থাকেন, তাঁরা "অব্যক্তচিত্তাকারঃ"। জীবন ও মৃত্যু দুটোকেই পূর্ণরূপে জানা যদি না হল, তাহলে সে জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান হয় কি করে? উপনিষদে কিন্তু প্রাচীন এই দুটি ধারাই দেখা যায়।

গীতা বলেন ব্রাহ্মীস্থিতির কথা, তাকে জীবন্মুক্তিও বলা যেতে পারে। এই জীবনেই মহাশূন্যের বোধ নামিয়ে এনে চলা। নরূপে ব্রহ্মনির্বাণ আছে কিন্তু জীবনেও স্থিতপ্রজ্ঞ স্থিতধী যখন চলেন বলেন তিনি অসীম অনন্তের বোধেই থাকেন আর তখন তাঁর জীবনেই "অভিতো ব্রহ্মনির্বাণ", এখানে থেকেও তিনি ব্রহ্মে নিমজ্জিত আছেন। তাঁর বোধ ব্রহ্মময়—এতএব জগৎও ব্রহ্মময়।

তাহলে মনের যে কুণ্ঠা বা ক্ষুদ্রতার বাধা তার মধ্যে বারবার অসীমকে নামিয়ে আনা, অসীমের বোধে অপ্লুত থাকা, মনের দুয়ার উন্মুক্ত করে—অসীমকে দিয়েই চিত্ত ভারিত করে নেওয়া —এই হল সাধনা। নিজেকে এমন স্বচ্ছ করে নিতে হবে যাতে অসীমের জ্ঞান বীর্য আনন্দ সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। এতে মনকে অত্যন্ত করা চাই। শুদ্ধ মনের বৃত্তি দর্পণের মত। শিশিরবিন্দুর মধ্যে সৌরবিম্বের মত তাতে প্রতিফলিত হবে অসীম অনন্ত, কোনও দিক দিয়ে এতটুকু বাধা থাকবেনা।

উপনিষৎ বলেছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আত্মা বলতে কিন্তু তাঁরা দেহ মন প্রাণ সব বুঝতেন। তাই মনকে যেমন স্বচ্ছ করার কথা বলা হল, তেমনি বুঝতে হবে দেহ প্রাণ মনেরও বিশুদ্ধি চাই। "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি"। উপায়? সব কিছু, যা কিনা আহরণ করা হয় তাঁকে সমর্পণ করে তাঁর প্রসাদ বলে গ্রহণ করতে হবে। তাতে প্রাণও অক্ষুব্ধ হবে। কেননা কামনা বাসনা লোভের বুকে তাঁর প্রসাদ দিয়ে আমার রসবোধও অনুসিক্ত করে নেব। তখন বাসনাজনিত বিক্ষোভ থাকবেনা, প্রাণে অক্ষুব্ধ বীর্য জাগবে। শুদ্ধ প্রাণ হবে বীর্যবান ওজস্বী আর শুদ্ধদেহে আসবে স্বাস্থ্যের স্বাচ্ছন্দ্য। দেহবোধ হবে যোগাগ্নিময়, দেহের প্রতি রোমকূপ হতে প্রজ্ঞার ছটা বিচ্ছুরিত হবে। বটগাছের গুঁড়ির ভেতরে প্রদীপের আলো থাকলে যেমন ছিদ্রমুখ দিয়ে আলোর ছটা বেরোয়, তেমনই তাঁর দেহজ্যোতি ইন্দ্রিয়পথেও (সর্বদ্বার দিয়ে) প্রকাশিত হবে। শ্রীঅরবিন্দ Electric Dynamo-র সঙ্গে তুলনা দিয়ে এইরকম শক্তির বিচ্ছুরণের কথা বলেছেন।

সব ছাপিয়ে ওপারে মহাশূন্যে যা পাওয়া, দেহেও তাই পাওয়া যাবে, দেহশুদ্ধির এই তো চরম কথা। ভগবান বুদ্ধের চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোর ছটা চলতে দেখা যেত।

বৌদ্ধরা তো নৈরাত্ম্যের সাধনা করতেন, সেই সিদ্ধিকে দেহবোধে পর্যন্ত নামিয়ে আনা, অর্থাৎ দেহে শূন্যতার অনুভবকে তাঁরা নাম দিয়েছেন পুদ্‌গল নৈরাত্ম্য। গীতা যে বলেছেন অভিতো ব্রহ্মনির্বাণের কথা সেটা তাঁদের মতে ধর্ম নৈরাত্ম্য। পুদ্‌গল নৈরাত্ম্য হল প্রত্যেকবুদ্ধত্ব, তা থেকে যখন চতুর্দিকে ঐ রকম প্রজ্ঞান নিঃসৃত হতে থাকে, তখন তিনি হয়ে যান সম্যক্ সম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ মাত্র নয়। লোকোত্তর নির্বাণে গিয়েও তিনি নেবে এসে মাঝামাঝি এক ভূমিতে বিশ্বজগতের চৈতন্যকে আপ্লুত করে দিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন বাহাদুরী কাঠের কথা। সেইরকম একটা সঙ্কল্প থাকা চাই যাতে ঐ শূন্যতার Charge সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে থাকবে। যাজ্ঞবল্ক্যের সাধনায় পেয়েছি জীবদ্দশায় জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা। তেমনি করেই বিদেহধারণার মধ্যে দিব্যদেহের ধারণা করতে হবে। এই হল অমৃতদেহের ভিত্তি। একে অবলম্বন করে অনুভূতির কোনও কূলকিনারা নেই। তাই পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের ভেদ নিরসন করতে মন যতক্ষণ না পারছে, সেটা হল মনের (Mental being) সর্বশেষ বাধা।*

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

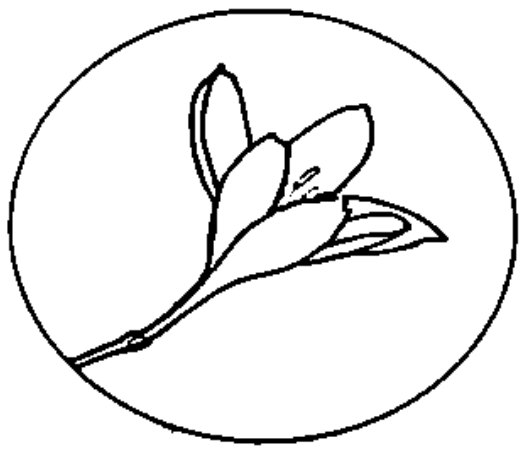

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

Thoughts and Aphorisms

(স্থানে স্থানে মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৩৭০—কেবল জানতে পেরে কি লাভ? তার চেয়ে আমি বলি, তুমি তা কাজে করো এবং নিজে হও, কারণ ঐ জন্যই ভগবান তোমাকে এই দেহ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

৩৭১—কেবল সম্ভূতিতে কি লাভ? আমি তাই বলি, তুমি কিছু একটা হও, কারণ সেইজন্যই এই জড়জগতে তোমাকে মানুষরূপে পাঠানো হয়েছে।

৩৭২—ভগবানের দেওয়া তিনরকম পথের মধ্যে কর্মের পথটাই এক পক্ষে সব চেয়ে কঠিন; অথচ এই বাস্তবের রাজ্যে এই পথই সব চেয়ে সহজ, উদার ও আনন্দের নয় কি? কারণ এতে কর্মী প্রতি মুহূর্তেই ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসে হাজার রকমে তাঁর সংস্পর্শ পেয়ে তাঁরই সত্তার মধ্যে উঠে যেতে পারে।

৩৭৩—কর্ম পথের আশ্চর্য গুণ হলো এই যে এতে ভগবানের সঙ্গে বিরোধিতা করেও মুক্তির সুযোগ মেলে। কারণ অজেয় শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হলে তাতেও আমরা তারই আকর্ষণে তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করি।

মা অর্থাৎ, ভগবৎ কৃপা এমনই পরমাশ্চর্য যে তুমি যেমন কর্মই করো তাতেই তোমাকে অল্পবিস্তর শীঘ্রই দিব্য লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। ৫-৩-১৯৭০

৩৭৪—মৃত্যুকে আমি কি মেনে নেবো, অথবা তার সঙ্গে লড়ে গিয়ে তাকে জয় করবো? এ বিষয়ে ভগবান যা চাইবেন তাই হবে। কারণ আমি বাঁচি কিংবা আমি মরি, সবের মধ্যেই তো রইলাম আমি।

৩৭৫—তুমি যাকে মৃত্যু বলো এটা তাহলে কী? ভগবান কি মরেন কখনো? ওহে মৃত্যুভীত, জীবনই যে তোমার সঙ্গে খেলছে মৃত্যুর ও ভয়ের মুখোশ নিয়ে।

৩৭৬—উপায় আছে যাতে অমর হওয়া যায় কিংবা প্রকৃতির হুকুমে ছাড়া ইচ্ছামৃত্যুও হতে পারে; কিন্তু কে চাইবে একই দেহ নিয়ে একশো বছর জীবন কাটাতে আর একই সংকীর্ণ ও পুরোণো খাঁচার মধ্যে চিরদিন ধরে বাস করতে?

প্রশ্ন: কেউ যদি দেখে যে জীবনে তার কাজ ফুরিয়েছে, কিছু আর করবার নেই, তাহলে কি লক্ষ্যহীন অস্তিত্বের চেয়ে মরে আবার পুনর্জন্ম নেওয়া ভালো নয়?

মা : এ সব তারাই ভাবে যাদের অতৃপ্ত অহংএর ইচ্ছামত কিছু হচ্ছে না। কিন্তু যে ভগবানের আপনজনরূপে তাঁরই সত্যের মধ্যে থাকতে চায়, সে জানে যে তিনি রাখবেন তাকে পৃথিবীতে যতদিন দরকার, আর যখন দরকার নেই তখন তিনিই সরিয়ে দেবেন। সুতরাং সে কখনে এই প্রশ্নই ওঠেনা, ভগবানের পরম প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর ক'রে সে শান্তিতেই থাকে। ৬-৩-১৯৭০

প্রশ্ন : মা, কাল লিখেছেন "ভগবানের আপনজন হয়ে" থাকার কথা, কিন্তু যে কেউ হোক, সকলেই তো তাঁর আপনজন, তাই ঠিক নয় কি?

উত্তর আমি যখন বলি "ভগবানের আপনজন হওয়ার" কথা, তখন তার মানে এই যে সেই হবে তাঁর প্রকৃত আপনজন যে তার অহং ত্যাগ করেছে, যে সর্বক্ষণ ভগবান সম্বন্ধে সচেতন, ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলতে কিছু যার নেই ; যে কাজ করে শুধু ভগবৎ প্রেরণায়, যার ভগবৎ নির্দেশে চলা ব্যতীত অন্য কোনো লক্ষ্য থাকে না। এমন অবস্থা যে অনেকের মধ্যে আছে তা আমার মনে হয় না। আর এ কথাও নিশ্চয় যে তারা বেঁচে থাকা দরকার কি না তাই নিয়ে আদৌ ভাবতেই যাবেনা, কারণ ভগবানের জন্যই জীবন বলে তাদের ব্যক্তিগত কিছু নেই। ৭-৩-১৯৭০

৩৩৭—ভয় আর উদ্বেগ হলো ইচ্ছারই বিকার, কারণ যেটাকে তুমি ভয় করছ আর যা নিয়ে অনবরত চিন্তা করছ তাকে তুমি ওর দ্বারাই টেনে আনবে। কারণ যদিও এটা ঠিক যে সজাগভাবে যাহা ইচ্ছা তাকে চাস না, কিন্তু তোমার ভিতরকার গুপ্ত মন তারই ইচ্ছা নিয়ে সর্বক্ষণ লেগে আছে, সে মন তোমার সজাগ বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি বলবান ও ব্যাপক ও সাফল্যযুক্ত। তবে আত্মা হলো এ দুইয়ের চেয়েও বেশি বলবান। আত্মার নির্লিপ্ত শক্তি ও প্রভুত্বের কাছে ভয় এবং নির্ভয় দুইই বাধা নিচু ক'রে থাকে।

৩৭৮—ভগবান এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন তাঁর আত্মজ্ঞান দিয়ে, এবং তা কাজ করছে আপন উদ্দেশ্যমূলক ইচ্ছাশক্তির জোরে। আর সেই অসীমতাকে তিনি সীমায়িত করেছেন অজ্ঞানতার মধ্য দিয়ে ; আর ভয়, অস্বস্তি, অবসাদ, সংশয় ও দুর্বলতা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি আপন সৃষ্টিকে নষ্টও করছেন। তুমি যদি তোমার যত কিছু অশুভ ও বিষ্ণুকারী এলোমেলো অংশগুলির উপরে ঐ সব জিনিসকে আরোপ করো তাহলে সে ভালো কথা ; কিন্তু যদি ঐগুলি তোমার মূল জীবনকে ও শক্তিকে আক্রমণ করে তাহলে তাড়িয়ে দাও ওগুলিকে, নতুবা তোমার মৃত্যু।

মা : ঐ সব বিরুদ্ধ শক্তি যখন এসে আমাদের আক্রমণ করে, তার মানে আমরা অহংমুক্ত হয়ে ভিতরকার ভগবৎ উপস্থিতির সম্বন্ধে সজাগ হতে তৈরী হচ্ছি, অতঃপর অহং-শূন্য শান্তি ও আনন্দের শক্তিতে দুঃখমুক্ত হতে পারি। যত কিছু দুঃখ অহং জিনিসটাই আনে, অহংই বাধা দেয় ভগবৎ উপস্থিতির চেতনা আসাকে, যাতে তাঁর সুদৃঢ় ও আনন্দময় যন্ত্রে আমরা সহজে পরিণত না হই। এই অহং চেতনাকে তার কামনাবাসনা সমেত ভগবানে সমর্পণ করো, পূর্ণ বিশ্বাসে ও মুক্তির নিশ্চয়তায়। ৯-৩-১৯৭০

৩৭৯—মানুষ তার আপন শক্তি ও তার সমুচিত সার্থকতাকে নষ্ট করছে দুটি প্রবল অস্ত্রের দ্বারা—অনর্থক অপব্যয় ও অহেতুক নিরোধ।

৩৮০—এই ভুলটি সর্বদাই করা হয়, পূজাপাঠের রাস্তা ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ, আবার সন্ন্যাস ছেড়ে পূজাপাঠে ফিরে আসা। দুইই স্বতন্ত্র, আর দুইই ভ্রান্ত।

৩৮১—জীবনে ও কর্মে যেন খেলাচ্ছলে হাল্‌কা ভাব নেওয়া অথবা অত্যন্ত গুরুত্ব বোধে খুব গুরুগম্ভীর ভাব নেওয়া, দুইই বর্জনীয়। ওতে বেপরোয়া স্বভাব বা অতিরিক্ত-তার দোষ আসে।

মা : বাড়াবাড়ি কোনো দিকেই ভালো নয়, কেবল শান্ত ও সংযত সঙ্গতি থেকেই সত্যকে পাওয়া যায়। ১০-৩-১৯৭০

৩৮২—প্রায় চল্লিশটি বছর আমি ছোটো বড়ো নানা রোগে ভুগেছি, দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে ভেবেছি যে প্রকৃতি নিত্য আরোগ্যচেষ্টার বোঝা আমার উপর চাপিয়ে রেখেছে। কিন্তু যখন আমি সব কিছু ওষুধপত্র ছেড়ে দিলাম, তখন হতাশ বীজাণুর মতো রোগও আমাকে ছেড়ে গেল। তখন বুঝলাম আমার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যশক্তি কতটা জোরালো, তার চেয়ে বেশি জোরালো ইচ্ছা ও বিশ্বাসের শক্তি, যা স্বয়ং ভগবানের দান।

মা জীবনের সব ঘটনাই এই শিক্ষা দেয় যে মনকে যেনে চলা ছেড়ে ভগবৎ কৃপাতে বিশ্বাসই এনে দেবে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার শক্তি, যাতে কেবল শান্তি ও আনন্দ নয় কিন্তু দৈহিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যও মিলবে। ১১-৩-১৯৭০

৩৮৩—আধুনিক মানুষ এমন যন্ত্রাদি-নির্ভর হয়েছে শুধু তার দুনিয়ার বর্বরতা হতে। আমরা যদি কেবল আরাম বিরামের ব্যবস্থার মধ্যেই নিজেদেরকে ঘিরে রাখি, তাহলে সূক্ষ্মতর আর্ট বা ললিতকলার সব কিছু বাদ পড়ে; কারণ সহজ সরল মুক্তি না থাকলে সুন্দরও বাদ হয়ে যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিলাসিতা ছিল বটে কিন্তু তার একটা মহিমা ও মূল্য ছিল, আজ তা এমন জড়ানো নয়।

৩৮৪—ইউরোপীয় জীবনের যে বর্বরোচিত আরামদায়ক বহু অত্যাজ্য আড়ম্বর তাকে সভ্যতা বলতে পারিনা। আত্মার মধ্যে স্বাধীন ও জীবনে সুছন্দপূর্ণ যারা নয় তারা কখনো সভ্য নয়।

৩৮৫—ইউরোপের প্রভাবে এখনকার আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে অদরকারী চাকরদের মতো; কিন্তু হওয়া উচিত ছিল ঘর সাজাবার নিপুণ অধ্যক্ষের মতো।

মা : মনই যতদিন সবজান্তা রূপে আধিপত্য করবে ততদিন কেমন ক'রে ভগবানের আধিপত্য ঘটবে? ১২-৩-১৯৭০

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

১৭ই মার্চ, ১৯৫৪

প্রশ্ন : (মায়ের "Education" থেকে) আপনি এখানে বলেছেন—"সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রসাধনগুলির উদ্দেশ হলো যাতে আত্মার অভিমুখে অভিযানের পথে দেহ-চেতনার সর্বপ্রকার বাধাগুলিকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়।

উত্তর আগেকার কালের আধ্যাত্মিক সাধনাতে জড়দেহের রূপান্তর আনা অসাধ্য জেনে দেহকে সাধনার পথে অবাঞ্ছিত বাধা বলে জ্ঞান করা হতো—তাই তখন চাওয়া হতো যাতে আত্মা দেহবন্ধনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতিসকল আয়ত্ত করতে পারে। সেইজন্য তারা দেহকে সাধ্যমত নির্যাতনের দ্বারা প্রাণশক্তিকে খর্ব ক'রে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মতো অসাড় ক'রে দিতো। আমি তাদেরই জবানিতে ঐ কথাগুলি বলেছি।

প্রশ্ন : গতবারের বুলেটিনে আপনি বলেছেন—"যারা তাদের ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখে তারা সম্পূর্ণভাবে তাঁরই হয়ে যায়। তাদের জীবনের সকল ঘটনা হয় তাঁরই ইচ্ছামত এবং তারা তাই নির্বিবাদে মেনে নেয়, কেবল নীরব আত্মসমর্পণের সঙ্গে নয় কিন্তু পুরো কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। কারণ তাদের মধ্যে স্থিরবিশ্বাস থাকে যে তাদের যাই কেন হোক, সে তাদের ভালোর জন্যই।"

তাহ'লে নীরব অনাগ্রহ সমর্পণ ও সকৃতজ্ঞ সমর্পণে কি পার্থক্য?

উত্তর আগ্রহশূন্য সমর্পণ ও সকৃতজ্ঞ সমর্পণ?...তুমি যখন কিছু আদেশ পাও তখন নিজেকে সমর্পিত জ্ঞানে কোনো আগ্রহ না রেখেও তা পালন করতে পারো, তাতে কোনো আনন্দ বা পরিতৃপ্তি না থাকলেও শুষ্কভাবে কেবল এইটুকু ভাবো যে "আদেশ পেয়েছি তাই এটা করছি।" তার মানে তুমি তার কোনো তাৎপর্য বুঝতে না পারাতে তোমার উদ্দিষ্টানুগামী হবার ইচ্ছায় কোনো আঠা রইলনা। এই অনাগ্রহ সমর্পণ। তুমি তখন কেবল সেই অদৃষ্টকে নির্বিবাদে মেনে নিলে, যেহেতু তুমি দৃঢ়সংকল্প ক'রে রেখেছ যে যাই আসুক তার প্রতিবাদ করবেনা, কেবল এইটুকুই হলো। অপরপক্ষে কৃতজ্ঞ সমর্পণে তুমি সেই নির্দেশের যথার্থ মর্ম ও মূল্য বুঝবে, তাই সাগ্রহে তা পালন করতে থাকবে, জানবে যে তাতে আরো ভগবৎ সান্নিধ্যে তোমাকে নিয়ে যাবে আর তোমার তাতে সার্থকতা ঘটবে, তাই জেনে তুমি তখন সানন্দে ও সহযোগিতার সঙ্গে সে কাজ করবে। এতে দুই-এর মধ্যে যথেষ্টই পার্থক্য হলো।

প্রশ্ন : অনাগ্রহ সমর্পণে কি কোনো আনন্দ থাকেনা?

উত্তর সাধারণত এর মধ্যে একটা গর্বের ভাব এসে পড়ে; গর্বের মোহে সে ভাবে যে আমি একটা বিশেষ কিছু করছি। কোনো কিছু জানতে বুঝতে চেষ্টা না ক'রে

বিনা আগ্রহে কাজটা করতে থাকে, তার ভালোমন্দ কিছু না ভেবে নিজেকেই বড়ো করে দেখে, আর গর্বে ফুলে উঠতে থাকে। এখানে তেমন মানুষ আছেও।

প্রশ্ন : তাহলে সে তো প্রকৃত সমর্পণ হলোনা, তাই নয় কি?

উত্তর : আমি বলব অন্য রকমটাই ভালো। ওতে অন্তত বোঝা যায় যে কেন এটা করছি; সুতরাং তাতে আনন্দ মেলে; অপরপক্ষে এমন অনাগ্রহ সমর্পণে বাধা নিচু হয়, মনে হয় যেন কোনো ভয়রদন্তের হুকুম পালন করছি, তার শক্তির চাপে পড়ে।

প্রশ্ন : মা, দেবতার মন্দিরে যে পশুবলি দেয়, তাতে কি নিষ্ঠুরতা হয়না?

উত্তর : সেটা নিষ্ঠুরতার চেয়ে বরং অজ্ঞানতা ও অচেতনার কাজ। তারা যে নিষ্ঠুর মন নিয়ে তা করে এমন নয়—অবশ্য ব্যতিক্রম ছাড়া—কিন্তু জীবহত্যা ক'রে যে তাতে সুখ পায় তা নয়, ওরা দেবতাকে ভয় করে ভাবে যে বলি দিলে বুঝি দেবতা খুব খুশি হবে।

এখানেই কাছাকাছি স্থানে সমুদ্রতীরে আছে ভেলেদের একটি মন্দির "ভিরান পট্টনম্" আরিয়াঁকুপ্পম্ পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে সমুদ্রের অভিমুখে গেলে দেখবে যে পথের প্রান্তে সেই মন্দির। তার ভিতরকার দেবতা অদ্ভুত রকমের, অনেকটা কালীঠাকুরের মতো। এই ঠাকুরটি সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য প্রবাদ আছে, আর ওখানকার রীতি হলো প্রতি বছর দেবতার কাছে অনেক মুরগি বলি দেওয়া। আমি একদিন সেখানে গিয়েছিলাম বোধহয় তাদের সেই উৎসবের পরের দিন, কারণ গিয়ে দেখলাম বলির উপর চতুর্দিকে বিস্তর মুরগির পালক ছড়ানো (এত মুরগি কারা খায়? সাধারণ লোকে না পুরোহিতরা? এত মুরগি অল্প কয়েকজনে খেতে পারেনা, সুতরাং যারা মারে তারাও খায়)। আর সেখানকার আবহাওয়া দেখলাম একটা অজ্ঞান আতংকে ও অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ এবং কেবল তাই নয়, ওখানকার মানুষদের একটা প্রমত্ত মাংসলোলুপতা। আর সেই কালী ও যেন শত শত নিরীহ প্রাণীর প্রাণশক্তি আত্মসাৎ করে খুশি। প্রত্যেকটি মুরগির গলা কাটা হয়েছে আর তার প্রাণশক্তি বেরিয়ে সেই কালীর ভক্ষ্য হয়েছে। একে মানুষের নিষ্ঠুরতা বলব কিনা জানিনা, কিন্তু এর মধ্যে আছে খাবার লালসা, সেইজন্য বেচারা মুরগিগুলির অচেতন প্রাণশক্তির বলি, কারণ প্রাণশক্তি তাদের আছে কিন্তু চেতনা বিশেষ নেই। তাই নিষ্ঠুরতা না হলেও স্থানীয় পরিস্থিতি নিম্নপ্রকৃতির অচেতনা ও বেদনাতে ভারী হয়ে উঠেছিল, যদিও তাকে নিষ্ঠুরতার কাজ বলা যায়না। যদি ওরা নিজেদের পোষা ছাগল বা ভেড়া বলি দিতে যেতো তাহলে হয়তো তাতে দুঃখ বোধ করতো। কিন্তু এটা যা করেছে তা কেবল ভয়ে ও অচেতনাতে। ওঃ ধর্মের মধ্যে ভয়ের এতই বেশি প্রাধান্য! "আমি যদি এটা বা সেটা না করি, যদি ডজন খানেক মুরগি বলি না দিতে পারি, তাহলে হয়তো বছরের মধ্যেই আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, কিংবা হয়তো সারাজীবনই ভুগতে হবে। ছেলেপুলেরা ভুগতে থাকবে নানা রোগে, হয়তো চাকরি যাবে, উপার্জন বন্ধ হবে, কতই না দুর্গতি হবে...। অতএব এক ডজন মুরগি বলি দিয়ে রাখি।" এটা জীবহিংসা ঠিক নয়, এ হলো চেতনাহীনতা।

প্রশ্ন : আপনি সেখানে যাওয়াতে সেই কালী কি করলে?

উত্তর : সে গল্প জানোনা তো? ...জায়গাটা আমি চিনতাম না, কিন্তু আরিয়া-কুপ্‌পম্‌ ও মন্দিরের মাঝামাঝি যে রাস্তা আছে সেখানে আমি গাড়িতে বসেছিলাম, তখন ও কালীর কথাও জানিনা, আর মুরগিবলির কথাও না, এমন সময় দেখলাম একজন কালো মেয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো, আমার কাছে এসে অনুনয় ক'রে বললে, "তুমি যদি আমাকে স্বীকার করে আমার সহায় হও, তাহলে বহু মানুষ এখানে এলে তখন এই স্থান খুব জমজমাট হয়ে উঠবে।" সেই মেয়ের চেহারা অতি অদ্ভুত, রোগা ও শীর্ণ, ম্লান অপুষ্ট মূর্তি, মাথার চুল অগোছালো। পরে শুনলাম তার নাকি খুব দুর্গতি হয়েছিল, মাথা কেটে দিয়েছিল বা ঐরকম একটা কিছু। (অমৃতর দিকে ফিরে) অমৃত, তুমি এই ভিরানপট্টনমের কালীর গল্পটা শুনেছ? কে একজন বললে তার নৃভোগের কথা। আমি কিন্তু সেই কালীকে বলেছিলাম শান্ত ভাব নিয়ে থাকতে, আর যদি সে আন্তরিকভাবে আস্পৃহা করে তাহলে নিশ্চয় তেমন উপযুক্ত সাড়া পাবে। এর পরের দিন আমি সেই মন্দিরে গেলাম আর দেখলাম যে ভিতরকার উনিই আমার কাছে গিয়েছিলেন। তারপর আমরা সমুদ্রতীরে ঝাউতলায় ঘুরতে ঘুরতে সেইসব মুরগির ছড়ানো পালক ও রক্তের দাগ দেখলাম, আর উনুনের আগুনের ছাই রয়েছে লক্ষ্য করলাম (সেই আগুনে তারা মুরগি রান্না করেছিল)। ঐ কালীর সম্বন্ধে জানতে চেয়ে শুনলাম যে ওর আগেকার দিনের উৎসবে ওখানে বহু মুরগি কাটা হয়েছিল।

এই হলো মোট কথা। মুরগি মারাতে যে সেই কালী খুব আনন্দ পেয়েছে তা হয়তো নয়, তবে সে তার থেকে অনেকটা প্রাণশক্তি পেয়েছিল। কিন্তু বহু মানুষ যে সেখানে আসে এতে সে নিশ্চয় খুশি, যত বেশি মানুষ আসে ও মুরগি বলি হয় ততই তার গৌরব বাড়ে! সেইজন্যই সে বুদ্ধি ঠিক ক'রে আমার সাহায্য চাইতে এসেছিল, কারণ আমার প্রাণশক্তি তাকে সাহায্য করলে সেখানে আরো বেশি মানুষের ভিড় জমবে, এবং আরো বেশি মুরগি! তাতেই হবে তার সার্থকতা। আমি তাকে বললাম, তুমি শান্তভাবে থাকো।

প্রশ্ন : মা, সে কালী কোন স্তরের অন্তর্গত?

উত্তর : নিতান্ত স্থূল প্রাণস্তরের।

প্রশ্ন : তাকে কালী কেন বলা হয়?

উত্তর : তা জানিনা। সে এক রকমের কালী—বলতে পারি না ছিন্নমস্তা কিনা কিংবা বালিতে গলা পর্যন্ত পোঁতা ছিল কিনা, বা ঐ ধরনের কিছু। শোনা যায় যে গলা পর্যন্ত পোঁতাই ছিল, মাথাটা কেবল উপরে উঠেছে। এমন কাহিনী সর্বত্রই শুনবে, আমার সে সব স্মরণ নেই। এমন কালী অসংখ্য রকম আছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ভাবে যে তার কালীটির সঙ্গে তার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই রকম অনেক পারিবারিক কালীও আছে; কোনো কোনো পরিবারের কালী অতি ভয়ংকর। সে কালীর ইচ্ছা না মানলে পরিবারের মধ্যে সমূহ বিপদ ঘটবে (হয়তো তার জন্য কালীর চেয়ে তারাই বেশি দায়ী)। আমি একজনদের কথা জানি, তাদের মধ্যে যখন মারাত্মক জিনিস (মৃত্যু) ঘটল তখন তারা সেই কালীর মূর্তিকে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : এই কালীর সঙ্গে স্বয়ং মহাকালীর কোনো সম্পর্ক আছে কি ?

উত্তর : না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনের সঙ্গেই ওর সম্পর্ক, সম্ভবত ওরা মানুষেরই মন থেকে গড়া। কিন্তু আমি জানি, যথার্থ সত্তাও আছে, যথার্থ গণপতি আছেন (হাতিশুঁড়যুক্ত মুখ হলেও তা মানুষের গড়া নয়), আমি দেখেছি ইনি আছেন। তেমনি কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালিকা লোলজিহ্বা কালীও আছে, আমি দেখেছি তাকে বিস্ফারিত লোচনে। সে মানুষের গড়া নয়, প্রকৃত সত্তা। মানুষের মনের চিন্তা হয়তো কিছু তার সঙ্গে যোগ করেছে, কিন্তু তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

প্রশ্ন : সেই কৃষ্ণবর্ণা কালী কোন রকম কাজ করেন ?

উত্তর : তা ভালো কাজ নয়! ধ্বংসের কাজ করতে তিনি ভালোবাসেন।

একবার—তখন ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল, আমি এখানেই ছিলাম ডুপ্লে ষ্ট্রীটে—"ডুপ্লে হাউসে"। আর শ্রীঅরবিন্দের ছিল দুখানি ঘর আর একটু চাদ। ডুপ্লে হাউসের ছাদ থেকে তাঁর ঘরের চাদ দেখা যেতো (এখন দেখা যায় কিনা জানিনা, মাঝখানে অনেক বাড়ি উঠে গেছে)। আমি সেই ছাদে শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দিকে মুখ ক'রে প্রত্যহ প্রাতে ধ্যানে বসতাম। সেদিন এমনি আমার ঘরে বসে শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দিকে জানলা দিয়ে চেয়েছিলাম, চোখ খোলাই ছিল। তখন দেখি আমার ঘরে ঐ কালী এসে ঢুকেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কি চাই ?" সে তাণ্ডবভাবে নেচে নেচে বললে, "এবার প্যারিসের পতন, প্যারিস এবার ধ্বংস হবে।" যুদ্ধের তখন আরম্ভ মাত্র, আমরা কোনো খবর পেতাম না। আমি সেই ধ্যানের মধ্যেই তার দিকে মুখ ফিরিয়ে শান্তভাবে কিন্তু জোর গলাতে বললাম—"না, প্যারিসের পতন নয়, প্যারিস রক্ষা পাবে।" সে মুখ কাঁচুমাচু করে চলে গেল। পরের দিন টেলিগ্রামে "ডেস্প্যাচ" থেকে জানলাম (গভর্ণমেন্ট হাউসের দেয়ালে তা টাঙানো থাকতো), যে জার্মানরা প্যারিসের দিকে এগোচ্ছিল, কোনো বাধা না পেয়ে, কারণ রাস্তা অবারিত ভাবে খোলা ছিল। বাধা দিতে কেউ নেই দেখে তারা ভাবলে যে বিপক্ষদল হয়তো ফাঁদ পেতে কোথাও লুকিয়ে আছে। সুতরাং তারা আর না এগিয়ে ফিরে যেতে শুরু করলে (হাস্য)। তখন ফরাসীরা এগিয়ে এসে তাদের তাড়া করে ও যুদ্ধ বাধে, তারপর তা থেমে যায়। ব্যাপারটা এই রকম হল, আমি যখন কালীকে "না" বললাম, তখনই ওরা ভয় পেয়ে ফিরেছে, নতুবা আরো এগোলে অন্য জিনিস হতো।

প্রশ্ন : মা, তাহলে মহাকালী কেমন ?

উত্তর : সে কথা তোমরা বাছারা যখন নিজেরা দেখবে তখন তোমরাই আমাকে বলবে। তবে তিনি ঐ কালীর মতো নন। তিনি কৃষ্ণবর্ণাও নন, আর লোলজিহ্বাও নন, আর তাঁর গলাতে মুণ্ডমালাও নেই।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন ("Education" থেকে) "সাধুদের যে পেরেকশয্যা ও খ্রীস্টান তাপসদের চাবুক ও অনুতাপবস্ত্র ধারণ, এগুলি হলো অল্পবিস্তর বর্ষকাম-এর

(sadism) লক্ষণ, যা অপ্রকাশ্য বা অস্বীকার্য ; এগুলি আসে অসুস্থ রকমের অবচেতনের আত্মনিগ্রহের প্রয়োজনবোধ থেকে।"

উত্তর : ওঃ ! তোমরা জানো যে এমন সব সাধু আছে যারা পেরেক তোলা শয্যাতে ইচ্ছা ক'রে শুয়ে থাকে, সে রকম দেখনি কি কখনো ? আমি ফটোতে কিছু দেখেছি তারা খাড়া করা পেরেকের উপরে শুয়ে ঘুমোয়। সম্প্রতি একটি দেখলাম। জানিনা ওতে সাধুত্বের কিছু প্রমাণ হয় কিনা। সাধারণের সামনে এমন করতে দেখলে অভিনয়ের কাজ বলে সন্দেহ হয়। তবে লোক দেখাবার জন্য ছাড়া সত্যিকারের আন্তরিকভাবেও কেউ কেউ এমন করে। জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে আত্মাকে মুক্ত করতে হলে দেহের নিগ্রহ দরকার। কিন্তু আমি বলব যে তাদের প্রাণসত্তাই চায় দেহের নিগ্রহ, কারণ ওর দ্বারা এক-রকম বিকারজনিত সুখ নেলে। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আছে যারা নিজেকে খুব জোরে আঘাত ক'রে সুখ পায় (বড়োদের মধ্যেও তা আছে)। এ কথা অনেকেই জানে। আমি তাই তোমাদের নৈতিক দিক থেকে বলি—"তোমরা নিজেদের দুঃখ নিজেরাই দাও এবং নিজেরাই তা চাও, নতুবা অমন কষ্ট পেতে হতো না।" এ ধরনের জিনিস বিলক্ষণ অস্বাস্থ্যকর, তা আসে তীব্র রকমের বিচিত্র সংবেদনবোধের প্রয়োজন থেকে, ওতে স্বাভা-বিক সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের হানি হয়।

তোমরা হয়তো জানোনা, চীনদেশে এমনি সব অভাবনীয় রকমের আত্মনিগ্রহ ক্রিয়া প্রচলিত আছে। একজন চীনাভক্ত জাপানীকে (এমন মানুষ বিরল) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এর কারণ কি। সে বললে, "দূর প্রাচ্যের মানুষরা, এমন কি জাপানীও, তাদের স্পর্শ-চেতনা সম্পর্কে খুব অসাড়। কড়া রকমের কিছু যন্ত্রণা না পেলে তাদের বোধশক্তি সজাগ হয় না। তাই তারা বুদ্ধি খাটিয়ে এই সব যন্ত্রণা পাবার ফন্দি বের করেছে।" সেই সব লোকরা যতই বেশি অসাড় ততই বেশি অচেতন ও তামসিক, কড়া রকমের যন্ত্রণার দাওয়াই দিয়ে তাদের স্পর্শকাতরতা আনাতে হয়। এতেই লোককে নিষ্ঠুর করে, কারণ সেখানে নিষ্ঠুরতাই হলো উপযুক্ত দাওয়াই। কারো উপর নিষ্ঠুরতা করলে তখন তার মধ্যে একটা স্পর্শকাতরতা জাগে, নতুবা কোনো অনুভূতি আসে না। তাই ওদের সমস্ত জাতটাই হয়েছে নিষ্ঠুর। মনের দিকে অচেতন না হলেও প্রাণের বা দেহের দিক দিয়ে তাই হয়, বিশেষতঃ দেহেরই দিক দিয়ে।

প্রশ্ন : যাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে তারা কি নিষ্ঠুর হতে পারে ?

উত্তর : ওটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। সৌন্দর্যবোধ সত্তার কোন অংশে তাই দেখতে হবে। দৈহিক বা প্রাণগত বা মানসিক ধরনের বিভিন্ন সৌন্দর্যবোধ থাকতে পারে। কিন্তু যদি নৈতিক সৌন্দর্যবোধ থাকে তাহলে কখনই সে নিষ্ঠুর হবে না। সে সর্বদাই হবে উদার ও মহানুভব। কিন্তু মানুষ তো নানা অংশ নিয়ে তৈরি...আমি ভাবছিলাম আর্টিস্টদের কথা (গত শতাব্দীর ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকের সকল আর্টিস্টকেই আমি জানতাম, সৌন্দর্যবোধ তাদের যথেষ্টই ছিল)—কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে নৈতিক দিক দিয়ে নিষ্ঠুর ছিল। যখন আপন সৃষ্টিকার্য নিয়ে থাকতো তখন খুবই সৌন্দর্যভাবপূর্ণ,

কিন্তু আপন বাড়ির মধ্যে গেলেই সে ভাব ঘুচে যেতো, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যেতো বা কেউ কেউ অশালীন আচরণ ও দুর্ব্যবহারও করতো, এ কথা আমি নিজেই জানি। কিন্তু ভিতরে বাহিরে যারা প্রকৃত রকম আর্টিষ্ট তারা খুবই ভালো ও উদারচরিত্র ছিল।

আমার স্মরণ আছে, রোডিন আমাকে বলেছিল একটি মজার কথা। রোডিনকে তোমরা চেনো তো (তাকেই নয় কিন্তু তার সৃষ্টিকার্যকে)? সেই রোডিন একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করলে "দুজন স্ত্রীলোক যদি পরস্পরকে হিংসা করে, তা কেমন ক'রে বন্ধ করা যায়?" (হাস্য) আমি বললাম, "সমস্যা বটে, কিন্তু ও কথা কেন?" তখন সে বললে —"ব্যাপার হয়েছে এই যে আমি তো মূর্তি গড়ি প্রথমে কাদার তাল দিয়ে, পরে তাকে পাথরে বা ব্রোঞ্জে রূপান্তর করি। এখন প্রায়ই আমি কাদার তালে মূর্তি গড়ে রেখে দুই একদিনের মতো বাইরে চলে যাই। মূর্তিটি তখন ভিজে কাপড় দিয়ে জড়ানো থাকে, কারণ শুকিয়ে গেলেই তা ফেটেচটে নষ্ট হতে পারে।" ভাস্কর মাত্রই এটা জানে। এখন, বাড়িতে ছিল তার স্ত্রী, এবং আরো ছিল তার এক মেয়ে মডেল, অন্তরঙ্গভাবেই সেও যাওয়া-আসা করত। রোডিন অন্যত্র গেলে তার স্ত্রী আপন অধিকার বজায় রাখতে প্রতি সকালে ষ্টুডিওতে ঢুকে সেই সব মূর্তির কাপড়ের উপর জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে যেতো। কিন্তু আবার দুই তিন ঘন্টা পরে আসতো সেই মডেল মেয়েটি, তার কাছে ষ্টুডিওর চাবি থাকতো, সেও সেখানে ঢুকে আবার তার উপরে জল ঢেলে দিতো। সে যদিও জানতো যে ওগুলি ভিজেই রয়েছে, তথাপি সে ভাবতো তার যা কর্তব্য তা সে করবেই। রোডিন আমাকে বললে,—"ওর ফলে এই হতো যে আমি ফিরে এসে দেখতাম, কাদার তাল এতই ভেজানো হয়েছে যে গলে গিয়ে জলজবে কাদা হয়ে গেছে, মূর্তি বলে আর কিছু নেই।" বেচারা তখন বৃদ্ধ, কিন্তু মানুষটা ছিল সুন্দর। তার মাথাটা ছিল গ্রীক মৃগশিশুর মতো, বেঁটে খাটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, চোখের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। একটু আমুদে স্বভাব তার ছিল, ঐ কথা বলে সে হাসতো, কিন্তু সে চাইত যে মূর্তিগুলো নষ্ট না হয়।

প্রশ্ন : আপনি তার কথা শুনে কি বললেন? (হাস্য)

উত্তর : এখন ঠিক মনে নেই। (হাস্য) তবে আমি ঠাট্টা করে এটুকু বললাম— "তা ওদের মধ্যে কেবল একজনের উপরই জল ছিটানোর ভার দিলনা কেন?" সে তার মাথার ছোট ছোট চুলে টান দিতে দিতে বললে—"তাহলে খুনোখুনি হয়ে যাবে।" (হাস্য)

ব্যস্, গুড্ নাইট্।

২৪ মার্চ, ১৯৫৪

প্রশ্ন : কিছু বেশি খাদ্য খেলে রাত্রে স্বপ্নে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যায়, কেন তা হয়?

উত্তর : তার কারণ পেটের অবস্থার সঙ্গে স্বপ্নদেখার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষ্য ক'রে জানা গেছে যে খাওয়া যেমন যেমন হয় সেই অনুসারে স্বপ্নও বিভিন্নরকম হয়, আর হজমের বিঘ্ন হলে প্রায়ই অস্বস্তিকর ভয়ের স্বপ্ন আসে, যেমন বাঘ বেড়াল প্রভৃতি দেখে... কিংবা এমনও অবস্থা ঘটল...যেন কোনো মহাবিপদ আসন্ন, তুমি শীঘ্র কাপড়জামা প'রে

বেরোতে চাইছ কিন্তু তখন কোথাও কিছু খুঁজে পাচ্ছনা, জুতোর মধ্যে পা কিছুতেই ঢুকছেনা, তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে চাও কিন্তু পা নড়ছেনা, অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এমনি ধরনের কত স্বপ্ন হয় মদ্যপের দোষে।

প্রশ্ন : মা, তামাক ও মদে স্মৃতিশক্তি ও ইচ্ছার জোর নষ্ট করে কেন?

উত্তর : কেন করে? কারণ তাইই হতে দেখা যায়, ওর কোনো নৈতিক ব্যাখ্যা নেই। সুরা অর্থাৎ এলকোহল জাতীয় জিনিসের মধ্যে বিষ থাকে, আর তামাকের মধ্যেও তাই, যা দেহকোষগুলির ক্ষতি করে। এলকোহলের বিষ মস্তিষ্কের কোনো অংশে সঞ্চিত হয়ে ক্রিয়া করে, কিছুকাল পরে তাতে সেই কোষগুলি বিকল হয়ে যায়—কেউ কেউ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হয়, যাকে বলে ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স,—যা হয় অধিক মদ্যপান করলে, তার বিষ-ক্রিয়াতে। ফ্রান্সের একটা প্রদেশে খুব হাল্কা রকমের একরকম মদ তৈরি হয় (যা সম্ভবত শতকরা চার পাঁচ ভাগ মাত্রের বেশি নয়), সেখানকার মানুষরা জলের বদলে তাই খায়। তাদের অনেকের মধ্যে কিছুকাল বাদে মস্তিষ্করোগ হয়। আমি জানতাম তাদের, মস্তিষ্ক তাদের ভালোরকম কাজ করতনা। আর তামাকের বিষ হলো নিকোটিন, তাও যথেষ্ট মারাত্মক, দেহকোষগুলিকে নষ্ট করে। গোড়ায় গোড়ায় কিছুকাল পর্যন্ত তা হয়না, কিন্তু প্রথম ব্যবহারে খুব অস্বস্তি হয়, তাতেই বোঝা যায় যে তা কত ক্ষতিকর জিনিস, অভ্যাস করাই উচিত নয়। কিন্তু নির্বোধ মানুষ ভাবে যে ওটা নিজেদের অনভ্যাস হেতু একটা দুর্বলতা মাত্র, অভ্যাস হলে ওটা থাকবেনা, তাই খেতে খেতে অভ্যাস ক'রে ফেলে, তখন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াশক্তি চলে যায়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট হতে থাকে।

দেহের দিক থেকে যেমন, নৈতিক দিক থেকেও তেমনি। যদি এমন হয় যে কোনো অনুচিত কাজ করতে তুমি যাচ্ছ এবং চৈত্যসত্তা ভিতর থেকে মৃদুস্বরে তোমাকে নিষেধ করছে, কিন্তু তুমি তার কথা মানলেনা, তাহলে কিছুকাল পরে সে আর তোমাকে নিষেধই করবেনা। সুতরাং তুমি তার কথা না শোনাতে পরে আর কোনোরকম প্রতিক্রিয়াও জাগবেনা। এতে তুমি মন্দের থেকে আরো বেশি মন্দের দিকে গড়িয়ে যাবে। তামাকের সম্বন্ধে সেইরকম কথা। প্রথমবারে ওতে দেহ তীব্র আপত্তি জানাবে, হয়তো তুমি বমিও করে ফেলবে, দেহ তখন বলবে যে এ জিনিস আমি চাইনা। কিন্তু তুমি যদি তোমার মন প্রাণের নির্বোধিতায় দেহকে তাই নিতে বাধ্য করো, তাহলে ক্রমশ তার প্রতিক্রিয়া যেতে যাবে—আর তখন শুরু হবে বিষক্রিয়া, ফলে স্নায়ুবিকার আসবে, থেমে যাবার ইচ্ছাশক্তি হারাবে, শেষ পর্যন্ত হয়তো অতিরিক্ত স্নায়ুদৌর্বল্যে তুমি কাঁপতে থাকবে। তেমন প্রায়ই দেখা যায়। যারা অতিরিক্ত মদ্যপান বা ধূমপান করে তাদের হাত কাঁপে সময়। একটা কিছু তুলতে হাত কাঁপে (ভঙ্গী)। এই সব কুফল হয় ওতে।

প্রশ্ন : মা, কারো কারো দেহ বাইরে থেকে বেশ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, অথচ দেখা যায় যে তারা খুব নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। এর কারণ...

উত্তর : সাধারণত যাদের ভিতরকার প্রাণসত্তা দুর্বল তাদের ঐরকম হয়, হয়তো তাদের দেহের স্নায়ুবিভাগও দুর্বল ; হয়তো জন্মের থেকেই তারা এমন। আবার মানসিক দুর্বলতা থেকেও এমন হতে পারে, কারণ সুস্থ সবল শরীরে যদিও স্নায়ুগুলি সুস্থ থাকে, তথাপি মনের চিন্তাধারাও সুস্থ হওয়া চাই, নতুবা অসুস্থরকম চিন্তার ফলে সবল নার্ভও দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, কেউ যদি অশুচি রকমের অন্যায় কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে থাকে, অশুচি অশ্লীল রকমের বইটই পড়ে, ও সেইরকমের কথাবার্তা পছন্দ করে (তেমন জিনিস যথেষ্টই আছে), তাহলে তারা, নিজেদের স্নায়ুগুলির উপর সংযম ও কর্তৃত্ব হারায়, তাই দেহ বলিষ্ঠ ও সুপুষ্ট থাকলেও তারা নার্ভাস প্রকৃতির হয়ে পড়ে। খারাপ ধরনের কথা বলা ও বই পড়া—এর চেয়ে অনিষ্টকর জিনিস আর কিছু নেই, আর তুমি যখন সাধনার পথে প্রয়াস করছ তখন দেখতে পাবে যে সামান্য কিছু অনুচিত কথা বললেই অমনি নিজের ভিতরে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করতে থাকবে, যেন মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে পড়ছে, ভিতরে এমন বিক্ষোভ হচ্ছে যাতে যন্ত্রণা দিচ্ছে, বুক চিব্‌চিব্ করছে ও তুমি একটা শূন্যতা বোধ করছ, যেন কিছু বিকট রকমের বিস্বাদ তিক্ত জিনিস খেয়ে ফেলেছ—এতরকম কাণ্ড হতে থাকবে সামান্য একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলবার ফলে। আর তেমন অস্বস্তি শুরু হলেই জানবে, ভিতর বলছে "ব্যস এবার থেমে যাও"। কিন্তু অচেতন মানুষরা এ সব কিছুই লক্ষ্য করেনা, ইচ্ছার উত্তেজনাতে অনুচিত কাজগুলো করতে থাকে, কাজেই তার ঐরূপ হুকুমে চলে স্নায়ুসকল সমুচিত প্রতিক্রিয়াশক্তি হারিয়ে বিকারপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : মা, আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারিনি ("Education" থেকে)—"উন্নতির পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম অবশ্য প্রয়োজন। বিশেষ যারা অতিমানস বিকাশের জন্য প্রস্তুত হতে চায় তাদের পক্ষে জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাম ভাবকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা চাই ; জোর করে দমনের দ্বারা নয় কিন্তু ভিতরকার রাসায়নিক ক্রিয়াতে, যাতে ওজঃশক্তি প্রজনন-ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে সর্বৈব রূপান্তরক্রিয়ার দিকে প্রযুক্ত হয়।"

উত্তর : ভারতে এটা সর্বজ্ঞাত নিয়ম যে সাধনার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়নিরোধের দ্বারা বৃষ্ণচর্য অবলম্বন করতে হয়। তোমরা নিশ্চয় জানো যে দেহের মধ্যে পাঁচটি 'কেন্দ্রস্থল' আছে যেখানে শক্তি সংযত হয়ে থাকে। তবে বস্তুতপক্ষে সাতটি বা এমন কি বারোটি কেন্দ্র রয়েছে। সেই কেন্দ্রগুলি থেকে শক্তি সকল ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। তেমনি দেহের যৌনকেন্দ্রেও আছে প্রভূতশক্তি, এবং যারা তাকে সংযত করতে পারে তারা সেই শক্তিকে চালিত করে এইখানে (বুকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন)। এখানে রয়েছে উন্নতির ও অগ্র-গতির কেন্দ্র। একে বলা হয় "অগ্নি"র স্থান, কিন্তু এগিয়ে চলবার ইচ্ছাশক্তি এইখানেই

জাগে। যৌনকেন্দ্রের শক্তি এসে এইখানে বিলিত হয়। তখন যৌনের কাজ স্তব্ধ হয়ে এখানকার ক্রিয়াই বেড়ে ওঠে।

সাধারণত ওর জন্য সমুচিত উপায় হলো মেরুদণ্ডের নিচেকার কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে তার শক্তিকে উপরকার বিভিন্ন কেন্দ্রে উঠিয়ে সেগুলিকে জাগিয়ে এবং খুলে দিয়ে তাদের শক্তিকে মাথার উপর নিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে আরো উপরে পাঠিয়ে দেওয়া, এই হলো প্রথম ক্রিয়া, এটি করতে পারলে তখন কুণ্ডলিনী-শক্তিকে সকল কেন্দ্রে সক্রিয় করা যাবে ও সকল কাজের উপর কর্তৃত্ব আসবে। তখন যেখানে যে শক্তির ব্যবহার প্রয়োজন সেখানে তাকে ইচ্ছানত প্রয়োগ করা যাবে ও যথাযোগ্য উন্নতির দ্বারা রূপান্তর ঘটবে। তবে এর জন্য বহু ধৈর্যসহকারে সজ্ঞানে দীর্ঘ সাধনা ও অভ্যাসের দরকার। অন্যান্য রূপ চিন্তা বজায় রেখে বা খেলার মতো ভাব নিয়ে থেকে কেবল "করবো বললেই" করা যায় না। এ হলো রীতিমত তপস্যার কাজ। করতে পারলে খুবই ভালো। কিন্তু কেবল সাময়িক সংকল্প মাত্রেই তা করা যায়না।

প্রশ্ন : আপনি একবার বলেছিলেন যে মানবীয় প্রেম জিনিষটা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষেরই দ্বারা বিকৃত ও কলুষিত। কিন্তু তার আগে সে প্রেম কেমন ছিল?

উত্তর কোন প্রেম?

প্রশ্ন : মানুষের প্রেম।

উত্তর মানুষের প্রেম? আমি আগে সে কথা বলিনি? প্রেম তো প্রেমই। কিন্তু তা যখন মানবীয় স্তরের হয় তার কথাই আমি বলেছিলাম। আসল যে প্রেম সে হলো ভগবানের দিব্যপ্রেম। মানষের স্তরের মধ্যে তা যখন আসে তখন তা হয়ে দাঁড়ায় বিকৃত ও কলুষিত। শুধু ভগবৎ প্রেমই দিব্য ও বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন আত্মোন্নতির জন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি কেমন ভাবে কাজে লাগতে পারে?

উত্তর : ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে আত্মোন্নতি? তাই এখন ফ্যাশন হয়েছে।

তাই এমন দেখা যায় যে স্কুলগুলিতে ছেলেদের শেখানো হচ্ছে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি যাতে বাড়ে, তৎক্ষণাৎ একটা মীমাংসাতে যাতে তারা আসতে পারে, চোখে দেখবামাত্র বুঝে নিতে পারে, ইত্যাদি। যে রকমের খেলাধুলা শেখানো হয় সেগুলির মধ্যে এই সব জিনিষ থাকে। তেমনিভাবে শ্রবণশক্তিকে, আঘ্রানশক্তিকে, দৃষ্টিশক্তিকেও বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু তার বদলে যদি কেবল সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্য নিয়ে বলো, "এটা ভালো আর ওটা খারাপ," কিংবা "এটা পছন্দ আর ওটা অপছন্দ," অন্য সবই বাজে, অপর জিনিসগুলো কিছু কাজের নয়—এই ভাবে হিসাব করা আর মেপে দেখা আর তুলনা ও অনুধাবন করার কাজ চালাতে থাকো...সাধারণ অজ্ঞান ও অন্ধ লোকেরা ঐরকম ভাবে তাদের ইন্দ্রিয়াদি ও প্রবৃত্তির প্রভাবে তারই প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী বলে যে এটা উত্তম, ওটা

অবশ্য, তার কি মানে হয়? তার কিবা দাম আছে? কিছুই না। রীতিমত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব কিছুকে দেখতে, মাপতে, তুলনা ও বিচার করতে হবে যে কোনরকম শ্বসনক্রিয়ার কতখানি মূল্য, কিরূপ তার পারস্পরিক সম্বন্ধ, তখন মস্তিষ্কের এলাকা থেকে তাকে এনে ফেলবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এলাকাতে। তবেই পারবে সেই অনুভূতিকে আপন সমুচিত অধিকারে আনতে, যাতে অবাঞ্ছিত জিনিসকে ঠিকই ছেঁটে ফেলতে পার। এর জন্য নানারূপ সাধনা আছে। তার মধ্যে কোনোটা বা সারাজীবনই করে যেতে হয়, নিয়মিত-ভাবে করলে তার একটা মুহূর্তও বৃথা হয়না। তখন প্রবৃত্তির ক্রিয়ারও অবসর থাকেনা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাই করতে থাকলে আর তুমি সোলার টুকরোর মতো স্রোতের মুখে এদিক ওদিক ক'রে ভেসে বেড়াবে না! তখন প্রকৃতির খেয়ালখুশি মতো (প্রকৃতি মানুষকে নিয়ে যে কত খেলাই খেলে লোকে যে তাতে বিদ্রোহ করেনা এই আশ্চর্য!) তারই ঢেউ অনুযায়ী ভেড়ার পালের মতো যত কিছু কামনার দাস হতে হয়না; কখনো হয়তো রাগ জিনিসটা এসে "হানা" দিলে আর তুমি অমনি রেগে আগুন হলে। যখন যেমন ঢেউ আসে, মানুষ তারই প্রভাবে চলে। আবার সেটা এক থেকে অন্যের মধ্যেও সংক্রামিত হয়, কেন তা হচ্ছে তা সে জানেই না। যদি জিজ্ঞাসা করো, "কেন তুমি এমন হলে?" সে বলবে, "কেন জানিনা, এমনি হঠাৎ রাগ চড়ে গেল," কিংবা "হঠাৎ কামনাটা কেমন জেগে উঠল।" ওহ্! কী লজ্জার কথা!

গুড্ নাইট।*

—শ্রীমা

---

* অনুবাদক: পশুপতি ভট্টাচার্য

সরলতা

দিলীপকুমার রায়

"মায়ের বিধান নয় তো কালো—"
যে-ই মানে—পায় মায়ের আলো।
আমরা পরি ঠুলি চোখে,
তাই কাঁদি হায়, দুঃখে শোকে,
দেখি না—মা আছেন সাথে
ঝড়তুফানেও দিনে রাতে,
তাঁরি উষায় অপার কালো
বিলায়—জ্বলে পারের আলো।

ডাকলে মা-কে আকুল হ'য়ে
দেন দেখা মা বরাভয়ে,
এই সাধনায়, এই সাধনায়—
চোখের জলের আরাধনায়—
পথের কাঁটায় কাটে বাধা,
হয় বরণের সুরটি সাধা,
পোহায় করুণ নিশা কালো,
অরুণা মা-র ফোটে আলো।

আমরা তবু উঠি দুলি'
সোনার হরিণ দেখে, ভুলি—
"সরল প্রেমে সাধলে মা-কে
প্রাণগহনে মেলে তাঁকে,
অকূলপাথার নয় এ-জীবন,
চাইলে শরণ মেলে চরণ,
জ্বলে চিরি' মেঘের কালো
অচলা চপলার আলো।"

(সন্ধ্যা) ১৩,৫,৭৪

এই আমি

সুমিত্রা রায়

আর আমি তিরস্কারযোগ্য নই,
আমার এই নির্বোধ অহংকারের জন্য।
কেননা জেনে গেছি, তোমারই ইঙ্গিতে
আমার এই বিদূষকের ভূমিকা।
কোনো কোনো মুহূর্তে এখনো—
তোমার দৃঢ়মুষ্টিতে আমার কেশাকর্ষণ ক'রে
টেনে নিয়ে যাও অতলের তলে;
আমি ডুবে ডুবে ভেসে যাই আলো অন্ধকারে,
বন্ধ চোখে হাত পা কিছুই পাইনা খুঁজে;
জলস্রোত আমার শরীর ভেদ করে বয়ে যায়,
দূর থেকে পৃথিবীর স্পর্শ গন্ধ শব্দ জলে ঢেউ দেয়—
নুনের মতো আমি জলে মিলিয়ে যাই।
কখনো, কোনো বিরল মুহূর্তে—
কোনো শক্তিধর বাহু আমাকে তুলে নেয় নিচু হয়ে,
কোনো প্রচণ্ড বায়ুর প্রবল অনুপ্রবেশ
আমাকে বেলুনের মতো ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে দল মেলে ধরে,
এই পৃথিবীর সঙ্গে আমি এক হয়ে যাই প্রেমে।
আর অবাক হয়ে দেখি কত সহস্র দেবতা
আমার এক বিন্দু রক্ত এক ফালি চরিত্রকে বহন করে আছে।
আমার আমি তোমার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয় পুলকে
আর সুখের রসে মিছরির মতো তোমাতে মিলিয়ে যায়।

বিবস্বান

যতীন্দ্রনাথ দাস

নীলাদ্রির নীলনভ হতে, সনাতন অংশুমালী
তাঁর শাশ্বতের স্বর্ণরশ্মি, প্রদ্যোৎপ্রবাহে
দিল বিচ্ছুরিয়া।
নীলাম্বুধি বুকে অপরূপ নীলোৎপল
স্মিতহাস্যে সহসা খুলিল তাঁর যুগপদ্ম আঁখি :
সেই দিব্য বিভা তরঙ্গিত দিক্ হতে দিক্ চক্রবালে,
রমণীয় নৈঃশব্দ্যের সে মহান সঙ্কেত সরণী
বিথারিত, প্রপূরিত, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে
গেল ছড়াইয়া আনন্দের অনিল প্রবাহে
শ্বেতশুভ্র মীনদল বহ্নিবর্ণ বিহঙ্গ নিচয়,
অমরার দেববৃন্দ, বিপ্রদ্যুতি মানব-মণ্ডলী
প্রকাশের শব্দহীন ঐশী ইসারায়
করে জয়ধ্বনি।
অরূপের ছায়াম্লান রূপতরঙ্গিণী
প্লাবিল ধরণীতল আনন্দ-আসবে।
শতাব্দীর শেষ বিবস্বান সমুদিত
পরমার পরিপূর্ণ প্রেমের প্রভায়।

মাতৃবন্দনা

যতীন্দ্রনাথ দাস

ভাবনার ছায়াপথে, চিন্তার মধুমাস
কামনা জোনাকী দলে, দেহের প্রদীপখানি,
সৌর কলঙ্কিত মোর জ্যোতিঃ কক্ষপথে
আবর্তিত, কুহেলীর অদৃশ্য প্রভায়।
ভাব, ভাষা অর্থহীন নৈঃশব্দ্যের মৌন অন্তরালে,
অকস্মাৎ সেথানে ফুটিল কোন আকার বিহীন
নয়নের শ্বেতশতদল।
চিন্ময় প্রভায় তার অন্তরের আদিগন্ত
স্নিগ্ধ স্থির সমুজ্জ্বল।
স্বর্ণপ্রভ চেতনার আত্মপ্রসাদন,
জীবন-সায়রে প্রাচীন প্রলয়
নব সৃজনের সূচনা
উৎপলাসনে শিশুর চিত্তে বিশ্বমায়ের বন্দনা।

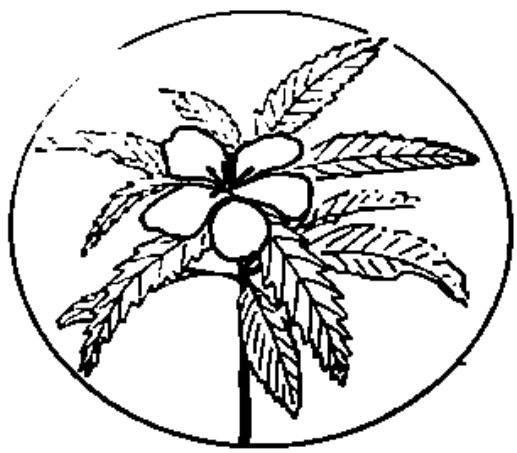

বৈদিক যজ্ঞ

গৌরী ধর্মপাল

বেদ এবং বৈদিকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর—এবং তা ন্যায্যও বটে—অভিযোগ যেটি আনা হয়, তা হল বৈদিক যজ্ঞকে নিয়ে। বৈদিক যজ্ঞের জটিলতা এবং বহুলতা, বিরক্তিকর অজস্র খুঁটিনাটি, ঋত্বিকদের দান-দক্ষিণার বহর, সর্বোপরি পশুহত্যা, চিন্তাশীল সহৃদয় মানুষকে এই যজ্ঞের প্রতি এবং সেইসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যে বেদ থেকে এই যজ্ঞের উদ্ভব তার প্রতিও—বিরূপ করেছে। এবং এ বিরূপতা আজকের নয়, হাজার হাজার বছরের। যজ্ঞের আদিম প্রখর সনাতন পূর্বা আরা সোমকে ভুলে, অমৃতকে ভুলে, যবে থেকে তার বাধ্য আলম্বনগুলিকে আঁকড়ে ধরেছেন যাজ্ঞিকেরা, তবে থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধনিয়ে উঠেছে। মানুষের বৈত্রেয়, বৈত্রেয়ী সত্তা পরম বিতৃষ্ণায় বলে উঠেছে, অমৃতকেই যদি না পেলাম, তবে কী হবে আমার এ-সমস্ত উপকরণ দিয়ে? কিসের জন্য এত হিংসা? এত রক্তপাত?

চার্বাক দর্শনের আদি প্রবক্তা বৃহস্পতি তীব্র শ্লেষে জ্বলে উঠে বললেন,

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্ব-পিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥

জ্যোতিষ্টোমে মরলে পশু, স্বর্গে যদি যাবে,
ওরে ও যজমান, নিজের বাপকেই খুন কর না তবে?

জয়দেবের সাক্ষ্য যদি মানতে হয়, তাহলে বুদ্ধের অবতরণেরও প্রধান উদ্দেশ্য হল পশুঘাত-কলুষিত যজ্ঞবিধি থেকে সমাজকে বাঁচানো—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব, ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

কালিদাস তাঁর শকুন্তলা নাটকে দুবার সাধারণ মানুষের মুখ দিয়ে এই পশুঘাতক নির্দয় ব্রাহ্মণদের খোঁচা দিয়েছেন। একবার নগরকোটালের চিটকিরির উত্তরে জেলে বলছে, কী করব বলেন? লোকে নিন্দে করবে বলে তো আর জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিতে পারি না? দেখেন না, পশুমালণকস্মদানুণে অণুকম্পাবিদু এই শোত্রিত্র, বেদ-পড়া বামুনপণ্ডিতদের শরীলটাতে এত দয়ামায়া কিন্তু যজ্ঞের পশুটাকে মারেন কেমন রাক্কুসে বিভীষণ মূর্তি ধরে? (৬।১)। আর একবার রাজা দুষ্মন্তের বিদূষক মাধব্য বলছে, অহং জেণ ইট্ঠি পসুবারং মারিদো মো ইমিনা বামদেণ অহিনন্দীয়দি—আমাকে ধরে যে যজ্ঞের পশুর মতো মারছিল—তাকে কিনা ইনি আদর করে আসুন বসুন করছেন। (৬। ২৯-৩০)

পাশ্চাত্য গবেষকরা সহজবোধ্য এবং সঙ্গত কারণেই পশুহত্যা নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামান নি। তাঁদের সমালোচনার নিশানা হল দক্ষিণালোভী পুরুতরা। দক্ষিণার লোভেই যজ্ঞের ব্যবস্থা, সেই যজ্ঞের জন্যই মন্ত্ররচনা, এবং সেই মন্ত্রের মধ্যে যজমানের কামনাকে —পুত্রকামনা, পশুকামনা, অন্নকামনা, আয়ুষ্কামনা, প্রতিষ্ঠাকামনা ইত্যাদিকে সুড়সুড়ি দেবার চালাও ফলাও আয়োজন—এই হচ্ছে বেদ এবং বৈদিক যজ্ঞ সম্পর্কে তাঁদের অধিকাংশের ধারণা। তাঁদের মতে বেদের এই কাম্যকর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছে উপনিষদ; যার কিছু কিছু আভাস ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত ধারণা যে কত অসার ভিত্তিহীন এবং অগভীর অনুশীলন-প্রসূত তার প্রমাণ হল, প্রথমত উপনিষদ তার নিজের কথার প্রমাণ হিসেবে বারবার ঋগ্বেদকেই উদ্ধৃত করেছে, আর দ্বিতীয়ত: ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এমন কিছু নেই যার স্পষ্ট পূর্বাভাস এবং পূর্বভাষ ঋগ্বেদের অন্যান্য মণ্ডলগুলিতে নেই। কিন্তু যজ্ঞের বিরুদ্ধে এই যে যুগযুগব্যাপী প্রতিবাদ সমালোচনা এবং বিদ্রোহ তার একটা ভিত্তি নিশ্চয় আছে। বৈদিকরা তার কী উত্তর দেবেন?

সে উত্তরটি হল এই—কোন সত্যকে লোকায়ত করার popular করার প্রয়োজন যতখানি বিপদও ততখানি। প্রয়োজন এই যে, প্রথমত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠির মধ্যে যোরাকেরা করেই ক্ষান্ত থাকবে সত্যের স্বভাবই তা নয়, বিশেষ করে তা যদি আধ্যাত্মিক জগতের কোন মহাসত্য হয়। সত্য সূর্যের মত ছড়িয়ে পড়ে, মন্ত্রগুপ্তির বেষ দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা যায় না। দ্বিতীয়ত কোন্ মানবজমিন্ কতখানি আবাদ করা আছে আর তাতে ঐ সত্যের বীজ বপন করলে কতখানি সোনা ফলবে সে-বিচার বোধহয় স্বয়ং মহাকাল ছাড়া আর কারও করার সাধ্য নেই। রূপগুণজাতিবর্ণকুলশীলবিদ্যাবুদ্ধি কোনো মাপকাঠি দিয়েই মাপা যায় না কে সত্যধারণের অধিকারী, কে নয়। এইজন্য লোকগুরুদের সবার ক্ষেত্রেই দেখি যদিও তাঁদের একটি করে বাচাই-বাছাই করা অন্তরঙ্গ পার্ষদগোষ্ঠি থাকে, তবু কিন্তু সেই গোষ্ঠির মধ্যেই তাঁদের নির্দেশ উপদেশ এবং করুণাবিতরণ সীমাবদ্ধ নয়। অধিকারী অনধিকারী নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য তাঁদের দানসত্র অহরহ খোলা। ইছামতী নদীর মত তাঁরা বয়ে যাচ্ছেন মানুষের দরজার পাশ দিয়ে, যে যার সাধ্যমত ঘটি-বড়া-কলসী ডুবিয়ে জল তুলে নিচ্ছে, কেউ আবার নিচ্ছেও না। শ্রাবণের ধারার মত তাঁরা ঝরে পড়ছেন, যে যার ইচ্ছে মত ভিজছে অথবা ভিজছে না। রাজভিখারী বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্রের ছলে শিক্ষাপাত্র হাতে মূর্তিমতী করুণার মত দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। যীশু মন্দিরচত্বরে, বিবাহবাসরে, চিলার মাথায়, জনতার মাঝখানে বীজের মত মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিয়েছেন উপদেশ, যত্র-তত্র বর্ষণ করেছেন তাঁর অপার অলৌকিক করুণা। শ্রীচৈতন্যের লোকপাবন হরিনামসঙ্কীর্তন শ্রীবাসের আঙিনা ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেছে পথের ধুলায় ধুলটে, আপামর জনসাধারণের দেবতা জগন্নাথের রথের আগে চোদ্দমাদলের উদ্দণ্ড ধ্বনিতে। দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরখানিতে রামকৃষ্ণ বসিয়েছেন তাঁর খোলাবেলা অবাধ উন্মুক্ত কথকতার আসর। যে ডেকেছে তারই ঘরে গেছেন বালকের মত নিঃসঙ্কোচে সারল্যে।

যুগ যুগ ধরে এইভাবে সত্যের সার পড়ে পড়ে মানুষের মনের মাটি উর্বর হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে বিপদও আবার কম ঘটেনি। ভুলবোঝা, অপব্যাখ্যা, বিকৃতি এবং পচন —এই হল বিপদ। সত্য পচেছে, মন্ত্র মরেছে, ভাব হয়েছে প্রতিমা এবং তারপরে প্রতিমা হয়েছে পুতুল। বিশ্বরূপ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বহুরূপী সং।

এখন কিং কর্তব্যম্? সত্যকে নিম্নাধিকারীর স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে দুর্বোধ্যতার সপ্তম স্বর্গে কয়েকজন ভাগ্যবান অধিকারীর জিম্মায় গুপ্তধনের মত রেখে দেব, না, হাটে বাজারে, আসরে বাসরে, আড়ডায়-গাড়ডায় গড্ডলিকাপ্রবাহে ছড়িয়ে দেব, ধুলো ভেবে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাবে অনেকেই, কিন্তু কেউ কেউ তো সোনা বুঝে তুলে নিতেও পারে?

এই দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলেন বৈদিকরা। কারণ তারা জানতেন সত্য এমন এক ধন যা সবার সামনে খুলে মেলে ফেলে ছড়িয়ে রাখলেও চুরি যাবার, হারাবার, অবাঞ্ছিত হাতে পড়ে নষ্ট হবার কোন ভয় নেই। যেমন সৃষ্টা তাঁর এই সৃষ্টিকে নির্ভয়ে মেলে রেখে-ছেন সবার সামনে, তাকে বেশির ভাগই দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, শুধু কোটিকে গুটিক লোক একে আশ্চর্যবৎ পশ্যতি আর আশ্চর্যববচ্চৈনোতি, আশ্চর্য হয়ে দেখে আর আর আশ্চর্য হয়ে শোনে, আর সেই বিস্ময়ে তাদের কণ্ঠে জাগে গান, জাগে শ্লোক, জাগে ভাষা। ঠিক তেমনি করেই যেন সৃষ্টারই দেখাদেখি এক সূক্ষ্ম ওড়না দিয়ে ঢেকে সেই "অপরূপা অজানিতা"কে তাঁরা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নামিয়ে আনলেন এই পৃথিবীর বেদিতে। সর্বদেবতাময়ী সর্বময়ী অদিতি মানুষের অনুরাগে বলে উঠলেন অগ্নি হয়ে, বললেন ন্যা ভুখা হুঁ, আমি ক্ষুধিতা, আমাকে অন্ন দাও, খিদের চোটে এলাম ছুটে অন্ন দে রে অন্ন দে। ভিক্ষু শিবের জীবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগলেন রাজদুলালী।

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই
তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে॥
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন শ্যামার দ্বারে
রন্ধ্র তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার
হারায় না সে আর।

এই হল যজ্ঞ। এই হল যজ্ঞরহস্য। দেবতা মানুষের কাছে কী যেন চাইছেন। কী চাইছেন তিনি?

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম
লাগতেছিল চক্ষে মম—

কী বিচিত্র শোভা তোমার
কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম
এ কোন্ মহারাজ।...

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
ঘুচিয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
'আমায় কিছু দাও গো' বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ—
'আমায় দাও গো কিছু'।
শুনে ক্ষণকালের তরে
রইনু মাথা-নিচু।
তোমার কী-বা অভাব আছে
ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে।
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।

ঘরে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কী।
ভিক্ষাভাণ্ডে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে—

তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে। ('কৃপণ'—রবীন্দ্রনাথ)

এই চাই ছন দেবতা। 'কিছু' নয়, 'সব'। সকল শূন্য করে সর্বস্ব অর্পণ সেই একের পায়ে। তাই বেদ বললেন, যজমান কেমন হবে? না, দাশুান্। যে দিয়েছে, দিচ্ছে, দিয়ে চলেছে। কিসের জন্যে এ দেওয়া? নতুন সৃষ্টির জন্যে, সৃষ্টিকে নতুন করার জন্যে, নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে। আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। শিল্প হল গিয়ে আত্মসংস্কৃতি। যজ্ঞ সেই আত্মসংস্কৃতির, আত্মসৃষ্টির, বিশ্বসৃষ্টির শিল্প। আমার নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে। আবার শূন্যগুলিকে যেই সেই একের দক্ষিণে পর পর বসাতে থাকি অমনি তা দশ হয়, একশ হয়, সহস্র হয়, অযুত লক্ষ, নিযুত কোটি, অনন্ত হয়। আমার শূন্য ভরে যায়, তার আপ্যায়ন হয়, সে বিরাট্ হয়, নবীন হয়, সতেজ হয়, রসে ভরপুর হয়। তখন সে আর শুধু গোল্লা থাকে না, সে হয়ে যায় রসগোল্লা। এ এক আশ্চর্য খেলা। পূর্ণকে পাবার জন্য শূন্য হওয়া, বাসি জল ফেলে ফেলে বারে বারে দেহের কলসীতে নতুন জল ভরা, আত্মাকে পাবার জন্য আত্মহারা হওয়া। ঋগ্বেদের বিশ্বকর্মা-সূক্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাস্ক বলছেন, ভুবনপুত্র বিশ্বকর্মা সর্বমেধ যজ্ঞে সব কিছু আহুতি দিয়ে শেষে নিজেকেও আহুতি দিলেন। (নি, ১০। ২৬) এর অর্থ কী? এর অর্থ, পৃথিবীর পুত্র নতুন স্রষ্টারা পূর্বসৃষ্টিকে পুড়িয়ে ছাই করতে করতে নিজেকেও উৎসর্গ করেন। তা-ই হয় উত্তর সৃষ্টির উপকরণ ও শক্তি।

শিল্পের এই ছকটি, এই আদর্শটি কোথা থেকে পাওয়া গেল? পাওয়া গেল স্রষ্টারই আত্মজীবনীর পাতা থেকে। সে জীবনী বলছে—এই সৃষ্টি হল বিরাট পুরুষের, বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সংবৎসর ব্যাপী এক মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা, যজ্ঞ এবং সর্বোপরি পশু তিনি নিজেই। ...পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত (ঋ, ১০। ৯০। ৬). সেই পুরুষকেই হবিঃ করে দেবতারা যজ্ঞবিস্তার করলেন। দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ (ঐ ১৫), সেই যে যজ্ঞ বিছিয়েছিলেন দেবতারা, যজ্ঞ দিয়ে ছেয়েছিলেন সব, তাতে সেই পুরুষকেই পশুরূপে বেঁধেছিলেন তাঁরা। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ (ঐ ১৬) 'যিনি স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপ যজ্ঞমূর্তি, যজ্ঞতনু যজ্ঞবিগ্রহ তাঁকে দিয়েই যজ্ঞের যজন করলেন দেবতারা, সেই হল প্রথম ধর্ম। সেই প্রথম ধর্মেরই পরিপূর্ণ বিবৃতি গীতার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥৪।২৪

ব্রহ্মই হোম ব্রহ্মই হবিঃ ব্রহ্মই হোতা ব্রহ্ম-আগুনে
ব্রহ্ম-লক্ষ্যে যাবে যজমান সমাধিস্থিত ব্রহ্মকর্মে

এই ব্রহ্মের প্রথম ধর্ম। এই মানুষেরও প্রথম ধর্ম, প্রধান ধর্ম। আত্মহোম। আত্মাকে ছকে ছিবে পড়িয়ে পড়িয়ে, বেদনার পটপাকে দণ্ডে দণ্ডে স্রষ্টা এই যে আত্মবিস্তরের নীল

হাহাকারভরা বেদনাবিষনীল অমৃত নীলকমলকে, এই অপরূপ সৃষ্টিকে তিলে তিলে মুহূর্তে মুহূর্তে গড়ছেন আর ভাঙছেন, বৈদিক যজ্ঞ তারই অনুকরণ, তারি অভিনয়, তারি অভিমুখে নয়ন, নিজেকে নিয়ে যাওয়া, তারই নয়নে নয়ন রেখে তারি আলোয় জেগে ওঠা।

এই দেবযজ্ঞ আর মনুষ্যযজ্ঞের রহস্য রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে কি স্বচ্ছ হয়েই না ধরা পড়েছে—

বিশ্বধাতার যজ্ঞ-শালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।
সে মুক্তি কেমন? না, আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে
দুঃখবিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে।
সে মুক্তি পৃথিবীর মর্মে মর্মে জড়িয়ে থেকেও আবার ঊর্ধ্বেও ঊধাও
আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে
সেই সঙ্গে দেহবনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
আবার গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে

ঐ আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন থেকে এই শ্যামল মাটির ধরাতল পর্যন্ত দ্যাবা-পৃথিবীর নিঃসীম বিস্তার জুড়ে বিদ্যুতের প্রভাতরল জ্যোতির মত চমক দিচ্ছে এই মোহিনী মুক্তি। এই মুক্তিকে সব মানুষের হাতে রাখীর মত বেঁধে দেবার সাধনা করছেন যুগ যুগ ধরে লোকপাল দেবোপম মানুষেরা, ঋভুরা, বিভুরা, প্রভুরা, মহাপুরুষরা, মহান্ পুরুষ-যজ্ঞের পশু-যজমানরা, ঋত্বিকরা, বিশ্বকর্মারা। তাঁদের আত্মহোমের পুণ্যগন্ধে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্রমশ সুগন্ধি হয়ে উঠছে।

শুধু কি তাঁরাই? ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বললেন, না, প্রতিটি পুরুষই সমস্ত জীবনভোর এই যজ্ঞ করে চলেছে। আপনি-তুমি, আমি-আমরা সবাই অচেতনে হোক সচেতনে হোক প্রতিমুহূর্তে যজ্ঞ করছি। "পুরুষো বাব যজ্ঞঃ", (৩। ১৬), পুরুষই যজ্ঞ। 'স যদ্ অশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ' এই যে তার খিদে পাচ্ছে, তেষ্টা পাচ্ছে, এই যে ভাল লাগছে না, এই হল তার একের পর এক দীক্ষা (৩। ১৭। ১)। এই খাই-খাই, নাই-নাই, হায় হায়, কী-করি কী-করি-র মধ্যে দিয়েই, এই প্রাণধারণের দিন যাপনের গ্লানির মধ্যে দিয়েই, এই জীবনের আগুনে অহরহ পুড়তে পুড়তেই সে শুদ্ধ হচ্ছে, বুদ্ধ হচ্ছে, বুভুক্ষু হচ্ছে, আহিতাগ্নি যাজ্ঞিক হচ্ছে। তোর অগ্নিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন, গুরু যে তোর হৃদয়ব্যথা ঝরায় দুনয়ন। 'অথ যদ্ অশ্নাতি যত্ পিবতি যদ্ রমতে তদ্ উপসদৈব এতি। 'আর এই যে সে খাচ্ছে-দাচ্ছে পান করছে, এই যে তার বেশ লাগছে দিব্যি লাগছে, চনৎকার লাগছে, এই হোল তার উপসদ্—এইগুলি দিয়ে সে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে 'দেবতার দিকে। (৩। ১৭। ২), এই জীবনানন্দই হ'ল তার জীবনায়ন-যজ্ঞে দেবতার হাতছানি।

এই জীবনযজ্ঞকে সচেতন করতে হবে, বললেন শ্রীকৃষ্ণ—

যৎ করোষি যদ্ অশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

যা কিছু করছ, যা কিছু খাচ্ছ, যা কিছু দিচ্ছ, হে কৌন্তেয়
যা কিছু তোমার হোম-তপস্যা, সবি তুমি সঁপে আমাকে দিও॥

Our sacrifice is the offering of all our gains and works to the powers of the higher existence. The whole world is a dumb and helpless sacrifice in which the soul is bound as a victim self-offered to unseen Gods. The liberating Word must be found, the illuminating hymn must be framed in the heart and mind of man and his life must be turned into a conscious and voluntary offering in which the soul is no longer the victim but the master of the sacrifice. By right sacrifice and by the all-creative and all-expressive Word that shall arise out of his depths as a sublime hymn to the Gods man can achieve all things. He shall conquer his perfection; Nature shall come to him as a willing and longing bride; he shall become her seer and rule her as her king. (*On the Veda*, p. 391)

'উর্ধ্বতন জগতের শক্তিগনহের কাছে আমাদের সমস্ত কর্ম এবং কর্মফলকে উৎসর্গ করাই হল আমাদের যজ্ঞসাধনা। সমস্ত সৃষ্টিই হল একটি অসহায় তূষ্ণীম্ যজ্ঞ, যে-যজ্ঞে অ-দৃষ্ট দেবতাদের কাছে স্বয়ম্ উৎসর্গীকৃত পশুরূপে বদ্ধ রয়েছে জীব। তাকে মুক্ত করার মন্ত্র খুঁজে পেতেই হবে, মানুষের হৃদয়ে আর মনীষায় সেই দীপক রোচন সূক্তকে রচনা করে তুলতেই হবে, তার সমস্ত জীবনকে করতে হবে একটি সচেতন, সেচ্ছ, সানন্দ আহুতি, জীব আর তখন পশু থাকবে না, সে হবে যজমান। সম্যক্ যজ্ঞ আর সর্বকৃৎ সর্বকামিনী বাক্ যা তার গভীর থেকে উৎসারিত হবে দেবতার দিব্য প্রশস্তি হয়ে —এ দিয়ে মানুষ সব কিছু পেতে পারে। সে জিনে নেবে সম্যক্সিদ্ধিকে। উশতী উতলা বধূ হয়ে প্রকৃতি আসবে তার কাছে। সে হবে তার দ্রষ্টা, তার ঈশ্বর, প্রভু, সম্রাট।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে বেদের যজ্ঞ পশুমারার কল নয়, ধনী যজমানের থেকে ঋত্বিকদের দক্ষিণা আদায়ের কৌশলও নয়, দেবতার কাছ থেকে মামুলি কাম্যবস্তুও আদায় করার জন্যে দেবতাকে কিছু দেওয়া এবং তাঁর প্রশস্তি গাওয়াও নয়। যদিও যজ্ঞের বিকৃত দশায় এগুলিই যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু খুলে বৈদিক যজ্ঞ হল জীবন সাধনারই নামান্তর। যজ্ঞকে বলা হয়েছে দেবরথ, দেবতার রথ। দেবলোক থেকে এই যজ্ঞরূপী রথ নেমে এসেছে মানুষকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। স্বর্গ মানে জ্যোতির্বিশাল চেতনা, আলো-

কের লোক, মৃত্যুর পরে নয়, পরলোকে নয়, এই জীবনেই এই পৃথিবীতেই সেই চেতনায় উত্তীর্ণ হবে মানুষ, লাভ করবে নবকলেবর, সূর্যবক্ হিরণ্যশরীর, লাভ করবে নতুন জন্ম, দিব্যজন্ম—এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যজ্ঞ। যজ্ঞ হল একটি যাত্রা, একটি সাগরপাড়ি, একটি আরোহণ—সানু থেকে সানুতে, শিখর থেকে শিখরে, The image of this sacrifice is sometimes that of a journey or voyage; for it travels, it ascends; it has a goal — the vastness, the true existence, the light, the felicity. (*Ibid.*, p. 392).

এখন দেখা যাক, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের যে ছক, তার মধ্যে যজ্ঞের এই তাৎপর্যকে কিভাবে ফলিয়ে তোলার আয়োজন করা হয়েছে।

যজ্ঞটি মূলত যজমানের। তাঁকে সাহায্য করেন ঋত্বিক্‌রা। আগুন জ্বালিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে সেই আগুনে দেওয়া হয় আহুতি।

যজমানের কথা আগেই বলেছি। এখন এই ঋত্বিকরা কারা? "ঋত্বিক" শব্দটি ভাঙলে পাই ঋতুতে ঋতুতে যাঁরা যজন করেন। ঋতু শব্দের অর্থ কাল, ঋতের তালে তালে আবর্তিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে কাল, তাই সে ঋতু। একটা দিনের পরে আসে আর একটা দিন, একটা সন্ধ্যার পরে আর একটা সন্ধ্যা, পূর্ণিমার পরে আবার পূর্ণিমা, একটা বছর শেষ হলে আর একটা বছর। আমাদের জীবন কালচক্রে বাঁধা, এই চাকার সংগে সংগে ঘুরছি আমরা, যিনি ঘোরাচ্ছেন তিনি কালী, তিনি মহাকাল, তিনি কালাতীত। এই ঘূর্ণি থেকে মুক্তি পেতে পারি যদি চাকার মত না ঘুরে শাঁখের রেখার মত ঘুরি; circle নয়, spiral, তখন এই ঘূর্ণি আর ঘূর্ণি থাকে না, সে হয়ে যায় নটরাজের নাচের ঘূর্ণি। সে হয়ে যায় সৃষ্টির সমুদ্রে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ান দেবতাদের যৌথ-নৃত্য, যার তীব্র বেগে উড়ে উড়ে পড়ে সৃষ্টির সমুদ্রে ফুলে ফুলে উঠছে সম্ভাবনায়, আর তার অতল জলের তলায় একটু একটু করে গড়ে উঠছে নতুন দিনের সূর্যের শরীর।

যদ্ দেবা অপঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রা বো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুর আপায়ত
যদ্ দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিনৃত।
অত্রা সমুদ্র আ গুলহন্ আ সূর্যম্ অজভর্তন (ঋ, ১০।৭২।৬, ৭)

দিনরাত্রি পক্ষমাস ঋতুঅয়ন সংবৎসরের এই জাঁতাকলকে দেবনৃত্যের মাদল বলে বুঝেছেন, দেখেছেন, শুনেছেন যিনি, আর তা বোঝাতে দেখাতে শোনাতে পারার সামর্থ্যও যাঁর আছে, তিনিই হলেন সত্যিকারের ঋত্বিক, যজমানের জীবননৃত্যের শিক্ষক তিনি। তিনি বলছেন, ঐ দেবনৃত্যের তালে তালে নাচতে থাক, নর্তক হও, নর হও, নৃত্যন্তি কর্মস্থ ইতি নরাঃ (নিরুক্ত ৩।১), কর্মে যারা নাচে, কর্ম যাদের নাচের মত সুষম ছন্দোময়, আনন্দময়, ভারলেশহীন, স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল, তারাই নর, তারাই তো পাবে সেই নৃত্যুকে, সেই নর্তকীশ্রেষ্ঠা উষাকে, যিনি তাঁর অঙ্গে অঙ্গে বিচিত্র বর্ণের পসরা ছড়িয়ে (ঋ, ১।৯২।৪)

বিশ্বভুবনের জন্য ফুটিয়ে তুলছেন সেই মহাজ্যোতি সূর্যকে। সেই সূর্য যে একদিন ফুটবেই ফুটবে, এ দিন ফুরিয়ে সে দিন আসবে, সুদিন আসবে, সে খবরটি এই ঋত্বিক্‌দের জানা আছে, তাই তাঁদের আর এক নাম হল 'অহর্বিদ'—'অহঃ' অর্থাৎ দিন। তিনিই অহর্বিদ, সেই সেরা দিনটিকে যিনি জানেন, আর সারা দিন ধরে সারা জীবন ধরে সেই দিনটিকে কাছিয়ে আনার জন্যে সাধনা করেন ও করান, অন্তরাকাশ উদ্ভাসিত করে যে উষা আবির্ভূতা তাঁর উদ্দেশ্যে বারবার বলতে থাকেন,

তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।

A marvellous sun looked down from ecstasy's skies
On worlds of deathless bliss, perfection's home,
Magical unfoldings of the Eternal's smile
Capturing his secret heart-beats of delight.
God's everlasting day surrounded her,
Domains appeared of sempiternal light
Invading all nature with the Absolute's joy.
Her body quivered with eternity's touch,
Her soul stood close to the founts of the infinite.
(সাবিত্রী ১১।১)

অথৈ উল্লাসের আকাশ থেকে এক আশ্চর্য সূর্য নিচে তাকাল
যেখানে রয়েছে ধরে ধরে অমর্ত্য আনন্দের ভুবন, পূর্ণতার নীড়,
অনন্তের হাসির আবরণ-মোচনের যাদু
অধিকার করল তার (সত্যবানের) নিগূঢ় নন্দিত হৃদ্‌-স্পন্দনকে।
দেবতার অনন্তবাসর ঘিরে ধরল তাকে (সাবিত্রীকে)
অক্ষয় জ্যোতির ধামের পরে ধাম উঠল ফুটে
ব্রহ্মের আনন্দে সমস্ত প্রকৃতিকে আবিষ্ট, অভিভূত ক'রে,
অদিতির স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার তনু
অসীমের উৎসের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল তার সত্তা।

এই God's everlasting day, দেবতার অনন্তবাসর, এই সকৃদ্‌দিবা (অর্থাৎ যে দিন একবারই হয়), এই বৃহদ্‌-দিবা, এই বড়-দিন, এই সীমাহীন কূলহীন তলহীন জ্যোতিঃ-পারাবার যা সূর্য-তারা-অন্ধকার সব কিছুকে ছেয়ে আছে, উপনিষদ যার বর্ণনা করলেন এই বলে—ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

সূর্য সেখানে ভায় না, ভায় না তারারা, চাঁদ,
এই বিদ্যুতেরাও ভায় না। কোথায় এই আগুন?
সে-ই ভায় তাই পিছু পিছু তার ভায় সব-ই,
তার ভাতিতেই এই সব কিছু বিতানয়।

এই বিভা-ধরী, যিনি তাঁর 'জ্যোতিষা বাধতে তমঃ' (ঋ ১০। ১২৭।২) জ্যোতি দিয়ে দূর করেন অন্ধকার, কালো রূপে আলো করেন জগৎ, 'বিরোচন হিরণ্ময় পাত্রের' ঝলমলানিকে ঢাকিয়ে অপাবৃত করেন সত্যের দুয়ার, তাঁকেই খুঁজছে বেদের যজ্ঞ, তন্ত্রের সাধনা। এই যোগ, এই যাগ। তাই ঋষি বারবার বলছেন, যজ্ঞকে কর প্রাঙ্মুখ, পুবমুখী, সবাই মিলে উন্মুখ, একমন, একপ্রাণ হয়ে যেন্নাও তাকে সেই আলোর দিকে—

উদ্ বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সম্ অগ্নিম্ ইন্ধ্বং বহবঃ সনীলাঃ।
নভ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আ তনুধ্বং নাবস্ অরিত্রপরণীঃ কৃণুধ্বম্।
ইন্ধ্বুধ্বম্ আয়ুধাবং কৃণুধ্বং প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়তা সখায়ঃ (১০। ১০১। ১, ২)

ওঠো, জেগে ওঠো, একমন ওগো সখারা,
একনীড় হয়ে বহুজনে মিলে অগ্নিকে জ্বেল জ্বালিয়ে
আনন্দধ্বনি জাগাও
ধ্যাননিবিষ্ট কর্মকে দাও ছড়িয়ে
দাঁড় ফেলে ফেলে পারে নিয়ে চল (যজ্ঞের) এই নৌকো
যজ্ঞের প্রহরণগুলি কর সুপরিকৃত, কর একমুখী, সুন্দর সংহত
যজ্ঞকে নিয়ে চল পুবে, চলো সামনে চলো হে সখারা।

যজ্ঞ এই বহুজনের মিলিত সাধনা সেই শুভদিন-শুভরজনীটিকে কাছিয়ে আনার জন্যে। সপত্নীক যজমানের হাত ধরে নিয়ে চলেছেন সখারা, ঋত্বিকরা, এই যজ্ঞের খেয়া-নৌকোয় করে এই প্রাকৃতজীবনের ওপারে এক দিব্য-চেতনার রাজ্যে। সোমযাগে এই ঋত্বিকের সংখ্যা ষোল। এঁরা যেন সেই ষোলকলা সোমের পরিপূর্ণ অমৃত-আনন্দের, ষোলজন পার্থিব প্রতিনিধি। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন অধ্বর্যু, হোতা, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা।

অধ্বর্যু কে? যিনি অধ্বর্যু—অধ্বরকাম, অধ্বরকে চাইছেন যিনি। আবার অধ্বর-যু, অধ্বরকে যুক্ত করছেন যিনি। ধ্বর মানে কুটিলতা (√ধ্বৃ কৌটিল্যে)। অধ্বর কুটিলতাহীন জটিলতাহীন ঋজু সহজ সোজা পথ, যে পথ সম্পর্কে উপনিষদের কবিরা বলেন, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ—

ক্ষুর হেন তাই ধার যে পথের
পারে যাওয়া ভার
সে পথে চলা যেন্নাই ভার

কবীর যার সম্পর্কে বলেন 'পংখীকা খোজ[জ]লীন কা মারগ' অর্থাৎ আকাশে পাখির পথের মত, জলে মাছের পথের মত তা কোন চিহ্ন রেখে যায় না, সেই অচিন অলখ অধরাকে সহজকে ধরার জন্যে অধ্বরের যজ্ঞের জাল বিছোন, অধ্বরকে যুক্ত করেন যিনি, তিনিই অধ্বর্যু। অধ্বর একই সঙ্গে সেই পথ, সেই লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যের সাধন যে যজ্ঞ তার বাচক।

অধ্বর্যুর মন্ত্র হল মুখ্যত যজুঃ—গদ্য, সরল সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ ঋজু বাক্।

হোতা কে? যিনি আহ্বান করেন, ডাক দেন। যজমানের হয়ে, সমস্ত পৃথিবীর সব মানুষের হয়ে পৃথিবীর ডাক পৌঁছে দেন দেবতাদের কাছে, দেবতার কাছে। 'অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ', অগ্নি, এখানে নিয়ে এস দেবতাদের। 'মরুদ্ভির অগ্ন আ গহি' মরুদ্‌গণের সঙ্গে, অগ্নি, এস হে। 'আ রোহথো বরুণ মিত্র গর্তম্ অতশ্চকার্ধে অদিতিং দিতিং চ'

মিত্র বরুণ আরোহণ কর গর্তে
(গহন গোপন আধার হৃদয় গভীরে)
এখান থেকেই দেখ অসীমাকে সীমাকে।

তেমন করে ডাকতে পারলে হোতার এই ডাকে নীল আকাশের আলোর পাখিরা, অদিতির পুত্র আদিত্যরা দেবতারা অধ্বর্যুর বিছানো যজ্ঞের জালে নাড়ীজাল বিছানো এই দেহে ধরা দেন। তখন কী হয়? হিরণ্যনিনিগ্ যয়ো অস্য মূর্ধা বি ধ্রাজতে দিব্যশ্মাজনীব। (৫।৬২।৭)

সোনার মত ঝলক দিয়ে ঝলসে ওঠে লোহার খাদ
(এই দেহ-সৌধের হাজার খাদ)
উজলে ওঠে তড়িৎ হেন আভাসে
দেব-ঘোড়ার ঐ চাবুক যেন আকাশে

হোতার মন্ত্র হল ঋক্ —প্রাণের তাপে উক্ত ছন্দোময় উচ্চারণ। প্রাণে যখন আগুন লাগে, তখন সেই দাউ দাউ দাবানলের মধ্যে থেকে জেগে ওঠে ছন্দের অনির্বাণ শিখা, অচিঃ, ঋক্। সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিন্তু সেই সবের চিত্তাভস্মের স্তূপটান বুকে নেখে সেই অনলচিতনু ঋক্ জ্বলতে থাকে যুগ যুগ ধরে।

তারপর উদ্গাতা। যিনি উদ্গান করেন। তাঁর মন্ত্র হল সাম। ঋকে সুর লাগিয়ে তাকে নিয়ে যান স্বরে, পরম জ্যোতিতে, পরম শব্দে, একপদী বাক্ ওঙ্কারে; সামে, সমতায়, সুষমায়, বিশ্বজোড়া ঐকতানে, সোমে, আনন্দে।

যজুর্মন্ত্রগুলি যেন সনিধ্। যজ্ঞের আয়োজন করতে করতে উপাচারগুলি গুছিয়ে তুলতে তুলতে তাদের উচ্চারণ করছি, গড়ে উঠছে একটি মন্ত্রধ্বনিত ভাবময় পরিবেশ, আগুনের পরশমণির অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। সেই আকুতি তীব্র হতে হতে জ্বলে উঠল ঋক্ হয়ে দেবতার আবাহনে, দেবতার প্রশস্তিতে, দেবতার কাছে আহুতি নিবেদনে আত্ম-নিবেদনে। তারপর সেই আগুন পরিণত হল সুরে, যা ছিল শস্ত্র, দেবতার প্রশস্তি, তা হল স্তোত্র, স্তবগান; সুরের আগুন আনন্দধারা হয়ে সবখানে ছড়িয়ে গেল, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া হৃদয় হল আনন্দযজ্ঞের বেদি, প্রতিটি অগ্নিবিন্দু ঘৃতবিন্দু জ্যোতিবিন্দু থেকে

জন্ম নিল একটি করে সোমবিন্দু, মধুবিন্দু, অমৃতবিন্দু, সেই অসহ্য মদিরার তীব্র আনন্দে ভেঙে খান খান হয়ে গেল জীবনপাত্র ; শূন্য বেজে উঠল বাঁশি হয়ে, সমস্ত প্রত্যাশার পারে যা, সেই অবাঙ্‌মনসগোচর অনির্বচনীয়ের আশ্চর্য প্রেমস্পর্শে বিহ্বল যজমান বলে উঠলেন—

আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে
আছে অঞ্জলি মোর প্রসাদ দিয়ে দাও-না পুরে ॥
শূন্য ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও-না পুরে ॥

ভাবতে আশ্চর্য লাগে বৈদিক যজ্ঞের এত জটিল বিচিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়োজন সমস্তই এই 'সহজ সুধার' জন্যে, এই সোমের জন্যে। কিন্তু প্রমাণ এত স্পষ্ট যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। বৈদিক যজ্ঞ যেন আমাদের জটিল বিচিত্র জীবনেরই একটা প্রতিরূপ,-model, একটি গোলকধাঁধা, গো-লোকে জ্যোতির্লোকে বাক্-লোকে সহজ সুধার লোকে যাবার একটা গূঢ়লিপি চিত্রসমন্বিত সঙ্কেতপত্র, যা শুধুমাথাওয়ালাদের বুদ্ধিকে ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু সহজ হয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় তার কাছে, যে ওই গুপ্তধন পাবার জন্যে জীবন পণ করে বসেছে, সেই বৃত্তাত্রয়ের কাছে। যজ্ঞের মধ্যে সমস্ত জীবনকে—তার ধর্ম অর্থ কাম—সব কিছুকে নিয়ে এসে তাকে দেবতার স্পর্শে দিব্য ক'রে মুক্ত ক'রে বৃহৎ ক'রে নতুন ক'রে আপ্যায়িত ক'রে সহজ সত্যের সরল নবীন ক'রে তারপর সমস্ত জীবনটাকেই যজ্ঞ ক'রে তোলা—এই হল বৈদিক যজ্ঞজীবন তথা জীবনযজ্ঞের রহস্য। এই রহস্যেরই বিবৃতি আমাদের পুরী-কোণারক-খাজুরাহোর মন্দির-ভাস্কর্যে। নানুষ-নানুষী তাদের জীবনের সমস্ত কামনা-বেদনা-ঐশ্বর্য-মাধুর্য-কালিমা-গরিমার ডালি নিয়ে অন্তরদেবতার দিকে ছুটতে ছুটতে দেবতা হয়ে উঠছে, উঠেছে, দেবতার সংগে তাদের যে জননান্তরসৌহৃদানি, জন্মজন্মান্তরের ভালবাসা, তা ভাবস্থির হয়ে লগ্ন হয়ে গেছে মন্দিরগাত্রে। অঙ্গনপ্রাঙ্গনভিত্তি-চত্বর-রঙ্গ-বেদি-মণিকোঠা সমন্বিত বিশাল মন্দিরদেহ নিয়ে তারা, সে, আকাশে উঠছে আকাশশরীর ব্রহ্মবিদ্যুৎকে সংস্পর্শ করতে, পরো দিবা পর এনা পৃথিবা এতাবতী মহিনা সংবভূব—

দ্যুলোকের পারে, এই পৃথিবীর পারে
সম্ভূত আমি, এতখানি, মহিমায়...

একজন ঋত্বিকের কথা বলা হয়নি। তিনি হলেন যজ্ঞের সর্বাধ্যক্ষ, ঋত্বিকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কি করেন ? তিনি কিছু করেন না, অথচ কিছু না করেই সব করেন। তিনি যজ্ঞের সাক্ষী দ্রষ্টা অনুমন্তা। তাঁর ব্রহ্ম দিয়ে বৃহৎ চেতনার রশ্মি দিয়ে তিনি ধরে থাকেন চালনা করেন দেবরথ যজ্ঞকে। তাঁর অনুমতি ছাড়া অনুমোদন ছাড়া প্রেরণা ছাড়া যজ্ঞের কোন কাজ হয় না। তাঁর নম্র মননের গভীরে মৌন মননের নিঃস্বর গুঞ্জরণ, যা থেকে থেকে ওম্ ওম্ ওঙ্কার ধ্বনিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। কী এই ওম্ ? কে এই ওম্ ? তৈত্তিরীয় উপনিষদ বললেন—ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম। ওম—এটি ব্রহ্ম। ওম এই সব। ওম্ ইতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোম ইতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওম্ ইত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতি-

গৃণাতি। ওম্ ইতি ব্রহ্মা প্রযৌতি। (১। ৮) ওম্ বলে সামগান করেন উদ্গাতা, ওম্ শোম্ বলে শাস্ত্রপাঠ করেন হোতা, ওম্ বলে অধ্বর্যু উচ্চারণ করেন প্রতিগর মন্ত্র আর ওম্ বলে প্রেরণা দেন অনুমতি দেন ব্রহ্মা।

সব মন্ত্র ওম্ দিয়ে আরম্ভ হয়, ওম্ দিয়ে শেষ হয়। ওমে শুরু ওমে সারা। অর্থাৎ মন্ত্রেরা ওমেরই অনুরণন, ওমেরই অনুবৃত্তি। এক ওম্ই যেন বিচিত্র তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে স্পন্দিত হয়ে ফুটে উঠেছে মন্ত্র হয়ে ঋষির হৃদয়ে। মন্ত্রপদচিহ্ন ধরে ধরে ঋত্বিক্‌দের পেছন পেছন যজমান চলেছে সেই স্পন্দনটিকে সেই অস্পন্দনটিকে সেই অক্ষরটিকে ধরতে। ঋগ্বেদ স্পষ্ট বলছেন, যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্ তাম্ অন্বিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ (১০। ৭১। ৩)। যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে বাকের পায়ে চলা পথে চলতে চলতে ধীরেরা সধারা খুঁজে পেলেন তাকে—ঋষিদের মধ্যে প্রবিষ্ট সেই বাক্‌কে, ঋষিদের হৃদয়নভুমের গভীরে যে-বাক্ একদিন হিমালয়-তরঙ্গ তুলেছিল। এই বাক্‌ই যজ্ঞের আদি ও অন্তিম অভীষ্ট, তাই বাক্‌ই যজ্ঞের মুখ্য সাধন। As the eyes of the sage are opened to the light, so is his ear unsealed to receive the vibrations of the Infinite; from all the regions of the Truth there comes thrilling into him its Word which becomes the form of his thoughts. (p. 471)

ঋষির চোখ যেমন খুলে যায় সেই আলোর দিকে, তাঁর কাণও তেমনি অকপট হয়ে অসীমা অদিতির ধরো ধরো কাঁপনগুলিকে ধরতে আপনা মেলে। চতুর্দিকে সত্যের খান থেকে তার ভেতরে আবিষ্ট হয় আশ্চর্য অদ্ভুত বাক্, তাই দিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর মননের ছাঁচ। The liberating Word must be found. (p. 391) বাক্‌ই মুক্তিদায়িনী, মোক্ষদা, তাঁকে খুঁজে পেতেই হবে, অসীমের ছন্দকে অসীমের আপন সুরকে ধরতে হবে এই সীমার মধ্যে, সেই সুর শুনতে শুনতে ভাঙতে ভাঙতে তার মধ্যেই নতুন জন্ম নতুন জন্ম নতুন জন্ম সীমার। তাই বুঝি বৃহদারণ্যক বললেন, বাগ্ বৈ যজ্ঞস্য হোতা, তদ্ যেয়ং বাক্ সোঽয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ। (বৃ ৩। ১। ৩)। বাক্‌ই যজ্ঞের হোতা। এই যে বাক্, সেই হল অগ্নি, সেই হল হোতা, সে-ই হল মুক্তি, সেই অতিমুক্তি। মুক্তিরও ওপারে যা, অসংখ্য বন্ধনবাঁধে মহানন্দময় সেই মুক্তি। সেই ভবে-নির্বাণে মাখা-মাখি একাকার, সেই পরমশৈশব, সব বুড়োমি সব পাকামির পারে সেই আপনভোলা ছেলে-বেলা, সেই পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেত্, পণ্ডিতিয়া গলিঘুঁজি পেরিয়ে মুক্তধারার বাঁধে বালকবালিকার আপনিমেলার মেলা, জগৎপারাবারের তীরে ছেলেবুড়োর, ছেলে-হওয়া বুড়োদের নুড়ি কুড়োন, সেই সহজ প্রেমের দিব্য-মানুষ-জীবন—এরই নাম অতিমুক্তি। বাক্ এই অতিমুক্তিস্বরূপিণী। যজ্ঞ হল ঋষিদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট এই বাক্‌কে সমস্ত মন প্রাণ হৃদয় দিয়ে উচ্চারণ করা, অতিমুক্তির সহজ মার্গের মার্গন-সাধা। সাধতে সাধতে... হয়ত বা...একদিন...নিশ্চয়...সিদ্ধি। সাবিত্রী কেন পড়ি? অনন্তের সমুদ্রে শ্রীঅরবিন্দের

হিরণ্য-হৃদয়টি সোনার দোলায় কেমন করে দুলেছিল সেই দোলনাটি জানতে, সেই দোলনাটি হয়ে যেতে, সেই দোলনচাঁপাটিকে কানে দুলিয়ে দিতে। রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন গাই? অনন্ত আকাশ আর অনন্তা পৃথিবীকে সুরের বাঁধনে বাঁধতে বাঁধতে মাটির প্রেমে সিক্ত অভিসিক্ত সেই মহাবিহঙ্গের পাখা কোন কাঁপনে থরথরিয়ে উঠেছিল সেই কাঁপনটিকে ধরতে জানতে, তার সঙ্গে একাকার হতে। এই vibration of Infinity অদিতির হৃৎস্পন্দনকে ধরতে পারাই যজ্ঞচিকিৎসার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেটিকে ধরতে পারলেই রোগ সারে, রাগ সারে, বৈরাগ্যও সারে। সমস্ত রোগবালাই রাগ-বৈরাগ্য ঐ যমীনের নন্দনস্পন্দন-স্পর্শে রঞ্জিত রূপান্তরিত হয়ে সীমার সীমন্তে ঝকঝক করে ওঠে সিন্দূরবাগরঞ্জিত নবীন প্রভাতের মত। and this new-seeing of all things, this new moulding of thought, act, feeling, will, consciousness is the terms of the Truth, the Bliss, the Right, the Infinity is a new creation. It is the coming into us of 'that greater existence which is beyond on the other side of this smaller' (p. 472) এই যে সব কিছুকে নতুন চোখে দেখা, এই যে মননকে কর্মকে, অনুভূতিকে, সংকল্পকে, চৈতন্যকে নতুন-ছাঁচে ঢালাই, সত্যের ছাঁচে, আনন্দের ছাঁদে, ঋতের রকমে, অদিতির আদ্‌রায়—এই হল নতুন সৃষ্টি; এই অল্পের ওপারে যে ভূমা, এই ক্ষুদ্রজীবনের ওপারে যে মহাজীবন তার আবেশ, অনুপ্রবেশ আমাদের ভেতরে।'

এই কল্পের, নতুন সৃষ্টির, হয়ে-ওঠার স্বপ্ন দেখে ব'লে, সাধনা করে বলেই যজ্ঞের আর এক নাম হল কল্প। যজ্ঞ হল সেই কল্প, সেই রূপকৃৎ শক্তি যা যজমানকে নতুন মন নতুন প্রাণ নতুন জনম দেয়। এই জন্যেই সব যজ্ঞের সেরা যে সোমযজ্ঞ তার দীক্ষণীয়া ইষ্টিতে যজমান হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ করে সারা গা কাপড়ে ঢেকে নবজাতকের অভিনয় করেন। সার্থক যজ্ঞ যজমানকে নিয়ে যায় স্বর্‌ বা স্বর্গে অর্থাৎ চেতনার নন্দনবন সেই জ্যোতির্লোকে সুরের লোকে। সার্থক যজ্ঞ যজমানকে দেয় শ্রবস্‌ এবং বাজ—অর্থাৎ সেই পরম শ্রুতি অর্থাৎ অদিতির হৃদয়ে মন্ত্রিত গুরুগুরু ডমরুধ্বনি শোনার কান এবং সমস্ত বাধাকে, বৃত্রকে, আবরণকে, দস্যুকে, হানলাবাজকে, পণিকে, বণিকচাতুর্যকে, ছলনাকে অভিভূত করে দূরে হঠিয়ে দেবার বজ্রতেজ, শক্তি, সামর্থ্য। সার্থক যজ্ঞ যজমানকে দেয় ব্রহ্ম এবং ক্ষত্র—বিশাল বৃহতী চেতনার দীপ্তি এবং সেই সঙ্গে অ-বৃহৎকে ক্ষুদ্রকে পরাভূত করার তেজ। সার্থক যজ্ঞ যজমানকে দেয় গো অর্থাৎ প্রজ্ঞার আলো, বাক্‌রশ্মি, দেয় অশ্ব অর্থাৎ মুক্ত প্রাণ তুরঙ্গের দুর্বার গতি, দেয় হিরণ্য, রক্ত, সংহত প্রজ্ঞানঘন প্রেমঘন চেতনার তীব্র স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য, দেয় প্রজা, জন্মের পর জন্ম, নব নব রূপে সত্যের পরমের আবির্ভাব, দেয় শান্তি, দেয় স্বস্তি স্বধা—আপনাতে আপনি থাকা। এই পরমকে পেলে তবেই তার ধনে-জনে-পুত্রে-কলত্রে গো-অশ্বে শান্তিতে-স্বস্তিতে পরিপূর্ণ সোনার সংসার সম্ভব এবং সার্থক, নইলে অসূর্যম্পশ্যা রাজঅন্তঃপুরের মতো তা অন্ধকার, এমন কি সময় সময় কদর্য, বিঘাক্ত, বীভৎস।

আর কী দেয় যজ্ঞ? বেদ-ঠাকুনার অক্ষয় ঝাঁপি ঐ যজ্ঞ? দেয় 'সর্বতাতি'। সবার সঙ্গে একাকার। সে কেমন? না, দেহমনপ্রাণের radio খুলে বসে আছি Infinity-র অসীমার অদিতির wave-length-এ কী সুর বাজছে সেটিকে ধরবার জন্যে, না জানি সে কোন চেনা, কোন সুদূর, কোন অজানা যন্ত্রের অনির্বচনীয় রাগিনী—

হঠাৎ দেখি কি আশ্চর্য চমকে দিয়ে মন-প্রাণ
আকাশ জুড়ে উঠল বেজে চেনা গলার চেনা গান
সেই চেনা গান চেনা ছবি চেনা কথার হট্‌গোলে
অজানা কোন অসীম সায়র সহজ ছন্দে উঠল দুলে
অলৌকিক এক হাসি হেসে বললে যেন এ লৌকিক
আমায় ছেড়ে ছুটছ কোথা, খুঁজছ কোথা দিক্‌বিদিক?
সাদা চোখে সিধে চোখে তাকিয়ে দেখ এইখানেই
আমার ভেতর সে-ই তো আছে, সে ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।

রামপ্রসাদ বললেন, যত শোন কর্ণপুটে, সবি মায়ের মন্ত্র বটে। রবীন্দ্রনাথ বললেন সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত-গান। সাবিত্রী বললেন সমস্ত মানুষের হয়ে মৃত্যুতে—

Love in me knows the truth all changings mask.
I know that Knowledge is a vast embrace:
I know that every being is myself,
In every heart is hidden the myriad One.
. . . .
I hear the murmur of the Cosmic Voice. (*Savitri*, p. 228)

রূপে রূপে বহুরূপী যে সত্য মোর প্রেমে তাকে জেনেছি
জেনেছি প্রজ্ঞা মানে হল এক বিপুল আলিঙ্গন
জেনেছি যা কিছু আছে সবি এই আমার আপন আমি
হৃদয়ে হৃদয়ে রয়েছে লুকিয়ে সেই অসংখ্য এক...
ব্রহ্মের স্বর শুনি গুঞ্জরে মর্মের মর্মরে

এই হল যজ্ঞকথা। যজ্ঞপুরুষের আপন কথা। সা প্রকৃতিঃ সর্বযজ্ঞানাম। এই অন্তরতম মর্মকথাটিই হল সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃতি—স্বভাব, ছাঁচ, ব্রহ্মবস্তু। আর সবই বিকৃতি রূপান্তর। অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস চাতুর্মাস্য পশু সোম সবই ঘুরে ফিরে ঐ একই কথা, ঐ একই ব্যবসায়। সেই ব্যবসায়ের মূলধন হল সর্বস্ব, লাভ হল সর্বতাতি, দেবতাতি, আত্মতাতি। ক্রেতা কে তা জানি না, বুঝি এক আশ্চর্য অনির্ব্বচনীয় পুরুষ অথবা পুরুষী যিনি 'শুষ্ণীর জিগীর্বাল্লক্ষম আদত্ত' পাকা জুয়াড়ীর মত ঠিক চিনে নেন জিনে নেন তাঁর লক্ষ্য তাঁর চালটিকে, যিনি জিতেই আছেন, আর জিতিয়ে দিচ্ছেন তাঁর গোহারান হারা

চেনা-কে, যার-জিত যাঁর খেনা, যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ, 'অমৃত যাঁর দেহের কান্তি, মৃত্যুও'। 'কে সে? জানিনা, কে। চিনি নাই তারে, শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে...আলায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তরপ্রদীপখানি ; তাঁরই উদ্দেশ্যে দিচ্ছি,আমার পুরো-ডাশ, আমার প্রথম দান, ব্রীহি-যবাদি ওষধির আহুতি, আমার চৈতন্যের উষারাগরঞ্জিত প্রথম ভোরকে। দিচ্ছি পশু অর্থাৎ প্রাণকে। দিচ্ছি সোম অর্থাৎ আনন্দকে। দিচ্ছি আজ্য, ঘৃত—যা নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে জ্যোতিরন্তন মাখিয়ে দেবে আমার সর্বাঙ্গে। যজ্ঞের পাত্র, যজ্ঞের আহুতি, যজ্ঞের উপকরণ—সবই সেই একটি কথারই অক্ষর, একটি সুরেরই স্বরগ্রাম—যে কথা যে সুর সেই বাঁশি জানে বাঁশিই জানে। বাঁধনে যে সুর তারায় তারায় বস্তুবিহীন অগ্নিধারায় —সেই সুরই ব্যাকুল হয়ে বাজছে যজ্ঞের অঙ্গে অঙ্গে, বেদিরূপিণী পৃথিবীর অঙ্গে অঙ্গে। সেই সুরেরই রোমাঞ্চ যজ্ঞের তৃণকুশদর্ভবহ্নিতে—তোমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, আমার প্রেম হয় যে মিছে। এই দেবযজনভূমির, হিরণ্যবক্ষা অদিতি-পৃথিবীর প্রতিটি অনুপরমাণু সেই আদিম দেবনৃত্যের নূপুর হবার জন্যে আকুলিত-ব্যাকুলিত, নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে...। প্রতিটি মন্ত্রতরঙ্গে পা ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছেন নটরাজ, বেজে বেজে উঠছে জলতরঙ্গ, মনতরঙ্গ, প্রাণতরঙ্গ, প্রাণতুরঙ্গ পক্ষীরাজ সুপর্ণ...আলোর পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে যজমান, গ্রন্থিক-যজ্ঞ, ইঁট সাজিয়ে সাজিয়ে যার পক্ষীশরীর তৈরী করা হয়েছিল যজ্ঞভূমিতে, সোম-যাগ সুরু হবার আগের মাঝরাতে হোতা উড়ু-উড়ু পাখির মত ভঙ্গিতে বসে যে মন্ত্র-বিহঙ্গের আবাহন করেছিলেন সপ্তচ্ছন্দা মন্ত্রের শতনরী দিয়ে—

মধ্যরাতের প্রান্তরপ্লাবক
ডাকে পাখি ডাক ওরে পাখি ডাক
কূজনে কূজনে ভরে দে শ্রাবণ-
ছায়াঘন মহাকাশ

কবে হবে ভোর ভোর কবে হবে
মধুখে মধুখে জল ঝলসাবে
বারোমাসীর কাঁটায় কাঁটায়
ফুল হবে বারোমাস

কিম্বদন্তীশানা পাখিবন্যা বন্ধ উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ (ঋ ১। ১১৩। ৭)
পৃথিবীর ধন যত কিছু আছে তার ঈশ্বরী হয়ে
হে সুভগা উষা
(ভোর ওগো ভোর) ফোট ফুটে ওঠ
আজকে এখানে এখনই

এই ভোর-পাখিকে ভোরের পাখিকে ডাকাডাকি করা, এই দেহবৃক্ষের ডালে তার আপন সখার সঙ্গে মাণিকজোড় হয়ে বসে আছে যে—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে—সেই সাধ্যসাধনা, সেই অসাধ্যসাধনই হল যজ্ঞ। স্রুক্, স্রুব জুহূ উপভৃৎ আজ্য-আজ্যস্থালী পশু সোমরস—ইত্যাদি বাহ্য আলম্বনের প্রয়োজন সে-যুগেও সবার ছিল না, এ যুগে তো আরোই নেই। গীতা তো বলেই দিয়েছেন দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞা-স্তথাপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়: সংশিতব্রতা:॥ (গীতা ৪। ২৮)। কেউ জিনিষপত্তর দিয়ে যজ্ঞ করে, কেউ তপস্যা দিয়ে, কারো যজ্ঞ যোগ, কারো স্বাধ্যায়, কারো জ্ঞান, পড়াশোনা। যজ্ঞভাবনা নিয়ে যা কিছু করি সবই যজ্ঞ—

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
কৌতুকে ব্রহ্মপ্রসাদ ভাখে, ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে
ওরে আহার কর মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা-মারে।

যা কিছু আহার করছি আহরণ করছি সমস্ত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ভাব অভাব —সবই আমার অন্তরস্থ অগ্নি, আমার দেহগৃহের গৃহপতি আত্মচৈতন্য নিজের মনের মতন করে পুড়িয়ে ঝালিয়ে বেঁকিয়ে চুরিয়ে রূপান্তরিত করে আত্মপুরুষের উদ্দেশ্যে বিশ্বপুরুষের উদ্দেশ্যে আহুতি দিচ্ছেন। এই অগ্নিই আমার জীবনযজ্ঞের নিয়ামক, পুরোধা, হোতার অন্তরে তিনি হোতা, ইদং জ্যোতির অমৃতং মর্ত্যেষু, মর্ত্য মানুষের মধ্যে নিহিত সেই অমৃত-জ্যোতি: নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি। সেই ইচ্ছা অদম্য অ-বাধ্য, অ-ক্লান্ত অভীপ্সা হয়ে জ্বলছে উর্ধ্বশিখ হয়ে প্রতিটি নচিকেতার অন্তরে।

যত্ত্ব পাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্যাস:।
অগ্নিষ্টদ্ হোতা ক্রতুবিদ্ বিজানন্ যজিষ্ঠো দেবা ঋতুশো যজাতি॥ (ঋ. ১০। ২। ৫)

সামর্থ্যে দীন, অপরিপক্ক মনে—
মর্ত্য মানুষ যজ্ঞের মানে জানে না।
অগ্নি সব তা জানেন খুঁটিয়ে
তিনি হোতা, তিনি ক্রতুবিদ্, তিনি যাজকশ্রেষ্ঠ
ঋতুর ছন্দে যজন করেন দেবতাদের...

যার জীবনে যখন যেমন ঋতু সেই অনুসারে দেবতাকে ডাক দিচ্ছেন, নামিয়ে আনছেন, ঘনিয়ে তুলছেন এই কবিক্রতু ইচ্ছা-করি অগ্নি। দেবতার দূত হয়ে আমাদের অন্তরে নিয়ে আসছেন সেই God's mysterious plan, ভগবানের নিগূঢ় ইচ্ছার বার্তা। তাই শ্রীঅরবিন্দ এঁর পরিচয় দিলেন Agni, The Divine Will-force বলে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে তাই হল 'নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি'। পরমপুরুষের ইচ্ছার জ্যোতি, ইচ্ছার দ্যোতি, ইচ্ছার দ্যুতি, ইচ্ছার দূতী এই আত্মদীপ চিদগ্নিকে পুরোভাগে রেখে তারই আলোয় ঋগ্বেদের যজ্ঞযাত্রা সুরু হয়েছে—

অগ্নিম ঈলে, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম ঋত্বিজম।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ (ঋ ১। ১। ১)
অগ্নিকে তুমি আলিয়ে যিনি
যজ্ঞের দেব-ঋত্বিক, হোতা, পুরোধা যিনি
শ্রেষ্ঠ রত্নধা।

এই অগ্নিরই উদ্দীপন সন্দীপন, সমিন্ধন ঋগ্বেদের অষ্টম আর নবম মণ্ডলে প্রতিটি মণ্ডলের সূক্তে।

এই অগ্নিরই উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের ঋষি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির প্রতিধ্বনি করে (১।১৮৯।১) ঈশোপনিষদের শেষ প্রার্থনা—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান।
যুযোধ্যস্মজ্ জুহুরাণম এনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ঈ. ১৮
বিশ্বতাঁতের হরেকরকম টানাপোড়েন, হে দেবতা
অগ্নি, সবই জান
মাঝখান দে' যে পথ গেল সোজা
আপন টানে
আপন বেগের পানে
সে পথ দিয়ে মোদের নিয়ে চল
দূর করে দাও ভেতর থেকে আঁকাবাঁকা ধূর্তপনার পাপ
সমর্পণের নম্র দিয়ে পূজব তোমায় খুঁজব তোমায়
শরের মত তন্ময়তায় বিঁধব তোমায় (সাধব তোমায় বাঁধব তোমায়)
আমরা বারংবার

এই অগ্নিকেই লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের ভৈরব আহ্বান—

আগুন আলো আগুন আলো
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো...
আমার সত্যমিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও
আমায় আনন্দে ভাসাও
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি
(তোমার) বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥
সকল বাক্য সকল শব্দ সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ
(তোমার) চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও।

আমার সমস্ত শব্দ, সমস্ত চেষ্টা, স্তব্ধ করে, সকল ভুলে সহজ হয়ে সহজ প্রেমে দেবতার ইচ্ছাকেই, অগ্নিকেই যখন জ্বালিয়ে তুলি অন্তরে, তখন তাঁর বাণী শুনতে পাই, তারি নাম শ্রুতি, তারি নাম বেদ, তারি নাম মন্ত্র, তারি নাম বাক্। সত্যিকারের বাক জাগে এই অগ্নিরই প্রেরণায়। এই অগ্নিশিশুই আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন সেই পরম শৈশবকে, সেই বন্ধমুক্তির সংস্কারহীন সহজকে। এই আগুনকে, এই দিব্য-ইচ্ছাকে জ্বালিয়ে তোলা আর জ্বালিয়ে রাখা—এই হল যজ্ঞ। An unreserved self-giving to the Eternal (*Synthesis of Yoga*, p. 123), তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ সকল কর্মমাঝে—এই হল সে যজ্ঞের সাধন। A spiritual union with the highest—সেই উৎ-তম পুরুষের সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া—এই হল সে যজ্ঞের সিদ্ধি। তখন জীবন হয় সেই পূর্ণেরই উদ্দেশ্যে পূর্ণাহুতি—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ-ও ভরা
এঁ-ও ভরা
উপচে ভরা পড়ছে ভরা একি।
ভরার থেকে ভরা নিলে
ভরা-ই থাকে বাকি!

সেই পূর্ণকুম্ভে আপন আপন জীবনকুম্ভ ভরতে চলেছি আমরা সবাই। যাঁরা সে পথের সাথী ঘাটের সাথী তাঁদের সবাইকেই যেন সাধ্যমত জলাঞ্জলি দিই, যেন কাউকেই জলাঞ্জলি না দিই। নাধহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। আমি যেন বৃহৎকে উড়িয়ে না দিই। বৃহৎ যেন আমাকে উড়িয়ে না-দেন। সেই বৃহৎ বিশ্বকর্মা যেন আমাকে উড়িয়ে দেন তাঁর হাতের রঙীন সুতোয় বাঁধা ঘুড়ির মতো মহাকাশে মহাপৃথিবীতে মহানন্দে স্ব-ছন্দে।

সুধীরকুমার সরকার

সমীরকান্ত গুপ্ত

সুধীরকুমার সরকার ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিহার প্রদেশের সাহেবগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার পাংসা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম প্রসন্নকুমার সরকার, মাতার নাম ভগবতী দেবী। সুধীরকুমারের বাল্যজীবন কেটেছে খুলনায়—পিতা প্রসন্নকুমার প্রথমে সাহেবগঞ্জে এবং পরে বদলি হয়ে খুলনায় আসেন সরকারী হাসপাতালে সহকারী ডাক্তারের পদে। সেখানকার জেলা স্কুলে তাঁর তরুণ ছাত্রজীবনের দিনগুলি চলেছিল একটানা স্রোতে। এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ এসে লাগল তাঁর নিশ্চিন্ত জীবনে। তখন ১৯০৬ সাল। তিনি হঠাৎ স্কুল ছেড়ে দিলেন। গ্রেপ্তারের পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেট বালির কাছে যে স্বীকারোক্তি করেন (১১ই মে) তাতে বিদ্যালয় ত্যাগের দু'টি কারণ উল্লেখ করেন—প্রথমত ক্লাসের পরীক্ষায় দুই বিষয়ে ফেল, দ্বিতীয়ত লেখাপড়া তাঁর আর ভালো লাগছিল না, দেশোদ্ধারের আদর্শ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। পিতা প্রসন্নকুমার তখন সাহেবগঞ্জে সুধীরের ভাই নরেন্দ্রকুমারের কাছে সুধীরকে পাঠান। নরেন্দ্রকুমার ভাগলপুরে সহকারী জেলার ছিলেন। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সুধীর সেখানে কোনো চাকুরী নেবেন অথবা নিবিঘ্নে পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সুধীর তখন শুনেছেন দেশমাতৃকার আহ্বান—বিদেশী সরকারের গোলামীতে তাঁর ঘৃণা, ইংরাজের শিক্ষাকলে কালক্ষেপও তাঁর পক্ষে অসহ্য। দিন পনেরো পরেই তিনি আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। 'যুগান্তর' কাগজখানি তখন দেশপ্রেমের ধ্বজা উড়িয়ে চলছিল। এই কাগজের জন্য সুধীর যেতেন যুগান্তর আপিসে। সেখানেই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কাগজখানি প্রচারের সহায়তায় তিনি লেগে যান। ক্রমে বিপ্লবীদের বিখ্যাত গুপ্ত আড্ডা মুরারীপুকুর রোডে মানিকতলা বাগানেও সুধীর যাতায়াত শুরু করেন। মানিকতলা বাগানে অধ্যয়ন ও অস্ত্রচালনা শিক্ষার ইতিহাস আজ সর্বজনবিদিত। সুধীরকুমার অবশ্য একটানা বাগানে থাকতেন না, যাতায়াত করতেন।

১৯০৬ সালে মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা স্থানীয় একটি দুর্গাপ্রতিমা ভেঙ্গে দিয়েছিল। হিন্দুদের মনোবল পুনরুদ্ধারার্থে এবং দুর্বৃত্তদের শিক্ষা দেবার জন্য সাতজন যুবক কলকাতা থেকে রওনা হলেন। ১৯০৭ সালের ৭ই এপ্রিল। জামালপুরে মেলা বসেছিল সেদিন। লোকে লোকারণ্য। ছদ্মবেশে সাতজন অসমসাহসিক যুবক সেই জনতার মধ্যে আক্রমণ চালিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধির পরে পালিয়ে উঠে লেন এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে। সেখানে বন্দী হলেন তাঁরা। সেই পুলিশ পাহারা

সুধীরকুমার সরকার

জন্ম : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯ তিরোধান : ২৭শে এপ্রিল, ১৯৭৪

থেকে অন্ধকারের এক অবকাশে অদৃশ্য হলেন সুধীরকুমার। নানা বিপদ পার হয়ে তিনি উঠলেন এক মুচির গৃহে। সেখানে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে ধাতস্থ হলেন। মুচিকে বললেন রাত্রির জন্য আশ্রয় দিতে—বিনিময়ে অর্থ দেবেন লোভ দেখালেন। বলেই ভয় হল তাঁর, টাকার কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সন্ত্রস্ত ও সতর্কভাবে রাত কাটিয়ে চর্মকারের বেশে ও যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হয়ে রাত থাকতে থাকতে তিনি বের হয়ে পড়লেন। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর একটি স্টেশনে পৌঁছে রেলগাড়ীতে চাপলেন। সেখানে শুনলেন যাত্রীরা বলাবলি করছে পূর্বদিনের ঘটনা এবং একজন পলায়িত আসামীর কথা। পরবর্তী স্টেশনে নেমে আবার পায়ে হাঁটা শুরু করলেন। কোথায় এর কূলকিনারা পাওয়া যাবে কে জানে। এমন সময়ে পথিক একজন মিলল যিনি চলেছেন সভায় বা বৈঠকে —সেখানে আলোচ্য বিষয় শ্রীঅরবিন্দ ও স্বদেশীয়ানা। সুধীর ছুটে গেলেন। এই বৈঠকের স্থান মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার ও বিপ্লবীদের বন্ধু আচার্য চৌধুরীদের গৃহ। সেখানে সমাদরে আপ্যায়িত হয়ে সুধীরকুমার মুচির বেশ ছেড়ে ভদ্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়।

সঙ্গীদের ফেলে তিনি পালিয়ে এসেছেন, সুতরাং কী রকম অভ্যর্থনা অদৃষ্টে আছে সে বিষয়ে তিনি কুণ্ঠিত ও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সকলেই ধরা পড়েনি, তিনি আত্মরক্ষা করে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন—সেজন্য দলের সমাদর পেলেন, তিরস্কারের বদলে পুরস্কার হিসাবে তিনি একেবারে শ্রীঅরবিন্দের পরিচর্যার কাজে প্রমোশন পেলেন। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ২৩ নং স্কটস্ লেনে থাকতেন। এই সময় কিছুকাল একই বাড়ীতে কাছে থেকে যা দেখেছিলেন যা শুনেছিলেন সুধীরকুমার তাঁর এক মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথায়। কলকাতায় থাকতে সুধীরকুমারকে মাঝে মাঝে চন্দননগরে যেতে হত। তাতে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে তিনি বেশ কাবু হয়েছিলেন। স্থান পরিবর্তনে স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেওঘরে বৈদ্যনাথধামে তাঁর শ্বশুরমশায়ের বাড়ীতে যান। সঙ্গে ছিলেন সরোজিনীদিদি, মৃণালিনী দেবী এবং ঠাকুর একজন। দুই তিন সপ্তাহের এই প্রবাস-জীবন বর্ণনা করেছেন সুধীরকুমার—বলা বাহুল্য তাঁর সমস্তখানি মনসংযোগের কেন্দ্র হলেন শ্রীঅরবিন্দ, যাঁর মধ্যে চেষ্টা সত্ত্বেও কখনো তিনি মানুষী বলে চিহ্নিত করার কিছু খুঁজে পাননি।

দেওঘর বাস সমাপ্ত হল। আবার কর্মক্ষেত্র কলকাতা এবং মানিকতলা। বন্ধুক বিভলভারের সঙ্গে ইতিমধ্যে নূতন অস্ত্রের আয়োজন বা সংযোজন হতে চলেছে। বিস্ফোরক বোমার প্রয়োগ। দেওঘরের পাহাড়ে এই প্রথম বোমার পরীক্ষার দুর্ঘটনায় প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রাণ দিয়েছিলেন। আহত উল্লাসকরকে নিয়ে বারীন্দ্র ফিরে গিয়েছেন কলকাতা। দ্বিতীয় দিনেও তেমনি অবিকৃত পড়ে ছিল দেহ। তৃতীয় দিনে উপেন্দ্রনাথ ও সুধীরকুমার এসেছিলেন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে—সেদিন প্রফুল্লর দেহ উধাও, কোথাও কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ১১ই চন্দননগরে বোমার উপর এবং ৩০শে মজঃফরপুরে

কিংস্‌ফোর্ডের উপর বোমার আক্রমণে প্রতিপক্ষ ইংরেজ শাসকের প্রতি-আক্রমণ ত্বরান্বিত হল। গ্রেপ্তার ঘনিয়ে আসছে অনেকেই বুঝতে পারছিলেন। সুধীর খুলনায় চলে এলেন, ভেবেছিলেন সেখান থেকে সুন্দরবনে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকবেন। সেই দুর্গম অরণ্যে তাঁকে পাকড়াও করা দুরূহ ব্যাপার। তার আগেই সামসুল হুদাখান গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সহ খুলনাতে হাজির। তিনি আর নিপাত্তা হবার প্রয়াস না করে চাকুরে বাবা ভাইয়ের অবস্থা চিন্তা করে ধরা দিলেন (১০ মে, ১৯০৮)।

বিখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলার আসামীরা ঠিক এক বছর বন্দী ছিলেন (মাণিকতলায় গ্রেপ্তার ৬ই মে, ১৯০৮—বীচক্রফ্‌টের রায় ৬ই মে, ১৯০৯)। জেলে শ্রীঅরবিন্দের এক আলেখ্য এঁকেছেন সুধীরকুমার—যেমন তাঁকে দেখেছেন সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যে বাসুদেব স্বয়ং। বিচারে সুধীরের শাস্তি হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হাইকোর্টে আপিলে তাঁর সাজা হ্রাস হল—সাত বছর আন্দামানে বিভীষিকাময় দ্বীপান্তর-জীবন। সুদীর্ঘ সাতটি বছর সুধীর কাটিয়ে এসেছেন পোর্ট ব্লেয়ারে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এই দ্বীপান্তর-জীবনের স্বকীয় ভঙ্গীতে রক্তক্ষয়া করুণ কাহিনী বিবৃত করেছেন।

আন্দামান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করেছিলেন সুধীরকুমার। তাঁর সৌখীন নেশা ছিল বোধ হয় হোবিওপ্যাথি—যার পরিচয় পরবর্তী জীবনে পণ্ডিচেরীতে অনেকেই পেয়েছেন ; তবে দীর্ঘকাল পেশা হয়েছিল Sanitary fittings-র কারবার।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর সুধীরকুমার পুত্রকন্যাসহ বরাবরের জন্য পণ্ডিচেরী চলে আসেন (১৯৪৩)। আশ্রমে হাতেগোড়া কাগজের সূচনায় তাঁর প্রচেষ্টা কম নয়। আশ্রমের মৃৎপাত্র নির্মাণের বিভাগও ছিল তাঁর হাতে। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর অক্লান্ত কর্মসাধনায় ব্যাপৃত কেটেছে তাঁর জীবন। এই বিচিত্র জীবনের ইতি হল ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল।

সুধীরকুমার ছিলেন বোমা বারুদ অগ্নির উপাসক, কিন্তু তাঁর চিত্তাকাশে চন্দ্র ও চন্দ্রিমা কতখানি মাধুর্য ছড়িয়েছিল, হৃদয় কতটা রসাভিষিক্ত করেছিল তার কিছু পরিচয় দিতে চাই। তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খসড়ার মধ্যে থেকে এই একটু দেওয়া গেল—

নীল আকাশের উঠানে চলেছে লুকোচুরি খেলা
তপনে ঘেরিয়া ঘুরিছে ধরিত্রী দিনরাত সারাবেলা,
চাঁদশিশু তাকে ঘিরি নাচে, হাসিভরা মুখখানি—
কোন সে অতীতে শুরু হলো খেলা, কবে শেষ নাহি জানি।
ধরিত্রীর পানে তপনের পানে চাহে চাঁদ হাসিমুখে,
পূর্ণিমা রাতি জ্যোৎস্নার বান ভাসে ধরিত্রীর বুকে,
যবে নাকে পিছু ফেলি আগে গিয়ে চাঁদ তপনের মুখ চায়,
অমা রজনীর গভীর কালিমা ঢাকে মা'র মুখছায়

আবার চাঁদ তপনে লুকোচুরি করে সে কি কৌতুকে—
আপন ছায়ার বসন দেয় টেনে জননীর মুখে,
ধরিত্রী যখন কি কৌতুকে চাঁদে ফেলে নিজ ছায়াখানি
তখন সূর্য চাঁদের গ্রহণ দেখি ভুবনে অখিল প্রাণী ;
দ্যুলোকের এই খেলার উঠানে গ্রহ তারকার মেলা,
যুগ যুগ ধরি চলেছে তাদের লুকোচুরি এই খেলা।

কাব্যরসিক এই সুধীরকুমার আত্মজীবনীর ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত পাতায় রীতিমতো রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন, আলট্রা (Ultra)দের পর্যায়ে পর্যন্ত এসে পড়েছেন, নিরঙ্কুশ লিখছেন—got a queenlike wife ! দান্তে-বেয়াত্রিচের কাহিনীর রেশ তাহলে থেমে যায়নি। আধুনিক কালে ফরাসী যোদ্ধাকবি লুই আরাগঁ তো তাঁর স্ত্রীর নয়নযুগলের উপর গোটা একখানা কবিতার বই-ই লিখে ফেলেছেন—Les Yeaux d'Elsa. এতখানি রোমাঞ্চকর সরস সবুজ চিত্ত নিয়ে সাধের ভারতবর্ষকে তিনি দেখতে পেরেছেন জীবন্ত—

কে বলে না তুমি শুধু জড় নির্বিকার নিষ্ক্রিয় নিশ্চেতন, শুধুই স্থলভূমি ?
মানুষের জীবের মতোই তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ...

এই দৃষ্টি এই অনুভূতি তাঁর নেতা দিশারীকে অনুসরণ করেই প্রাপ্ত, যাঁর কণ্ঠে বেজেছিল এই আহ্বান—

"মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়,
তাহা হইলে ছেলে কি করে ?"

তারুণ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবের বিপুল এক কর্মযজ্ঞে তিনি হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের অনুসঙ্গী, উত্তরকালে সাধনার জীবনেও জুটেছিলেন তাঁর চরণোপান্তে—ধরে নিয়েছিলেন এই পথে আত্মর অভিযানের শ্রেষ্ঠ সূত্রটি—

আমার ধারণায় মা ও শ্রীঅরবিন্দ অভিন্ন...
কোথা থেকে কেমন করে সর্বশিক্ষাদীক্ষায় ভূষিতা মা
এসেছিলেন আর শ্রীঅরবিন্দকে 'তুমি আমার ভগবান'
বলে চিনেছিলেন বলেই তো এতদিন শ্রীঅরবিন্দকে
কাছে সশরীরে পেয়েছিলাম। এই জগদ্ধাত্রী মা...
তাঁকে যেন আমরা আমাদের মা বলে পূজা করে
আবাহন করে নিতে পারি। এই শ্রীঅরবিন্দের গড়া
প্রতিমার পূজা বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলন করুন...

'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' বোধের সেই প্রলয়ক্ষণে এবং উত্তরকালে অধ্যাত্ম-জীবনের পথে অভিযানেও সুধীরকুমারের সতীর্থ ও প্রিয়তম বন্ধু বলেছেন—সুধীর ছিলেন fearlessness personified—নির্ভীকতার প্রতিমূর্তি। অনেক শহীদ অনেক মাহোত্তর নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন—অনন্যসাধারণ মনোবলে তাঁরা আবেগ সংযত করে-

ছেন। সুধীরকুমারের মনে কর্তব্যের সামনে দ্বিধা ভয় ছায়াই ফেলতে পারে নি। আদেশ আর ব্রতসাধনের মধ্যে কিছু বিবেচনার কিছু চিন্তার অবকাশ আছে, তাঁর মনেও হয় নি। শ্রেষ্ঠ সৈনিকের মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য—এই রকম সৈনিকের দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করে সহকর্মী-দের, বিজয় এনে দেয় তার সেনাপতিকে। আলিপুরে বিচারালয়ের পিঞ্জরে হাতকড়ি-বাঁধা সুধীর hand-cuff দিয়েই ইংরেজ প্রহরীর নুড়ু চৌচির করতে উৎসুক। বন্ধুরা বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতেন তাঁকে। এমনই দুর্দমনীয় প্রকৃতি তাঁর।

তোমরা দেখেছ ক্যাপ্টেন মনার স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারা—তার শক্তি সামর্থ্য সাহসের পরিচয়ও অনেক পেয়েছ। আমার চোখের সামনে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার আর একখানি চেহারা ভেসে উঠছে। মালকোঁচার ধরনে এঁটেসেঁটে ধুতি পরা, শাদা টুইলের সার্টের ওপর খয়েরি জ্যাকেট—সেই নেদলেশহীন ঋজু দীর্ঘ দেহ বহন করে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলা কোনো তরুণের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

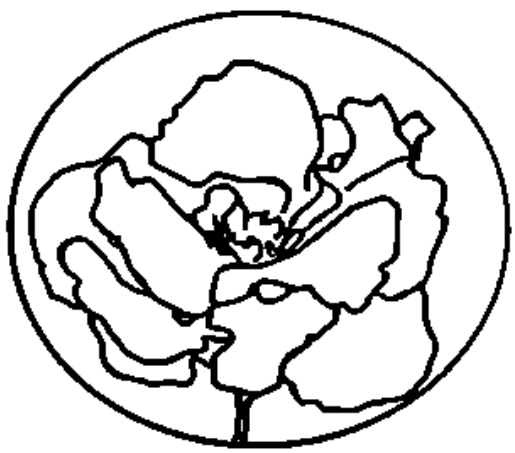

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

মানুষের জীবনের মত গল্পেরও জীবন আছে। গল্পেরও শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য আছে। অবশ্য মানুষের জীবনের বার্দ্ধক্যের সঙ্গে গল্পের বার্দ্ধক্যের তুলনা সব সময় করা চলে না। যাই হোক, আলোচ্য গল্পের শৈশব সুরু হয় দমদম এয়ারপোর্টে, ফ্লাঃ লেঃ মুখার্জিকে স্যালুট করিয়া—শৈশব অবস্থা পার হয়, আম্বালাতে ট্রেনিংএর সময় —যৌবন, কুম্ভিগ্রাম হইতে ভলটি ভেঙ্গিয়ান্স বিমানে—জাপানীদের উপর দিনে ছত্রিশটি (৩৬) ডাইভ বম্বিং করিয়া। এই সময়ই প্রথম মাসের অপারেশনে ভারতে অবস্থিত ভারতের যে কোন বিমান বহর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘন্টা উড়িয়াও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোমা ফেলিয়া—আমাদের স্কোয়াড্রন কৃতিত্ব দেখাইল। এবং এই সময়ই আমাদের স্কোয়াড্রনের নাম দেওয়া হইয়াছিল sheet hot squadron! হ্যারিকেন বিমানে তৃতীয়বার বর্ম্মা অভিযানে প্রৌঢ় অবস্থা আসিল।

এখন আলোচ্য কাহিনীর বার্দ্ধক্যের অবস্থা কেমন হল বলা যাক। অবশ্য 'বার্দ্ধক্য' না বলে—পূর্ণ পরিণতি বললে যেন সঠিক বলা যায়।

আমাদের স্কিটফায়ার বিমানে শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম আসিল আবার বর্ম্মায় যাওয়ার—এবার আর যুদ্ধ নয়—শুধু mopping up অর্থাৎ যেমন, ধান সব কাটিয়া লওয়ার পর—২।৪টে মাঠের মধ্যে যা পড়িয়া থাকে, তাহা খাঁটি দিয়া কুড়াইয়া লওয়া হয়—তেমনি; যুদ্ধে তো জাপানীরা হারিয়াই গিয়াছে, কিন্তু এখনও যে ২।৪টে 'পকেট' এদিক ওদিকে রহিয়া গিয়াছে (যেগুলি আগে নজরে পড়ে নাই) সেগুলিকে নিঃশেষে করিয়া বর্ম্মা হইতে বহিষ্কৃত করা।

এবার বেশী দিন আমাদের বর্ম্মায় থাকিতে হইল না, কারণ আমেরিকানরা হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলার পর জাপানীরা সন্ধি করিল—এতেই জাপানীদের আর mopping up করার প্রয়োজন হইল না।

বর্ম্মা হইতে দমদম বিমান বন্দরে ফেরার পর হুকুম আসিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কোহাট বিমান বন্দরে দীর্ঘদিনের জন্য বিশ্রাম লাভের (বৈমানিকদের ভাষায়—cold storage-এ থাকার জন্য)।

কোহাট বিমানবন্দরে গিয়া আমরা শুনিলাম যে, স্কিটফায়ার বিমানের কাজ আমাদের শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার এক নূতন বিমান দেওয়া হইবে—নাম, টেমপেষ্ট (Tempest)। আরও শুনিলাম—জাপান অধিকার করার পর, পাহারা দিবার জন্য—নানা দেশের বিমান বাহিনীর মধ্য হইতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সাতনম্বর স্কোয়াড্রন নির্ব্বাচিত হইয়াছে। টেমপেষ্ট

হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিমান। এই সময় আরও একটি গুজব শুনিলাম (সেটি বিশ্বাস না করাই ভাল)—জাপানে পরমাণু বোমা বর্ষণ রাশিয়ার মনঃপূত হয় নাই – সে জন্য ইহাতে ইঙ্গ-মার্কিনী মহল ভয় পাইয়াছিলেন যে, রাশিয়া জাপান আক্রমণ করিয়া আমেরিকানদের ঘটাইয়া দিবে। সেই কারণে, আমেরিকানদের রক্ষার জন্য, ভারতীয় সাত নম্বর স্কোয়াড্রনকে শিখণ্ডী-স্বরূপ নির্ব্বাচিত করা হইল। সেই সময় অবশ্য ৪নং স্কোয়াড্রনেও ফিটফায়ার বিমান ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সাত নম্বর স্কোয়াড্রনের দুইজন উচ্চপদস্থ বৈমানিককে বিদ্রোহের অপরাধে গ্রেফ্‌তার করা হইল ও তাঁদের প্রত্যেকের দুই বা তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনার জন্য ৭নং স্কোয়াড্রনকে জাপান পাঠাইয়া দিবার জন্য তথা আমেরিকানদের রক্ষা করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার প্রয়োজন হয় নাই—উপরওয়ালারা ৪নং স্কোয়াড্রনকেই এই সম্মানজনক কার্য্যে জাপানে পাঠান। সেই সময় কোয়াটার্স কম্যাণ্ডার ছিলেন স্বনামধন্য উইং কম্যাণ্ডার মেহের সিং D.S.O. (Distinguished Service Order)। একজন বৃটিশ ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট ছিলেন, ষ্টেশন অ্যাড্‌জুটেন্ট।

কোহাটে প্রায় ৬০।৭০ খানা হ্যারিকেন বিমান আনিয়া জড় করা ছিল। এছাড়া আমাদের স্কোয়াড্রনে ৮।১০খানা স্পিট্‌ফায়ার। আমাদের বিমানগুলি রাখিবার জায়গা—সব বিমানের শেষে ছিল—এ-ব্যবস্থা উইংকম্যাণ্ডার মেহের সিংই করেন। প্রত্যহ বিমান বাহির করিতে ও ঢুকাইতে হইলে ৮।১০ খানা হ্যারিকেন বিমান সরাইয়া তবে একটি স্পিট্‌ফায়ার বিমান বাহির করিতে বা ঢুকাইতে হইত। সেই সময় বিমান সরাইবার জন্য কোনও ট্র্যাকটরের ব্যবস্থাও ছিল না। কাজে কাজেই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার—বৈমানিদেরই এই কাজে কুলি হিসাবে ব্যবহার করা হইত। কোহাটে সেই সময় দুই নম্বর ভারতীয় স্কোয়াড্রনের হ্যারিকেন বিমানগুলিও বিশ্রাম করিতে আসিল। একেই ক্ষুদ্র বিমান বন্দর যেখানে একটি স্কোয়াড্রনের বিমান রাখার মত স্থান ছিল -সেখানে এখন দুইটি স্কোয়াড্রনের বিমান, তার উপর ৭০।৮০ খানি বাড়তি বিমান। প্রত্যহ একটি বিমান বাহির করিতে ও ঢুকাইতে এক মহাসংকট উপস্থিত হইত। একদিন, কয়েকখানি হ্যারিকেন বিমান সরাইয়া স্পিট্‌ফায়ার বিমান বাহির করার রাস্তা খোলা রাখা হইয়াছে, এমন সময় দুই নম্বর স্কোয়াড্রনের একটি হ্যারিকেন বিমান উড়িবার জন্য তাহার ইঞ্জিন চালু করিল। ইহার ইঞ্জিনের স্লিপ্‌ষ্ট্রীমে (slip stream) সম্মুখ বিমানগুলির মধ্যে একটি চলিতে আরম্ভ করে। সেটির চলা বন্ধ করিতে না করিতেই ইহা আরেকটি বিমানের উপর গিয়া পড়ে। এই সংঘর্ষের ফলে দুইটি বিমানই একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই খবর ষ্টেশন কম্যাণ্ডারের কাছে পৌঁছিতেই তিনি সাত নম্বর স্কোয়াড্রনকে যথেচ্ছভাবে গালাগাল দিতে থাকেন। ভারতীয় বৈমানিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের উপর গোরাদের ও তাহাদের দাসানুদাস কয়েকজন ভারতীয় অফিসারদের পক্ষপাতদুষ্ট অত্যাচারের কয়েকটি ঘটনা বলিতেছি।

কোহাটে তখন সাতনম্বর ও দুই নম্বর স্কোয়াড্রন মিলিয়া প্রায় ছয় শত ভারতীয় বৈমানিক ছিলেন আর বৃটিশ বৈমানিক মোটে ষাট-সত্তর জন। এই ষাট্‌-সত্তরজন বৈমানিক বেশীর

ভাগই ছিলেন ষ্টেশন কম্যাণ্ডারের অফিসের কেরাণী। সেই সময় সপ্তাহে একদিন করিয়া বিনা পয়সায় বিমানবহর হইতে সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল। ষ্টেশন সুইমিং-পুলে সপ্তাহে পাঁচদিন যাইবার ব্যবস্থা ছিল। সিনেমা যা কিছু আসিত সবই ইংরাজী সিনেমা। ইহাতে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতীয়দের কোনও অসুবিধা হইত না—কিন্তু উত্তর-ভারতীয়দের ইহাতে ভয়ানক অসুবিধা হইত কারণ তাঁহারা হিন্দী ছাড়া অন্য ভাষা বুঝিতেন কম। এই কারণে তাঁহারা ভীষণ আপত্তি তুলিতেন। তাঁহারা সবসময় ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দী সিনেমার জন্য চেঁচামেচি করিতেন। হয়ত ইংরাজী সিনেমা সুরু হইয়াছে, হঠাৎ দর্শকদের মধ্য হইতে কয়েকজন সমস্বরে We want Hindi cinema বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। এইরূপ পিকেটিং করায় অন্য সব দর্শকদের অসুবিধা হইতে লাগিল। পরে ষ্টেশন কম্যাণ্ডারের অনুরোধে আড্‌জুটান্ট সাহেব মাসে একবার করিয়া হিন্দী সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

কোহাট বিমানবন্দরে ছাউনির ভিতর বৈমানিকদের জন্য একটি সন্তরণক্ষেত্র (swimming pool) ছিল। প্রথমদিকে এই ব্যবস্থা ছিল যে, সকলেই সপ্তাহের পাঁচদিন ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু হঠাৎ আড্‌জুটান্ট সাহেব ক্ষেপিয়া গিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, সপ্তাহে একদিন যখন পুল পরিষ্কার হইয়া যাইবে তখন প্রথম ছয়দিন শুধু গোরা বৈমানিকরা পুলে সন্তরণ করিবে এবং শেষে সপ্তমদিনে ভারতীয়রা যাইবে। অর্থাৎ সারা সপ্তাহের মধ্যে একদিন—যেদিন ভারতীয়রা সন্তরণ করিতে যাইবেন, সেদিন পুলের জল ময়লা হইয়া প্রায় ঘোলা হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া ষ্টেশন কম্যাণ্ডারের নিকট নালিশ করিয়াও কোন ফল হইল না, বরঞ্চ আর একটি উল্টা বিপত্তি হইল। ইংরাজী চলচ্চিত্রের সময় ইংরাজীতে কথাবার্তা সুরু হইতেই উত্তর ভারতীয় দর্শকেরা চেঁচাইয়া উঠিতেন In Hindi please! আড্‌জুটান্ট সাহেব তাহাতে চটিয়া গিয়া একদিন গালাগালি দিয়া উঠিলেন 'Behave like a civilised man' (সভ্য লোকের মত ব্যবহার কর)।

এইরূপ আরেকটি ঘটনা। ফৌজী নিয়মানুসারে—কমিশন্‌ড্ অফিসারকে দেখামাত্র সাধারণ সৈনিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্যালুট করিবে। সেই অফিসার কালা আদমী এবং সাধারণ সৈনিক গোরা হইলেও—এই নিয়ম মানিতে হইবে। জানিনা কেন, আড্‌জুটান্ট সাহেব ইঙ্গিতেই বোধহয়, গোরারা ভারতীয় অফিসারদের স্যালুট করা বন্ধ করিল। এমন কি ষ্টেশন কম্যাণ্ডারকেও স্যালুট করা বন্ধ করিয়া দিল। এই অপমান ভারতীয় বৈমানিকদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু দুঃখের ও আশ্চর্য্যের কথা হইল, ষ্টেশন কম্যাণ্ডার মেহের সিংকে এই কথা পরিষ্কার ভাবে জানানো সত্ত্বেও তিনি ভারতীয়দের প্রতি এই অপমানজনক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিলেন না। ইহাতে ভারতীয় বৈমানিকেরা আরও বেশী অপমানিত হইল। অগত্যা, নিরুপায় হইয়া তাহারা স্থির করিল—বিদ্রোহই (mutiny) এখন একমাত্র উপায়। এই 'বিদ্রোহ' বা

মিউটিনির কথা শুনিলে ইংরাজের পদলেহনকারী আমাদের দেশী শৃগালেরা এখনো ঘাঁৎ-কাইয়া উঠেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়—ইহা মোটেই একটি সাংঘাতিক ব্যাপার নয়। যখন কোন সংস্থার নিম্নতন কর্মচারীরা তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্মচারীদের কোনও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়—তখন ইহাকে 'বিদ্রোহ' বা mutiny আখ্যা দিয়া উর্দ্ধতন কর্মচারীরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে (vested interest) বজায় রাখার জন্য নানা প্রকার ধুম্রা তোলে। যাই হোক ভারতীয় বৈমানিকগণ তাঁহাদের এই 'বিদ্রোহের' কার্যাবলী সুরু করার জন্য সাতনম্বর স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডিং অফিসার স্কোয়াড্রন-লীডার হাসানের নেতৃত্বে জোট বাঁধিলেন। স্কোয়াড্রন-লীডার হাসানের পরিচয় এখানে একটু দেওয়া আশাকরি অনাবশ্যক হইবে না।

স্কো: লী: হাসানের বাড়ী পশ্চিম পাঞ্জাব। ইনি বিলাতে বহুদিন থাকিয়া বিমান উড়াইবার নানা প্রকার কসরৎ শিখিয়া আসিয়াছিলেন—সেই সব কসরৎ বেশীর ভাগ বোমারু বিমানের। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে, তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালীন ষাট-বাষট্টি বার ওয়েলিংটন বোমারু-বিমানে কো-পাইলট হিসাবে বার্লিনের উপর বোমা বর্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। জার্ম্মান জঙ্গী বিমান ও জার্ম্মান বিমানধ্বংসী কামানের হাত হইতে ৬০-৬২ বার বাঁচিয়া ফিরিয়া আসা কম কৃতিত্বের কথা নহে। যদিও এইসব 'কৃতিত্বে'র পিছনে আর একজনের হাত অলক্ষ্যে কাজ করে—যাঁর অপার করুণায় যিনি বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিবার তিনি ফিরিয়া আসিবেনই। আর, ঐ সময়, বার্লিনে বোমাবর্ষণের সময় ইংলণ্ডের শত শত বোমারু বিমান জার্ম্মান বোমা-বিধ্বংসী কামান ও জার্ম্মান জঙ্গী বিমানের ঘায়ে বিধ্বস্ত হইয়াছে। অলৌকিকভাবে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিবার পিছনে দেখা যায় ভগবানের উপর অসীম বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের জোরে যে কোন বিপদের সম্মুখে ধীর-স্থির থাকা। কতবার এইরূপ আমরা দেখিয়াছি যে, বিমানে বিমান-বিধ্বংসী কামান ও লাগে নাই—জঙ্গী বিমানের গুলিও লাগে নাই—তবু পাইলট ধীর স্থির না থাকার জন্য বিপদের সময় ভয়েতেই বিমানসহ ভূপাতিত হইয়াছে। স্কো: লী: হাসানের মধ্যে এই ধীরস্থির ভাব স্বভাবত ছিল।

স্কো: লী: হাসান প্রথমে নিম্নলিখিত সিনিয়রদের একটি মিটিং ডাকিলেন তাঁহার কামরায়—১। ওয়ারান্ট অফিসার এস, দাসগুপ্ত (বাঙ্গালী) ২। সার্জেন্ট সেন (বাঙ্গালী) ৩। সার্জেন্ট বাসু (বাঙ্গালী) ৪। ওয়ারান্ট অফিসার কন্নহীলাল (পাঞ্জাবী) ৫। ফ্লাইট সার্জেন্ট হাস্‌বী (পাঞ্জাবী মুসলমান) ৬। ফ্লাইট্ সার্জেন্ট ইস্‌মাইল (পাঞ্জাবী মুসলমান) ৭। ওয়ারান্ট্ অফিসার সম্পূরণ সিং (পাঞ্জাবী শিখ্) এবং ৮। ফ্লাইট সার্জেন্ট ভাদুড়ী (বাঙ্গালী)। ভারতীয় একনম্বর স্কো: লী: প্রীতম সিং একটু অন্য ধাতু দিয়া গড়া ছিলেন। তাঁহার একটি অভ্যাস ছিল গোরা দেখিলেই নিজের শরীর কোমর হইতে বাঁকাইয়া হাত দুইখানি জোড় করিয়া—'সেলাম সাহেব, হুজুর'—বলিতেন। আমরা সকলেই ইহাতে ভয়ানক অপমান বোধ করিতাম এবং অনেক বলিয়াও

এই বদ অভ্যাস হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারি নাই। তখন পাঞ্জাবীদের মধ্যে এইরূপ একটি দলই ছিল—যারা গোরাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছিলেন। প্রীতম সিং আমাদের ভয় দেখাইতে সুরু করিলেন যে, এইবার বাঙ্গালীদের প্ররোচনায় ভারতীয় বিমান বাহিনী ধ্বংস হইবে। উনি বাঙ্গালীদের সাথে হাত মিলাইবেন না বলিলেন, বিচারের সময় প্রীতম সিং আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেন কিন্তু ফ্লাইট সার্জান্ট হাসনী ও ওয়ারান্ট অফিসার সম্পূরণ সিং—এই যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত রহিলেন।

মিটিংএ পাঞ্জাবী বৈমানিকগণ বেশী বক্তৃতা দিলেন—বাঙ্গালীরা একটু নরমভাবে চুপচাপই রহিলেন। এই মিটিংএর শেষে স্থির হইল যে—ঐ সময় কোহাটে যে দুইটি ভারতীয় স্কোয়াড্রন আছে (সাত নম্বর ও চার নম্বর) তাহার সমস্ত ভারতীয় বৈমানিকেরা একযোগে বিদ্রোহ করিবে—কিন্তু ঘোষণাপত্র বা পত্রিকায় ছাপাইবার দরকার নাই—তবে গ্রুপ হেড-কোয়ার্টার পেশাবরেও উইং কম্যাণ্ডার মেহের সিংকে জানান হইল।

উইং কমাণ্ডার মেহের সিং এই খবর শুনিয়া একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিলেন। ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—করিয়াছ কি! এবার যে আমরা সকলেই বিমানবাহিনী হইতে বহিষ্কৃত হইব। এর পর তাঁহাকে শুধু এইটুকু আমরা জানাইলাম যে, আমরা যাহা করিয়াছি তাহাতো আর শোধরান সম্ভব নয়। সুতরাং এখন ইংরাজরা যদি 'বিদ্রোহী' বলিয়া আমাদের তাহাদের কাছে 'সমর্পণ' করিতে বলে আমরা তখন যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এখন মাননীয় উইং কম্যাণ্ডারের কাছে আমাদের প্রশ্ন হইতেছে—সেই যুদ্ধে তিনি 'বিদ্রোহী' বৈমানিক সৈনিকদের অধ্যক্ষ হইতে রাজি আছেন কিনা। ইহাতে তিনি সোজাসুজি বলিলেন যে, তিনি 'গরীব আদমী' এবং ইংরাজদের খাইয়া পরিয়াই উইং কম্যাণ্ডার হইয়াছেন। সুতরাং তিনি ইংরাজদের পক্ষেই যোগ দিবেন। এর পর আমরা সমস্ত ভারতীয় বৈমানিকরা একযোগে সাত নম্বর স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডিং অফিসার স্কোয়াড্রন লীডার হাসানের নেতৃত্বে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করিলাম।

মিটিং-এর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথমদিন কোহাট ষ্টেশনের সমস্ত গোরা বৈমানিকদের সকলকে ধরিয়া, বিমান বাহিনীর জেল অর্থাৎ গার্ডরুমে বন্দী করিয়া রাখা হইল। এখন কোহাট বিমানবন্দর সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয়দের অধীন হইল। এর পর দুদিন বেশ কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন সকালে দেখা গেল কোহাট বিমানবন্দরটি একটি রেজিমেন্ট ট্যাঙ্ক আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং লাউড্‌স্পীকার মারফৎ আমাদের বলিতেছে—তোমরা আত্মসমর্পণ কর। ইহার জবাবে আমরা কয়েকখানা হ্যারিকেন বিমান স্টার্ট করিতেই ট্যাঙ্ক বাহিনী তখনকার মত সরিয়া পড়িল। তার কয়েক ঘন্টা পর একটি জীপ গাড়িতে ভারতীয় সৈন্য বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার আসিয়া ষ্টেশন কমাণ্ডার মেহের সিংএর সাথে কথা বলিতে চাহিলেন। আমরা এখানে একটি ভুল করিলাম—মেহের সিংকে আমরা তাহাদের সাথে দেখা করিতে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে উইং কম্যাণ্ডার মেহের সিং আমাদের মধ্যে দুজনকে তাঁহার অফিসে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও একটি তাঁওতা

দিলেন যে, সৈন্যবিভাগের অফিসারদের সাথে আমরা যেন কথাবার্তা বলি কারণ তাঁহারাও ইতঃপূর্বে আমাদের সাথে একজোট হইবেন। আসলে আমরা ছয়জন তাঁহার অফিসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফ্‌তার হইয়াছি। এরপর আমাদের ছয়জনের, অর্থাৎ স্কোয়াড্রন লীডার হাসান, ওয়ারান্ট অফিসার শৈলেন দাসগুপ্ত, ওয়ারান্ট অফিসার কস্তুরীলাল, সার্জেন্ট সেন, সার্জেন্ট বাসু ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ভাদুড়ী—কোর্টমার্শাল হইবে বলিয়া ষ্টেশনে কমাণ্ডারের অর্ডার হইল।

এখন পাঠকদের খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হইতে পারে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে এতগুলি ভারতীয় বৈমানিকগণ 'বিদ্রোহ' করিলেন তাহা মাত্র তিনদিনও না টিঁকিয়া এক প্রহসনে পরিণত হইল—কোনও রকম ভাবেই যেন ইহা কার্য্যকরী হইল না। কেন এইরূপ হইল? শুধু স্নেহের সিংএর দাসসুলভ মনোভাবকেই তো ইহার জন্য একমাত্র দায়ী করা যায় না! তাঁহাকে শেষমুহূর্তে বিশ্বাস করা ভুল হইয়াছে ঠিকই—কিন্তু ঐ একটি ভুলেই কি 'বিদ্রোহের' নেতারা ধরা পড়িয়া গেলেন ও সমস্ত ব্যাপারটা একটা নিছক প্রহসনে পরিণত হইল? না কি তখনকার সমস্ত ভারতীয় বৈমানিকদের মধ্যে 'বিদ্রোহ' সুলভ যথেষ্ট মনোবল ছিল না? জেলে থাকাকালীন আমাদের মনেও এই সব প্রশ্ন জাগিয়াছিল কিন্তু কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাই নাই। তবে প্রায় বিশ বৎসর পরে যখন দেশ বিভাগের পর দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তখন একবার স্কো. লী. হাসানের সহিত দেখা হইয়াছিল এবং জানিয়াছিলাম যে তিনি তখন পাকিস্তান এয়ার ফোর্সে আছেন। ইহা শুনিয়া মন একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিল যে কোর্টমার্শালের আসামী বৈমানিক কি করিয়া আবার সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকিতে পারেন! কারণ নিয়মানুসারে একবার যে 'বিদ্রোহের' অভিযোগে কোর্টমার্শাল হইয়াছে তাহাকে কোনও সরকারী চাকুরীতে লওয়া হয় না—বিমানবাহিনীতে তো নয়ই। আজ মনে হয় স্নেহের সিং ছাড়াও আমাদের মধ্য হইতেই কেহ 'নীরজাফর'-এর কাজ করিয়াছিল কিনা কে জানে।

যাহাই হউক আজ আর ওসব ভাবিয়া লাভ নাই—প্রয়োজনও নাই। এইটুকু বুঝিয়াছি যে 'বিদ্রোহ' এক প্রহসনে পরিণত হইবে এবং হাতকড়া লাগাইয়া জেলে যাইব এবং সেখানে নানাজাতের ও ভাবের কয়েদীদের সহিত রাত্রিদিন থাকিয়া তাহাদের কত সুখদুঃখের কাহিনী শুনিব—সেই সঙ্গে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কত তরুণ-বৃদ্ধকে দেখিব যাঁহারা ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য হাসিমুখে কত অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইতেছেন, ইহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা ছিল। ঐ 'বিদ্রোহ' কার্যকারণ স্বরূপ হইয়া আমাদের জেলে এবং এক ভিন্ন রকমের পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া আরেক জগতের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া লইয়া গেল।

টুকরি

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

সাঁওতালী

পরনে রঙীন গামছার মতো কাপড়খানি ;
কপালে উল্‌কী আঁকা ;
কালো সুতো বাঁধা রূপোর হাসুলি গলায় দোলে ;
এক হাতে ওর আঁচলে ঝোলানো আমুর পুঁটুলি ;
আর একহাতে
ফাঁকুড়ে শশায় সাজানো মাটির হাঁড়ি।
একপয়সায় কিনলো কলমী শাক ;
তারই থেকে দুটো লক্‌লকে কচি পাতা
গুঁজে নিল তার কালো খোঁপাটির চুলে।

দুইদিকে

এইদিকে এই কালী মন্দিরে
ছাগল খুঁটিতে বাঁধা।
ঐ দিকে ঐ অবান্বিত মাঠে
কচি ঘাসে চেউ খেলে।

কুমোর বৌ

ছোট ছেলে তার কেঁদে কেঁদে ওঠে ধুলোয় বসে,
কিছুই খেয়াল নেই ;
একমনে বৌ হাঁড়ি ও কলসী বেচে।
বেচা হয়ে গেলে সাবধানে সেই পয়সা গুণে
আঁচলে বাঁধে।
শেষে ছেলেটারে কোলে তুলে নিয়ে
মুখে খায় তার চুমো।
তারপরে দিল এক পয়সার বাতাসা
তার হাতে।

পয়সা

একটি পয়সা কম দিলে বাবু,
দিনমজুরীর পাঁচ গণ্ডার একটি পয়সা কম।
শুধু একবার আনাক খেয়েছি—এত সাজা
তারি লাগি?
হায় বাবু, তুমি বুঝবে কি কোরে,
একপয়সায় শাক্।

নেবুর পাতা করমচা

সাঁওতাল ছেলে বাজায় বাঁশি,
কান-ঢাকা তার ঝাঁকড়া চুলের ফাঁকে
দুলে ওঠে কচি নেবুর পাতা।
সাঁওতালী মেয়ে তারি পাশে পাশে গান কোরে
কোরে চলে,
কালো চুলে তার কচি করমচা দুধে আলতায় রাঙা।

ছিদাম মণ্ডল

ভালো কোরে পরে ফুলপেড়ে ধুতি, ছিটের
পাঞ্জাবীটা।
বুকের বোতামে গোলাপের কুঁড়ি বাঁধে।
পথের ধারেতে পানের দোকানে ফিরে ফিরে পান
কেনে;
যতবার খায় আয়নার কাছে মুখ দেখে ততবার।
আজকে ছিদাম চলেছে শ্বশুর বাড়ি।

ঝি

মাজা চকচকে কাঁসা পিতলের বাসনগুলি
হাতের তেলোয় তোলা,
আর একহাতে বাঁধা কাপড়ের পুঁটুলি দোলে,
বাঁশবাগানের পাতা ঝরা পথে
চলেছে দীঘির ঘাটে।

আরাম কেদারায়

সবুজ রঙের ক্যানভাসে আঁটা কেদারা হেলান দিয়ে
নলিনবিহারী আজ বেলা বারোটায়
ভাবে আর দেখে পাশের বাড়ির
রেলিঙে ঝোলানো শাড়ী।

চাকর

কালো হয়ে গেছে হাত কাটা ফতুয়াটা ;
কোমরে রঙীন গামছা বাঁধা ;
গলায় একটা পিতলে গড়ানো তাবিজ ঝোলানো আছে।
ভুলো কুকুরের কাছাকাছি ঐ উঠোনের এক পাশে
উবু হ'য়ে বসে বেলা তিনটেয়
ভাত খায় বনমালী।

সুভাষিণী

পুরোনো সায়া ছিঁড়ে গেছে একেবারে,
শত তালি দেওয়া ছাতায় জুতোয় পাঞ্জাবীতে ;
তবু সুভাষিণী মুখ তার কোরে থাকে,
চেয়ে পায় নাই দামী ক্যাসানের ব্লাউজ।

পথিক বন্ধু

এই যে হারুদা, কত দিন পরে দেখা।
ছেলে ভালো আছে; মেয়েটা কেমন?
কী কাজ কোরছো ভাই?
আহা। তাই নাকি। মেয়ের বিয়েতে বাড়ি
বন্ধক দেবে?
আচ্ছা হারুদা, এবার নমস্কার।

ঘরছাড়া

গিন্নি বলেন—
আ মলো। পোড়ামুখী,
এত রূপ নিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে
কেন দাসীগিরি করা?
আঁচলের কোণে চোখ মুছে বলে সুধা—
রূপ নিয়ে আমি ঘর ছাড়ি নাই মাগো,
এ পোড়া রূপ আমারে ছাড়ালে ঘর।

পক্ষপাত

বড়বাজারের পগেরাপটীতে
খদ্দের এসে বলে—
"কাপড়ের দাম কত।"
দোকানী বললে—"বারো আনা গজ কেনা,
আপনি বোলেই এগারো আনায় দেবো।"

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone : 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo		
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·০০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী (৩য় সংস্করণ)		যন্ত্রস্থ
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম	,, ,,	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা)	(২য় সং) নীরদবরণ	যন্ত্রস্থ
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	যন্ত্রস্থ
দিব্য জীবনের সন্ধানে	,,	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	**D. P. Chattopadhyaya**	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী বহ
একমাত্র আধ্যাত্মিক মাসিক পত্রিকা

শৃণ্বন্তু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা **শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত**

প্রতি সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ

★ শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ধারাবাহিক অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

★ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সাহিত্য দর্শন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তামূলক একাধিক গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ।

★ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ জীবনালেখ্য
"ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

★ দৈনন্দিন সমস্যাপীড়িত জীবনের পথে দিশারী ও প্রেরণাস্বরূপ শ্রীমায়ের বাণী ও মায়ের আলাপ।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) দশ টাকা।
বৈশাখ সংখ্যা হইতে বর্ষ আরম্ভ।
বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

শৃণ্বন্তু
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

FOR
NEAT PRINTING
AND
QUICK SERVICE

Quick Priting Service

6/2 Ramanath Majumdar Street
Calcutta-9
Phone : 34-2575

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

লীলাস্মরন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী–২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা–১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা–৯

একটি চিত্তাকর্ষক কাব্য গ্রন্থ
বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন—
মূল তামিল থেকে বাংলায় অনুবাদ—

আলবার পদাবলী

সমীরকান্ত গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী, দাক্ষিণাত্যে তামিলদেশে তেমনি আলবারদের 'প্রবন্ধন্' বা পদাবলীর সমার্থক স্তবমালা। যে-কয়জন আলবারের পদসংগ্রহ এই গ্রন্থে তাঁরা হলেন—

তিরুমঙ্গৈ আলবার　　পেরিয়ালবার
কুলশেখরণ আলবার　　অণ্ডাল　　নম্মালবার

বঙ্গানুবাদের ভাষা, তার লালিত্য, শব্দব্যঞ্জনা, ধ্বনিঝঙ্কার, মন্ত্রধ্বনিনুখর কাব্যশৈলী পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

মূল্য : দশ টাকা

—প্রকাশক—
শৃঙ্খল
৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

22 NOV 1972

শ্রীঅরবিন্দ
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগস্ট ১৫, ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজীতে : ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ
সুশোভন রাজ সংস্করণ—১০০০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
সুলভ সংস্করণ—৭৫৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় : শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত (গীতার ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী, পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি) দুর্লভ খণ্ড সহ অন্যান্য রচনার নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬৲ টাকা

আঞ্চলিক ভাষা
হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠি, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCUTTA UNIVERSITY

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৪)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাবিত্রী	...	৫
বিশ্বজনীন অমতার (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দ	৮
বসুমতী মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৯
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১১
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী		১৫
মায়ের সঙ্গে কথা	...	১৯
চুকরী (কাব্য-সংগ্রহ)	নিশিকান্ত রায়চৌধুরী	২৪

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: Nolini Kanta Gupta
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

The only hope for future is
in a change of man's conciousness,
and the change is bound to come
But it is left to the men to
decide if they will collaborat for this
change or if it will have to be enforced
upon them by the power of crashing
circumstances.

So, wake up and collaborate!

blessings

সাবিত্রী

বিশ্বপর্যটিক—ক্ষুদ্রতন মনের দেবলোক

দ্বিতীয় পর্ব—দশম সর্গ

(৮)

আত্মঘাতী দুষ্কারী অপব্যয়
জগৎকে সৃষ্টি করেছে আত্ম-ক্ষয়ের রহস্য-আশ্রয়ে,
তার বিক্ষিপ্ত কর্মাবলী সে ফেলে দিয়েছে শূন্য প্রসারে ;
পরে একদিন এই মহাবল আপনাকে বিশ্লিষ্ট করে ধরবে,
ফিরে আবার সংহত করে আনবে আপন সৃষ্টির বিশাল বিস্তার
তখনই হবে শেষ এই বিপুল অর্থহীন কষ্টশ্রম,
শূন্য শূন্য হয়ে পড়ে থাকবে যেমন ছিল।
এইভাবে সমর্থন পেল, ধারণ করল বিজয় মুকুট নবীন ভাবনা
সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিল এক, হয়ে উঠল তার সকল বিধানের বিধাতা,
স্পর্শ করল গিয়ে মূক শিকড় যত, জাগিয়ে তুলল অবগুণ্ঠিত বিরাট সামর্থ্য সব
সেবায় বেঁধে দিলে অচেতন জিন-পানা যতেক
সুষুপ্ত যারা, ব্যবহারে যাদের না, জড়ের অজ্ঞান আত্মবিস্মৃতিতলে।
সব কিছু যথোপযুক্ত, অনমনীয়, নিঃসংশয়।
কিন্তু যখন জড়ের সনাতন স্থাণু পাদপীঠে
উঠে দাঁড়াল অখণ্ড মূর্তি এক দৃঢ়, পরিচ্ছিন্ন, বিঘ্নাতীত,
সব কিছু তখন স্খলিতপদে সরে দাঁড়াল গিয়ে এক সংশয়-সাগরে ;
এই নিরেট ব্যবস্থা গলে গেল অন্তহীন চঞ্চল প্লাবনে
পৌঁছিল গিয়ে সে রূপের স্রষ্টা অরূপ শক্তির সাক্ষাতে ;
অকস্মাৎ স্পর্শ এসে যায় যত অদৃশ্যের ;
বিদ্যুল্লেখা এক অনাবিষ্কৃত সত্য হতে
উদ্‌ভ্রান্ত করে তার নয়নযুগল খর-রশ্মির স্পর্শে,
ছেদ এনে দেয় জ্ঞেয় আর জ্ঞাতের মাঝে,
অবশেষে দেখে সে সকল জ্ঞান তার যেন অজ্ঞান।
সৃষ্টি আবার দেখা দিল অপরূপ এক রচনারূপে,
যাদুক্রিয়া এক যাদুময় আকাশতলে,
অবোধ্য মায়াসৃষ্টির গভীর গহ্বর যত,
উৎস তার হারিয়ে গিয়েছে অনির্বচনীয়ের মাঝে।

আবার তবে দাঁড়ায় সম্মুখে আমাদের শূন্য অজ্ঞেয়।
মান-মূল্য সব গুলিয়ে গেল, এলো ভাঙ্গন শেষ পরিণামের,
তার ধ্বংস-ক্রিয়ার ঘোর আঘাতে
হারিয়ে গেল তার পরিচ্ছিন্ন, সুরক্ষিত, সুগঠিত ভুবন।
রয়ে গেল অণুতম পরিমাণের নৃত্য, আকস্মিকের বিকিরণ
বিরাট বলবেগের ঘূর্ণায়মান ঘূর্ণিগর্ভে :
গতি অন্তহীন সীমাহারা মহাশূন্যে
গড়ে চলে রূপ চিন্তা না ক'রে, লক্ষ্য না রেখে :
প্রয়োজন আর হেতু হল নিরাকার প্রেতছায়া ;
জড়বস্তু হল শুধু ঘটনামাত্র বিশ্বসত্তার প্রবাহে
নিয়ন হল অন্ধশক্তির যন্ত্রচালিত অভ্যাস।
আদর্শ, নীতিশাস্ত্র, ব্যবস্থা যত কিছুরই সিংহাসন কিছু রইল না,
ধ্বসে পড়ল সবরে অথবা বেঁচে রইল অনুমতি বিনা ;
সব পরিণত হল প্রলয়-বিশৃঙ্খলায়, সংকীর্তি আর সংঘাত আর সংঘর্ষ।
তাবনা সব সংগ্রামী হিংস্র ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনের উপর ;
অরাজকতাকে দাবিয়ে রাখে কঠোর নিপীড়ন এক,
আর স্বাধীনতা হয়ে পড়ে ছায়ামূর্তির নাম :
সৃষ্টি ও প্রলয় নৃত্য করে চলে দুটিতে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে
বিদীর্ণ কম্পিত পৃথিবীর বক্ষ 'পরে ;
মহাকালীর তাণ্ডবে নেতে গেল বিশ্বসৃষ্টি।
এইভাবে হয় তার পরিসমাপন, ডুবে যায়, ছড়িয়ে পড়ে শূন্যের প্রসারে,
হাত বাড়ায় আশ্রয় তরে, চায় মাটি দাঁড়াবার জন্য,
চেয়ে দেখে শুধু আণবিক অসীমা এক,
বিরল-বিন্দু বিকীর্ণ সর্বত্র অধস্তন বিশ্বসত্তা
তার 'পরে ভাসে নিরেট এই জগতের প্রকট আনন।
রয় সেখানে শুধু ঘটনাবলীর ক্রিয়াক্রম
আর প্রকৃতির সুনন্য নিত্যনব রূপায়ণ
আর, নৃত্যশক্তিবলে শক্তিমান হনন করে অথবা করে সৃষ্টি
সেই বিদীর্ণ অদৃশ্য পরমাণুর সর্বজয়ী শক্তি।
এক সম্ভাবনা—হয় ত বা রয়েছে এখানে শক্তি সেই
মানুষকে মুক্তি দেবে যে পুরাতন অক্ষম সব উপায় হতে,
মানুষকে রেখে যাবে একচ্ছত্র নেতারূপে পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে।
বিচারবুদ্ধি তখন আদি শক্তিকে অধিকার করতে পারে
আপনার রথ চালিয়ে দিতে মহাকালের পথ 'পরে।
সবই তখন আত্মনিয়োগ করতে পারে মনোময় জাতির সেবাকল্পে,

স্থাপন করবে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রে নিরঙ্কুশ শৃঙ্খলা,
সার্বজনিক আদর্শে এক ছেলে গড়বে বিশ্ববন্ধু,
আর সমাজে তুলে ধরবে একটা যথাযথ নির্দোষ যন্ত্র।
বিজ্ঞান আর বিচার তখন অন্তঃপুরুষকে অবহেলা করে
মন্থন করে একটা শান্তিময় সমাকার জগৎ ধরে দিতে পারে,
যুগ-যুগান্তের আকৃতিকে আকণ্ঠ ভরে দিতে পারে স্থূল সত্য দিয়ে,
আর মনের উপরে চাপিয়ে দিতে পারে একাকার চিন্তাধারা,
অন্তশ্চেতনার স্বপ্নকে বেঁধে দিতে চায় জড়ের যুক্তিবিধি দিয়ে,
মানুষ যেন হয়ে ওঠে যুক্তিপরায়ণ পশু,
আর তার জীবন হয় সন-তন্ত্র-যন্ত্রের পাশিপাটা।
এই হবে প্রকৃতির চূড়া ছায়াচ্ছন্ন এক গোলকের উপরে,
যুগভরা সুদীর্ঘ প্রয়াসের মহা পরিণতি,
পৃথিবীর বিবর্তন পূর্ণসিদ্ধ, ব্রত তার উদ্‌যাপিত।
হতে পারত এরকম চিন্ময়পুরুষ যদি পড়ত ঘুমিয়ে;
মানুষ তখন হয়ত তৃপ্তিলাভ করত, শান্তির মধ্যে বসবাস করত,
প্রকৃতির অধীশ্বর, চায় সে প্রকৃতির ক্রীতদাস হয়ে কাজ করে চলবে মানুষ,
বিশ্ব-বিশৃঙ্খলা নিরেট নিয়মবন্ধে পরিণত হবে,—
হতে পারত যদি রুদ্রহৃদয় প্রাণশক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠে না দাঁড়াত,
আত্তর ভগবানের না থাকত যদি বৃহত্তর পরিকল্পনা।
তবে বহুরূপ বিশ্বপুরুষের;
স্পর্শ এক দিতে পারে নবরূপ বাহ্য স্থির প্রতিমায়।
অকস্মাৎ গতির মুখ ঘুরে যেতে পারে, দেখা দিতে পারে পন্থা এক,
বৃহত্তর মন দেখতে পারে বৃহত্তর সত্য,
অথবা হয় ত দেখতে পাব, সব ব্যর্থ যখন,
অন্তরে আমাদের লুকান রহস্য পূর্ণ নবরূপের।
আমাদের দিন সব অবলুণ্ঠিত যে মৃত্তিকা 'পরে, সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে
পার্থিব চেতনার পরিণয় হতে পারে সূর্যের সঙ্গে,
আমাদের মর্ত্যজীবন উড়ে চলতে পারে চেতনার পাখায় ভর করে,
আমাদের সান্ত চিন্তাবলী অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

বিশ্বজনীন অবতার

শ্রীঅরবিন্দ

ধ্যানী সূর্য্যের মত আছে এক প্রজ্ঞা,
হৃদয়-দহরে জ্বলে সুখসার শুভ্র বহ্নি যেন,
বিশ্বছিয়া এক মিলিয়ে ধরে সকলের ছিয়া,
রাজে নীরবতা আনন্দের উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখরে।

আপন জানু'পরে প্রশান্তি দেয় দোল নিয়তিরে শিশু যেন,
উদার অনুকম্পা আনত হয়ে পৃথিবীরে করে আলিঙ্গন,
সাক্ষী সে বেঁধেছে নীড় আমাদের গোপন অন্তস্তলে,
ভগবান অবতীর্ণ মানুষী তনুর মাঝে।

নন আমাদের পর্দা যেন উজ্জ্বল ঝলমল জ্যোতির্লেখা 'পরে,
বল যত, তারা অমর দেবশক্তির ব্যঙ্গ-অনুকৃতি,
পুলক আমাদের স্বপ্নালু পথিক যেন চিরন্তনের পথে,
নিমেষের ক্ষণ-সৌন্দর্য্য হয় তার শিকার-লক্ষ্য।

হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার 'পরে শুধু রয় অঙ্কিত
বহ্নিময় বাক্—সর্ব্বজয়ী গুপ্ত নাম।*

* The Universal Incarnation—Sri Aurobindo (C.E.Vol. 5. p. 138)

মধুময়ী মা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

[৬]

(ক)

মধুময়ী মা,

শ্রীঅরবিন্দ যখন দেহরক্ষা করলেন তখন তুমি তাঁর কাছে তোমার যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলে এই তা—

"ভগবান, আজ সকালে তুমি আমাকে কথা দিলে বিনা দ্বিধায়—তুমি দেহত্যাগ করেছ বটে কিন্তু আমাদের ত্যাগ কর নাই—তুমি পূর্ব্বেরই মত পৃথিবীর অন্তর্গত হয়ে আছ পৃথিবীর আবহাওয়ায় রয়েছ, শুধু নির্ব্বিকার কর্ম্মমুক্ত চেতনা হিসাবে নয়, কর্ম্মকৃৎ শক্তিরূপে রয়েছ এবং থাকবে যতদিন পৃথিবীতে তোমার কর্ম্ম শেষ না হয়, মানুষ পৃথিবী রূপান্তরিত না হয়—তোমার এই অপার করুণার যোগ্য যেন হই—এখন থেকে আমাদের প্রতি অণু-পরমাণু যেন তোমার সেবায় একনিষ্ঠ থাকে যতদিন না তোমার কর্ম্ম সমাপ্ত হয়—"

এই প্রার্থনা আজ আমাদের প্রাণের প্রার্থনা ভগবানের কাছে ভগবতীর প্রার্থনা আজ ভগবতীর সন্তানেরা ভগবতীর কাছেই নিবেদন করছে তুমি আমাদের ছেড়ে যাও নি, তোমার কাজ তুমি সমানে করে চলেছ, আমাদের সকলকেই তোমাদের সঙ্গে সমানে নিয়ে চলেছ।

(খ)

নব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, মা তার বাকী কিছু রাখেন নি। স্পষ্টাক্ষরে মা বলেছেন—il est né, né, né, le nouveau monde—নূতন জগৎ জন্ম নিয়েছে, নিয়েছে, নিয়েছে—পূর্ণ কলেবরেই। তবে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে তা রয়েছে, কারণ সামনে রয়ে গিয়েছে পুরাতন জগৎটি তার জীর্ণ কংকাল-প্রায় দুঃস্থ দেহ নিয়ে—তার ভিতরেই সে চলাফেরা করছে সন্তর্পণে—কিন্তু নিশ্চিত দৃঢ়পদে—কোন ফাঁক দিয়ে বের হবার জন্য। ভিতর থেকে যেন তার চাপে বাইরের খোলসে ধরেছে ভাঙ্গন ইতিমধ্যেই। তবে যেখানেই বাধা, সেখানেই ভাঙ্গন, যত বাধা তত ভাঙ্গন; যেখানে যত বাধা ক্রমে দূরে সরে যাবে, পথ করে, অনুকূল সুযোগ করে দিতে বাধ্য হবে।

আমরা তবে কি করব? আমাদের কি কর্ত্তব্য এখন? আমরা যদি বাধার দলে নাম লিখাই, তাহলে আমাদেরও হবে বাধাদেরই গতি অর্থাৎ আমাদেরও হবে সমবেত ধ্বংস; কিন্তু আমাদের যদি সুবুদ্ধি হয়, ঘুরে দাঁড়াই, নূতনের স্বপক্ষে নাম লিখাই, তবেই আমাদের

সব দুর্গতি হতে হবে রক্ষা, তবেই আমাদের মুক্তি, তবেই আমাদের সার্থকতা—নূতনের আগমনের সঙ্গে আমরাও নূতন হয়ে উঠব।

মা আরো বলেছেন, নূতনের পূর্ণগঠিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাহাজটি পৃথিবীর তটে এসে লেগেছে—কারা চায়, কারা উঠবে গিয়ে—এই নির্ব্বাচনই নিয়তির নির্দ্দেশ।

(গ)

কিন্তু আমাদের দিক থেকে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেই পাদভূমি থেকে দেখলে ব্যাপারটি অত সহজ স্বাভাবিক মনে হবে না। মা নিজে আমাদের এ বিষয়ে অবহিত করে গিয়েছেন, সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"শ্রীঅরবিন্দের যোগ এমনিতেই গোড়া থেকেই কোনদিন সহজসাধ্য ছিল না; শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথে চলতে গেলে দরকার যোদ্ধা হওয়া। কিন্তু এখন যখন শ্রীঅরবিন্দ আর স্থূলে আমাদের সঙ্গে নেই, তখন যোদ্ধা হলেও যথেষ্ট হওয়া নয়, হতে হবে বীর।

কালের স্রোতে আমরা আরো সরে এসেছি—বর্ত্তমানে অবস্থা আরো সঙ্কটপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দ-হারা আমরা; মাতৃহারাও হয়েছি—স্থূলতঃ অবশ্য—এখন কি করতে পারি আমরা? যোদ্ধা হওয়া যথেষ্ট নয়, বীর হওয়াও যথেষ্ট নয়, হতে হবে আরো বেশি কিছু—

আমি বলছি, আরো উপরে উঠতে হবে, হতে হবে যোগী। যোগী অর্থ—ভাগবত-চেতনা লাভ—ভাগবত-চেতনা অর্থাৎ মায়ের চেতনা—অন্যকথায় ভালবাসায় মায়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া।

যোগী হওয়া শুনতে কঠিন কঠোর, কার্য্যতঃও কঠোর কঠিন—কিন্তু কঠোর কঠিন পথ এড়িয়ে যাওয়ার সুবিধা মা আমাদের দিয়েছেন—তাঁর আঁচল ধরে রইতে অর্থাৎ শিশু বনে যেতে। মায়ের শিশু হওয়াই সকল সাধনার পরিপূরণ, কিন্তু শিশু যদি হতে পারি তবে সেই সঙ্গে যোদ্ধা, বীর ও যোগীর সব চেতনাও আপনি এসে যাবে আমাদের মধ্যে।

মায়ের শিশু হওয়া—এই আমাদের ব্রত, আমাদের সাধনা ও সিদ্ধি।

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

ষোড়শ সূক্ত—৫ম মণ্ডল

১। বৃহদ্বয়ো হি ভানবেঽর্চা দেবায়াগ্নয়ে।
যং মিত্রং ন প্রশস্তিভির্মর্তাসো দধিরে পুরঃ ॥১॥

বৃহৎ—বৃহৎ
বয়ঃ—প্রসার, প্রকাশ
হি—অবশ্য, নিশ্চয়
ভানবে—দীপ্তিমানের জন্য
অর্চা—অর্চনা কর, দীপ্তমন্ত্রে ফুটিয়ে ধর
দেবায়—দেবতার জন্য
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য
যম্—যাঁকে
মিত্রম্—মিত্র
ন—মত, স্বরূপে
প্রশস্তিভিঃ—প্রকাশমন্ত্রের সহায়ে
মর্তাসঃ—মর্ত্যজীবেরা
দধিরে—স্থাপন করেছে
পুরঃ—পুরোভাগে

দ্যুতিময় দেব অগ্নির জন্য ভাস্বর স্তোত্রে প্রকট কর বৃহৎ প্রসার এক, মর্ত্যজীবেরা মিত্রস্বরূপে তাঁকেই সম্মুখে স্থাপন করে তাদের প্রকাশমন্ত্রের সহায়ে ॥১॥

২। স হি দ্যুভির্জনানাং হোতা দক্ষস্য বাহ্বোঃ।
বি হব্যমগ্নিরানুষগ্ভগো ন বারমৃণ্বতি ॥২॥

সঃ—সে
হি—নিশ্চয়
দ্যুতিঃ—দীপ্তির সহায়ে
জনানাম্—জনরাজির

জনানাম্—জনরাজির
হোতা—হোতা, আহুতিদাতা, আহ্বাতা (সায়ণ)
দক্ষস্য—বিচারবুদ্ধির
বাহ্বোঃ—দুই বাহুতে
বি—বিস্তৃত ভাবে সর্বত্র
হব্যম্—নৈবেদ্য
অগ্নিঃ—অগ্নি
আনুষক্—নিরবচ্ছিন্ন, নিরন্তর
ভগঃ—ভোক্তা
ন—যেন, স্বরূপে
বারম্—বরণীয়কে, বরণীয় বস্তুকে
ধৃণুতি—প্রদান করে

তিনি তাঁর দীপ্তিরাজি নিয়ে হয়েছেন জনরাজির আহুতিদাতা, বিচারবুদ্ধির দুই বাহুতে অগ্নিদেব আহুতিকে নিরন্তর ধারণ করে ভোক্তা ভগদেবতারূপে নিয়ে আসেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ॥২॥

৩। অস্য স্তোমে মঘোনঃ সখ্যে বৃত্রশোচিষঃ।
বিশ্বা যস্মিন্তুবিষ্ণি সমর্যে শুষ্মমাদধুঃ॥

অস্য—এর
স্তোমে—প্রতিষ্ঠানযজ্ঞে
মঘোনঃ—পূর্ণতাময়ের
সখ্যে—সখ্যে, সাহচর্যে
বৃত্রশোচিষঃ—ক্রমবর্ধমান বর্ধিষ্ণু দীপ্তিময়ের তেজোময়ের
বিশ্বা—বিশ্বজন, বিশ্ববস্তু
যস্মিন্—যার মধ্যে
তুবি-স্বনি—বহুল স্বনিময়
সম্—সম্যক
অর্যে—আর্যের, মহাকর্মীর মধ্যে
শুষ্মম্—সামর্থ্যকে
আ-দধুঃ—প্রতিষ্ঠিত করেছে

এই পূর্ণতা-দেবতার প্রতিষ্ঠানযজ্ঞে এই বর্ধমান তেজোময়ের সাহচর্যে যাঁর বহুলকণ্ঠে রয়েছে বিশ্বের বস্তু সেই আর্য্য কর্মীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হল মহাবল ॥৩॥

৪। অধাহাগ্ন এষাং সুবীর্যস্য সংহনা।
তমিদাহুঃ ন রোদসী পরি শ্রবো বভূবতুঃ ॥৪॥

অধ—তাই, সুতরাং
হি—নিশ্চয়, ফলতঃ
অগ্নে—হে অগ্নি
এষাম্—এদের
সুবীর্যস্য—মহাবীর্যের
সংহনা—মহত্বে
তম্—তাকে
ইৎ—নিশ্চয়
মঘবন্—মহাবলীকে
ন—যেন
রোদসী—স্বর্গমর্ত্য
পরি—চারিদিকে নিয়ে
শ্রবঃ—শ্রুতিশক্তি, সাক্ষাৎ জ্ঞান-প্রেরণা
বভূবতুঃ—হয়ে উঠেছে

হে অগ্নি, এখন তবে এদের মহাবীর্যের মহত্বলাভের ফলে সেই মহাসুরের চারিদিকে স্বর্গমর্ত্য হয়ে উঠেছে যেন শ্রৌতজ্ঞান সাক্ষাৎ অনুপ্রাণিত জ্ঞান ॥৪॥

৫। নূ ন এহি বার্যমগ্নে গৃণান আ ভর।
যে বয়ং যে চ সূরয়ঃ স্বস্তি ধানহে সচোতৈধি নো বৃধে ॥৫॥

নূ—এখন
নঃ—আমাদের কাছে
আ-ইহি—এহি—এসে দাঁড়াও, এসে উপস্থিত হও
বার্যম্—বরণীয় বস্তুকে
অগ্নে—হে অগ্নি
গৃণান্ঃ—স্তুত হয়েছ তুমি, আমাদের বাক্যে প্রকট হয়েছ তুমি
আ-ভর—নিয়ে এস এখানে
যে—সেই যে
বয়ম্—আমরা
যে—সেই যে

চ—আর
সূরয়ঃ—দিব্যদ্রষ্টা
স্থাতি—সম্যক স্থিতি, সুখময় স্থিতি
ধাময়ে—স্থাপন করি
সচা—একসঙ্গে সকলে
উত—আর, অধিকন্তু
এধি—এস
পৃৎসু—সংগ্রামে
নঃ—আমাদের
বৃধে—সমৃদ্ধির জন্য

হে অগ্নি, আমাদের মন্ত্রে তোমাকে আমরা প্রকট করেছি, এস তবে এখন, নিয়ে এস আমাদের বরেণ্যবস্তুকে, এই আমরা আর যারা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, আমরা সকলে একসঙ্গে স্থাপন করব আমাদের সুখময় স্থিতিকে, এস তুমি আমাদের সকল সংগ্রামে আমাদের সমৃদ্ধির জন্য ॥৩॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

রোগব্যাধি ও ডাক্তারিশাস্ত্র সম্পর্কে

(মাঝে মাঝে মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

রোগকে আরোগ্য করা তো ভালোই, কিন্তু নিবারণ করা আরো ভালো।
—শ্রীমা

৩৮৬—রোগকে অযথা প্রলম্বিত করাতে মৃত্যু হয় যদিও তা অপরিহার্য নয়, কারণ রোগীর মনই সেখানে রোগের চিন্তা বাড়িয়ে মৃত্যুর সহায়ক হয়।

মা এটি খুবই খাঁটি কথা।

৩৮৭—ডাক্তারিশাস্ত্র আশীর্বাদ স্বরূপ না হয়ে বরং অভিশাপ স্বরূপই হয়েছে। যদিও অবশ্য ওর দ্বারা রোগের মহামারী নিবারিত হয়েছে আর শল্য চিকিৎসারও অপূর্ব উন্নতি হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে ওতে ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যশক্তিকে খর্ব ক'রে দিয়ে লোকের ব্যাধিপ্রবণতাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে; তার ফলে মানুষের দেহে ও মনে কেবল রোগভীতি ও একটা ঔষধনির্ভরতা এনে ফেলেছে ওতে আমাদের শিখিয়েছে যে স্বাভাবিক নিজস্ব স্বাস্থ্যগুণের উপর কোনো আস্থা না রেখে যত সব ধাতব ও ভৈষজ কৃত্রিম ও বিস্বাদ ঔষধগুলির উপরেই একান্ত নির্ভরতা রাখতে।

৩৮৮—বিশেষ কোনো রোগে ডাক্তারে একটা কিছু ঔষধ নির্বাচন ক'রে নেয়, তা কখনো বা কাজ করে আর কখনো বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তার মধ্যে কেবল সাফল্য-গুলিকে ধরেই শাস্ত্র তৈরি হয়, ব্যর্থতাগুলোর হিসাব হয় না।

মা এটি চমৎকার কথা।

৩৮৯—বর্বর মানুষরা ঝাড়ফুঁকের গুণীদের উপর অন্ধবিশ্বাস ক'রে থাকে, তাই দেখে আমরা হাসি। কিন্তু সভ্য মানুষদের ডাক্তারদের উপর অন্ধবিশ্বাস কি তার চেয়ে কিছু কম? ঝাড়ফুঁকের পরে রোগ সেরে গেল দেখে তাই তারা ওরূপ বিশ্বাস স্থাপন ক'রে থাকে। আর সভ্য মানুষও যখন দেখে যে ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশনের ওষুধ খেয়ে প্রায়ই রোগ সারছে তখন সেইজন্যই তারাও ডাক্তারের ওষুধের উপর বিশ্বাস রাখে। তাহলে এর মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

মা: অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলতে হয় যে আসলে রোগীর বিশ্বাসেই রোগ সারে। তেমনি যদি মানুষের ভগবৎ কৃপার উপরেই ঐরূপ বিশ্বাস থাকতো, সেই পূর্ণ বিশ্বাসের ফলে অনেক রোগই এমনি আরোগ্য হতো। ১৩-৩-১৯৭০

৩৯০—উত্তর অঞ্চলে ভারতের দুর্ধর্ষ রাখাল জ্বরে আক্রান্ত হলে নদীতে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে ঘন্টাখানেক বা তারও বেশিক্ষণ থেকে দিব্য অব্যাহতি ও সুস্থ হয়ে উঠে আসে। কিন্তু কোনো শিক্ষিত মানুষ যদি তাই করে তাহলে সে তো মারাই যাবে। তার কারণ এ নয় যে ওতে কেউবা সারে আর কেউবা মরে, কিন্তু আমাদের জীবনে মিথ্যা অভ্যাসগুলিরই ফলে মনের ক্রিয়াতে আমাদের দেহের ঐরূপ মারাত্মক পরিণতি হয়েছে।

৩৯১—ওষুধের নিজস্ব গুণ থেকে যত না কাজ হয় তার চেয়ে বেশি কাজ হয় রোগীদের ডাক্তারের দেওয়া ওষুধগুলির উপরে বিশ্বাসের ফলে। কিন্তু নিজেদের স্বাভাবিক আরোগ্য-শক্তির উপরে যে বিশ্বাসকে তারা হারিয়েছে তার স্থান ঐরূপ বিশ্বাস কখনই পূরণ করতে পারে না।

৩৯২—যে কালে রোগের জন্য ওষুধ মাত্রই খুব কম ছিল, সেকালেই মানুষেরা সব চেয়ে বেশি সুস্থ ছিল।

৩৯৩—পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি সুস্থ ও সবল অবস্থাতে থাকতে দেখা গেছে আফ্রিকার অসভ্য বন্য মানুষদের, কিন্তু কত কাল আর তাই থাকবে যখন সভ্য জগতের বিকার-প্রাপ্ত মনের ছোঁয়াচ লেগে তাদের মধ্যেও দেহচেতনা কলুষিত হতে চলেছে?

না শ্রীঅরবিন্দের এই কথাগুলি প্রায় দিব্যবাণীর মতো। মানুষেরা যখন আবার তাদের মানসিক বিকার থেকে মুক্ত হবে তখনই অতিমানস চেতনা পেয়ে তাদের হারানো স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আবার ফিরে পাবে।

১৪-৩-১৯৭০

৩৯৪—আমাদের পক্ষে উচিত হবে রোগের আরোগ্য ও নিবারণের জন্য ঈশ্বরদত্ত আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যশক্তিকে কাজে লাগানো। কিন্তু গ্যালেন এবং হিপোক্রিটিস্ ও এঁদের অনুবর্তীরা ওষুধগুলির যে কারখানা খুলে দিয়েছে আর বিচিত্র ল্যাটিন নামের যে দুর্বোধ্য জটিল তালিকার সৃষ্টি করেছে সেইগুলোকেই আমরা জীবনরক্ষার মহামন্ত্র করে নিয়েছি।

৩৯৫—ডাক্তারি শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে তো ভালোর জন্যই, আর ডাক্তাররাও নিশ্চয়ই মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী, আর তাদের অধিকাংশই বস্তুত আত্মত্যাগীও হয়; কিন্তু তাদের সদুদ্দেশ্য থাকলেও যখন তারা অজ্ঞানই, তখন তাদের দ্বারা অনিচ্ছাকৃত অনিষ্ট হওয়া কেউ কি ঠেকাতে পারে?

৩৯৬—সব ওষুধই যদি নিশ্চিত সুফলদায়ক হতো আর যদি ডাক্তারি সকল থিওরি নির্ভুল হতো, তবুও তাতে আমাদের নষ্ট স্বাস্থ্যকে ও স্বাভাবিক জীবনীশক্তিকে কি আমরা ফিরে পেতাম? বিষবৃক্ষ যদিও সব দিক থেকে নিখুঁত হয় তথাপি সে বিষাক্ত।

৩৯৭—আমাদের ভিতরকার যে অন্তরাত্মা সেই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে সেরা ডাক্তার, এবং দেহের পক্ষে তার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করলে সেই হবে একমাত্র সর্বব্যাধি-বিনাশক চিকিৎসা।

৩৯৮—অন্তরস্থ ভগবানই হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ। তোমার রোগ-ব্যাধিতে তুমি কি পারবেনা মৃত্যুভয়কে পরিত্যাগ করে তাঁরই হাতে সব ছেড়ে দিয়ে থাকতে? কেবল পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য নয়, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস নিয়ে সম্পূর্ণ ধীর স্থির ও অটল হয়ে থাকতে?

৩৯৯—ডাক্তারের নীতি হলো বিশ হাজার রকমের সাবধানতার নির্দেশ দিয়ে স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা, কিন্তু ভগবানের নির্দেশ তেমন নয়, দেহের পক্ষেও নয় আর স্বাভাবিক প্রকৃতির পক্ষেও নয়।

মা মানুষের মনের দাসত্বই তাদের ক'রে রেখেছে ডাক্তারের এবং ওষুধের ক্রীত-দাস। এর ফলে রোগসংখ্যাও যত বাড়ছে তার বিভীষিকাও তত বাড়ছে। এ দাসত্বকে এড়ানোর একমাত্র উপায় পূর্ণ সমর্পণের দ্বারা নিজের মনের দাসত্বমুক্তি, কেবল ভগবানেরই প্রভাবের দিকে নিজেকে খুলে রাখা। ১৫-১-১৯৭০

৪০০—এককালে মানুষ স্বভাবতই সুস্থ থাকতো এবং এখনও মানুষকে প্রভাব-মুক্ত করে ছেড়ে দিলে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে কিন্তু এখনকার ডাক্তারি শাস্ত্র ও ওষুধগুলি নিত্য পিছু লেগে থেকে আর অসংখ্য বীজাণুর ভয় দিয়ে আমাদের কল্পনাকে ভরাট ক'রে রেখেছে।

৪০১—লক্ষ রকমের বীজাণুর কবল থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে জীবন রক্ষা করার চেয়ে আমি বরং মৃত্যুতেও রাজী আছি। তাতে যদি কেউ আমাকে বর্বর অসভ্য বা অনুন্নত বলে তবু আমি সেই Cimmeriam অন্ধকারই মেনে নেবো।

৪০২—সার্জনরা কাটাছেঁড়া ক'রে রোগ সারায়। তার চেয়ে আগে স্বয়ং প্রকৃতির দেওয়া সর্বশক্তিমান সহজ উপায়কেই খুঁজে বের করোনা?

৪০৩—ওষুধের বদলে আপনা থেকে রোগ-আরোগ্যের পথে চলতে মানুষের আরো অনেক কাল লাগবে, তার কারণ আমাদের মনের ভয়, আত্মবিশ্বাস, আর ডাক্তারি শাস্ত্র আমাদের দেহমনকে যে ওষুধের অভ্যাস শিখিয়েছে তার উপর একান্ত নির্ভর ক'রে থাকা, এইগুলি তার প্রতিবন্ধক।

মা ওষুধের অপরিহার্যতার উপর আমাদের মনে যে বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে তার সম্যক সংশোধন কোনো বাহ্য উপায়ে হবেনা। কেবল আমরা যদি মনের কারাগার থেকে

চেতনভাবে আত্মার আলোতে মুক্ত হতে পারি, তবে ভগবানের সঙ্গে মিলন ঘটলে তখন তিনিই আমাদের হৃত স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ফিরিয়ে দেবেন। এর একমাত্র অকাট্য উপায় হলো অতিমানস রূপান্তর। ১৭-৩-১৯৭০

৪০৪—আমাদের দেহ অসুস্থ হলে তখনই ওষুধের দরকার হয় এই কারণে যে আমাদের দেহ এই বদ্ধ ধারণা নিয়ে রেখেছে যে ওষুধ ছাড়া কিছুতেই সে ভালো হবেনা। কিন্তু তবুও প্রায়ই এমন দেখা যায় যে ডাক্তারে যখন জীবনের আশা নেই বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন প্রকৃতি তার নিজের শক্তিতে রোগ দূর ক'রে রোগীকে বাঁচিয়ে তুলেছে।

৪০৫—আমাদের ভিতরকার স্বাভাবিক আরোগ্যশক্তির উপরে বিশ্বাসকে হারিয়েই আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বর্গচ্যুত হয়ে আছি। সে স্বর্গে আর ফিরে যেতে পারি না যেহেতু ভগবানের নিযুক্ত দুই দরোয়ান—ডাক্তারি শাস্ত্র আর বিকৃত বংশগতি, তার দরজা আগুলে আছে।

৪০৬—মানবদেহের পক্ষে ডাক্তারি শাস্ত্র হয়েছে সেই বৃহত্তর রাজশক্তির মতো যে ক্ষুদ্রতর রাজ্যকে আপন দখলের মধ্যে এনে আশ্রয়দানের নামে তাকে, দুর্বল ক'রে রেখেছে, অথবা সেই দয়ালু চোরের মতো যে গৃহস্বামীকে উপর্যুপরি আঘাত দিয়ে শুইয়ে রাখে যাতে সে বেচারা তার আহত দেহকে সামলাতেই সারাজীবন নিযুক্ত হয়ে থাকে।

৪০৭—ওষুধে শরীরকে বিষিয়ে না দিয়ে আরোগ্য ক'রে দেয় কেবল তখনই যখন তার ক্রিয়া ভিতরকার আত্মিক শক্তির দ্বারা সম্বর্ধিত হয়; কিন্তু সেই শক্তিকেই যদি নির্বিবাদে কাজ করতে দাও তাহলে তখন ওষুধের প্রয়োজন অনাবশ্যক হয়ে যেতে পারে।

মা শ্রীঅরবিন্দ এই সব জোরালো উক্তির দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছেন যে কতখানি বিভীষিকার মধ্যে আমরা রয়েছি, এবং ঐ সব কথাতে আমরা যেন জেগে উঠতে পারি সত্য চেতনার মধ্যে মুক্তিলাভের জন্য নিরন্তর আস্পৃহা করতে এবং একমাত্র ভগবানের সর্বশক্তির উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতা এবং শ্রদ্ধা অবলম্বন করে থাকতে।* ১৮-৩-১৯৭০

—শ্রীমা

* অনুবাদক: পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

৭ এপ্রিল, ১৯৫০

প্রশ্ন : মায়ের "On Education" থেকে—"চিন্তা যখন বাক্যে অভিব্যক্ত হয়, তখন তার শব্দতরঙ্গের স্পন্দনগুলি যথেষ্ট শক্তিতে বাস্তবভাবে সেই চিন্তার সংস্পর্শে ঘটায় এবং তাতে সমুচিত কিছু বাস্তব ক্রিয়া হয়। অতএব তোমরা কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে এমন কোনো খারাপ মতামত মুখে উচ্চারণ করবে না যাতে জগতে ভগবৎ-বিকাশের উন্নতিকে কোনোরূপে বিঘ্নিত করা হতে পারে। এটি হলো সাধারণ নিয়ম। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যদি তোমার মধ্যে এমন জোরালো চেতনাশক্তি ও সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি থাকে যার দ্বারা তুমি যত অশুভ রকমের স্পন্দনগুলিকে নিবারণ বা পরিবর্তন ক'রে দিতে পারো, তাহলে সে স্থলে অবশ্যই তুমি তোমার বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করবে। কারণ তখন তোমার সে শক্তির এমন ক্ষমতা থাকবে যাতে সেই অশুভ স্পন্দনগুলির অনিষ্টকারী সক্রিয়তা একেবারে দূর হয়ে যাবে।

এমন কাজ কেবল সেই ব্যক্তিই নির্বিঘ্নে এবং অকুতোভয়ে করতে পারে যে বিজ্ঞানের স্তরে প্রবেশ করেছে এবং যার আন্তরিক আলো ও সত্যশক্তির দ্বারা মনের তেমন সামর্থ্যলাভ হয়েছে।"

মা, এখানে এই 'বিজ্ঞানের স্তর' কথাটির অর্থ কি ?

উত্তর : ওটি হলো অতিমানস স্তরেরই অপর নাম। ওর মানে হলো উচ্চ প্রজ্ঞা, সত্য প্রজ্ঞা। সেই প্রজ্ঞাই আসলে অতিমানসের জগতের বিশেষ একরূপ অভিব্যক্তি।

প্রশ্ন : ..."এমনতরো অভ্যাস তৈরি করো যাতে অনেক বেশি কথা না বলতে হয়। কথা বলা কমিয়ে দিলে তখন দেখবে যে ক্রমে ক্রমে অন্য লোকেদের সঙ্গে এমন বোঝাপড়া জন্মে গেছে যে পরস্পরের মধ্য সামান্য একটি বাক্যেই কিংবা বিনা বাক্যেও তুমি মনোভাবের আদানপ্রদান করতে পারছ।"

মা, এমনতরো বোঝাবুঝি কি সব কিছুর বেলাতে বা এমন কি বাস্তব জিনিষের সম্পর্কেও সম্ভব হতে পারে ?

উত্তর : উঁ। অর্থাৎ তুমি তাহলে কি জানতে চাইছ ?

প্রশ্ন : তেমন বাস্তব কিছুর বেলাতেও কি নীরব বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে ?

উত্তর : হাঁ, কারণ উচ্চারিত বাক্য হলো পরস্পরের মধ্যে মনোভাবকে প্রকাশ করবার জন্য একটা মাধ্যম মাত্র। শুধু তাতেই তার সার্থকতা। কিন্তু মন যদি তেমন

স্বচ্ছ ও শক্তিশালী হয় যে বিনাবাক্যেই নিজেকে জানিয়ে দিতে পারে, তাহলে সে আরো ভালো কথা, কারণ তাতে আরো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাবে তার কাজ হবে। তখন কোনো বাক্যের প্রয়োজনই হবে না।

প্রশ্ন : এমন কি কোনো বস্তু সম্পর্কেও কি তাই হবে?

উত্তর : হাঁ, তা পরীক্ষা করেও দেখা যায়। দুজনেরই মন যদি সেই ভাবে তৈরি থাকে, তাহলে একজন যখন ভাবছে : "অমুক জিনিসটা ওখানে না রেখে এখানে রাখা উচিত", তখন অপরজন তা বুঝতে পেরে সেই জিনিস সেখান থেকে সরিয়ে এখানে এনে রাখবে। তাকে মুখে কিছু বলতে হবে না, সে এমনিতেই বুঝবে। এতটা পর্যন্ত না হলেও প্রায়ই যেমন হয়ে থাকে (অর্থাৎ যারা একত্রে বাস করছে এবং ঐভাবে সচেতন হতে অভ্যস্ত হয়েছে তাদের মধ্যে), তা এই যে একজনের মনে কোনো প্রশ্ন জেগেছে অমনি অন্যে তার জবাব দিলে, কথাটা একের মনে উদয় হলেই অন্যে বলে "হাঁ, ওটা করা হয়ে গেছে বা করা হয়নি।" সে যদিও প্রশ্নটি কানে শোনেনি কিন্তু ভাবে বুঝে তার জবাবটিও দিয়েছে। এমন প্রায়ই কি হয়না? পরে যদি তা কথাতে বলারই দরকার হয় তখন দশটা কথার বদলে একটি মাত্র কথাই যথেষ্ট হয়, বাকিটা সে তার থেকেই বুঝে নেয়। এমন প্রত্যক্ষবোধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সহজেই নেলে। যদি এমন কোনো নতুন লোকের সঙ্গে কথা বলো যেখানে মনের ঐরূপ কোনো সংযোগ নেই, তাহলে সে হয়তো এমন কিছু বললে যার অর্থ তুমি বুঝলে না, যদিও সেরূপ কথা বলাতে তুমিও অভ্যস্ত, তখন মনে হবে সে তোমার বলার ভাষা নয়, কিন্তু অনেকবার তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকলে তখন মনের জানাজানি হয়ে অনায়াসে বুঝতে শুরু করবে।

অর্থাৎ বাক্য জিনিসটা হলো এমন এক মাধ্যম যা প্রকাশ করে বাক্যের অতীতকে, কিন্তু ভিতরের যন্ত্রাদি সুপরিণত ও সুসম্পূর্ণ হলে তখন বিনা বাক্যেও সে ভাব প্রকাশ করা যায়। যারা সেরূপ অবস্থা লাভ করেছে তাদের পক্ষে বাক্য বরং তার ভাবের গুরুত্ব আরো কমিয়ে ও সংকীর্ণ ক'রে দেয়, দুর্বল ক'রে দেয়। চিন্তাশক্তিকে সরাসরি প্রয়োগ করতে পারলে তা বাক্যে বলার চেয়ে বেশি জোরালো হয়। বাক্য জিনিসটা তাকে খর্ব ও নীরস করে, তার প্রাণশক্তি ও সাবলীলতাকে ব্যাহত করে। মানুষের স্বাভাবিক যন্ত্রগুলি তেমন পটু নয় বলেই আমরা বিনাবাক্যের টেলিগ্রাফের মতো কিছু করতে পারি না। সে সব যন্ত্র তেমনভাবে উন্নত ক'রে নিতে পারলে তখন সারা দিনে দশটা কথাও বলতে হয়না, কিন্তু তবু সবই বোঝা যায়।

প্রশ্ন : না, আমি এইটা বুঝতে পারিনি, আপনি বলেছেন—"এখানেও এই এমন ভাবের ও জ্ঞানের জায়গাতেও মানুষ তাদের নিজের ধারণা নিয়ে গোঁড়ামী করতে ও অসহিষ্ণু হতে ছাড়েনা, নিজেদের জিদ্ বজায় রাখতে চায়।"

উত্তর : হ্যাঁ, তা কেন বোঝোনি? তাই তো নিত্য হচ্ছে।

তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন নেই? না, বলবার সাহস নেই?

প্রশ্ন : তা নয়, সাহস আছে কিন্তু কোনো প্রশ্ন নেই।

(অন্য ছেলে) মা, এমন কি হয়না যে, কেউ যখন উন্নতির দিকে তেমন অগ্রসর হতে পারছে না, কিন্তু তবু তাকে পিছিয়ে পড়তে হবে না ?

উত্তর : আমি এই বলেছি যে একই অবস্থাতে থাকা যায় না। তুমি বলছ "তেমন অগ্রসর হতে না পারলে", কিন্তু তা হলেও সে একটুও তো পেয়েছে ? তার তাতেই কাজ হবে, পিছোতে তাকে হবেনা। আর কেউ যদি সদা সতর্ক হয়ে না থাকে, কারণ প্রত্যেকেই তো নানারূপ অংশ নিয়ে গড়া, তাই যদি সে সকল অংশ দিয়েই অগ্রসর হতে পারার কিছু অংশ পিছিয়ে থাকে, তাহলে সে একটা দিকে অনেক অগ্রসর হলেও অন্য দিকে পিছিয়ে থাকবে। এমনি হয়। অর্থাৎ সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপে হতে পারে না।

সাধারণ মানুষদের বেলাতে এই রকমই অবস্থা হয়ে থাকে। যেমন, কেউ হয়তো কেবল পড়াশোনা নিয়েই আছে, কেউ হয়তো বিজ্ঞান গবেষণা নিয়েই আছে, তখন সে শুধু ঐ দিক দিয়েই উন্নতি করলে, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ জীবন বা সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ হয়ে পিছিয়ে রইল, সেদিক দিয়ে তার অনেক দোষ থেকে গেল, এমন কি মারাত্মক রকমের ত্রুটি হওয়া পর্যন্ত। যদিও সে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক কিছু উন্নতির কাজ ক'রে থাকে, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে সে একেবারে আনাড়ি। এমন তো প্রায়ই হয়। তাই কেউ যদি সর্বদিক দিয়ে সতর্ক বা সচেতন না হয় তাহলে এক অংশে এগিয়ে গেলেও অন্য অংশে সে পিছিয়ে থাকবে। তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও কেউ যদি সব দিকে সতর্ক না থাকে, যদি সে তার বাহ্য দিকটাও সংযত না রাখে, তার প্রাণসত্তার ক্রিয়াকে যদি যথেচ্ছ আচরণ হতে নিবৃত্ত না করে, তাহলে অকস্মাৎ সে দেখবে যে নানা বদ অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিয়ে সে কতখানি ভুল পথে গিয়ে পড়েছে, যদিও মনের আশ্বাসের জোরে সে জ্ঞানের পথে অনেকটা এগিয়েছিল। অমনোযোগী থাকলেই কখন পা ফস্‌কে গর্তের গহ্বরে পড়ে ধাক্কা খাবে আর তখন অবাক হয়ে বলবে : "এটা কি হলো ?" পা ফস্‌কে যাওয়াতেই তেমন হয়েছে। তুমি যেদিকে নজর দাওনি সেই দিকটাই তোমাকে ঐভাবে টেনে নামিয়েছে, তাকে তুমি রুখতে পারনি, বশ ক'রে নাওনি, তাই সেই দিকই তোমাকে পিছনে টেনে নিয়েছে।

আধ্যাত্মিক জীবন যদি চাও তাহলে চার ভাগের তিন ভাগ সময় কেবল ঘুমন্ত হয়ে থাকলে চলবে না। সর্বদা সতর্ক ও হুঁশিয়ার থাকা চাই, নতুবা প্রবলতরঙ্গ নদীতে বা সমুদ্রতুফানে ছোটো পান্‌সির মতো অবস্থা হবে, তরঙ্গবেগের সম্বন্ধে সাবধান না হলে বা হাল ছেড়ে বসে থাকলে অকস্মাৎ দেখবে যেদিকে তুমি যেতে চেয়েছিলে তার উল্টো দিক তোমাকে টেনে নিয়ে গেছে। তখন বলবে : "ওঃ। আমি যে ওদিকে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু অপর দিকে এসে পড়লাম।"

সাধারণ জীবনে এই রকমই সর্বদা হচ্ছে। তাতে লোকে বলে : "ঘটনাচক্রে কিংবা ভাগ্যদোষে কিংবা অমুকের জন্যেই এমনটা হলো, বা আমার নসিবটাই এমনি মন্দ।" এই সব বলে দোষ কাটানো খুব সহজ। এমনি করেই লোকে চাপা দেয়, তারপর... তবে হাঁ, মন্দ অবস্থাও আছে আবার ভালো অবস্থাও আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অন্ধকার

গর্তেই গতি, সকলের বেলাতেই তাই, কেউ বা কিছু তাড়াতাড়ি যায় কেউ বা কিছু বিলম্বে। এতে কেউবা কিছু গ্রাহ্যই করেনা, কেউবা সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে মুখভার ক'রে থাকে, মোটা-মুটি সে একই কথা। কারণ সকলেই অজ্ঞানের মধ্যে বাস করছে এবং সকলেই ভাগ্যের উপর বা অন্যজনের উপর দোষ চাপাচ্ছে, অথচ কেউই এইটুকু বলে না যে "সবই আমার নিজেরই দোষে"। সেজন্যে আগেই দরকার চেতনার উদারতা। এমন কি যারা পুরো চেতনা থাকার দাবি করে তারাও জানে না যে সব কিছু হচ্ছে নিজেরই ভিতর থেকে, নিজেরাই তার জন্য দায়ী। তারা শুধু বললে: "অমুক জিনিসটা ঠিক ছিল না, অমুক অবস্থাটা অনুকূল ছিল না, আহা কেন যে এটা হলো।" কিন্তু আসলে তুমি নিজেই যদি অমন না হতে তাহলে ঐরকম হতো না, তখন অন্যরকম হতো।

প্রশ্ন আমরা আমাদের যত কিছু ধারণা, অনুভবাদি ও মনোভাবের সঙ্করণগুলিকে প্রায়ই কথার সাহায্য নিয়ে ব্যক্ত করি। কিন্তু কেউ যদি জানতে না চায় তাহলে সে কথা মুখে বলার কি প্রকৃত প্রয়োজন থাকে?

উত্তর না, কিছুই প্রয়োজন নেই। ওটিও এক রকমের বদ অভ্যাস। এ বছরের পয়লা জানুয়ারিতে আমি সেই ধরণের কথাই বলেছি "কোনো বিষয়েই সোচ্চারে আস্ফালন করতে যেও না, তোমার কাজটাই তোমাকে প্রকাশ করবে।" ঠিকই তাই, এমন কথা মুখে বলে কোনো লাভ নেই "আমি তোমার ভালো চাই তাই তোমার জন্যে এই সব করলাম," ইত্যাদি—কেবল বাস্তবে সে কাজটি ক'রে দিলেই যথেষ্ট হলো, কিছু না বলে।

প্রশ্ন কিন্তু যখন আমরা কোনো ধারণা বা চিন্তা করি তখন তা মনে মনে বাক্যে বলতে থাকি (না চেঁচিয়ে), তাহলে কি কোনো কিছু ভাবতে হলে ভিতরে কথা বলার দরকার হয়? কথা ছাড়াই কি চিন্তা হতে পারে?

উত্তর: এর কারণ তখনও তোমার মনে ভাবটির সমুচিত সংস্পর্শ ঘটেনি। ভাবের রাজ্যে কোনো বাক্য নেই, কেবল তাতে হয় চেতনারই সেইরূপ ভাবাবস্থা।

প্রশ্ন: না, বাক্ বা মূল বাণী (The Word) কাকে বলে?

উত্তর: সে হলো আলাদা জিনিস—কোনো উচ্চারিত বাক্য নয়। যেমন প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে আছে, "Let there be light and there was light" (আলো হোক, আলো হলো)। এ হলো মন্ত্রের মতো, যা বিশিষ্ট রকম আত্মিক ইচ্ছার ক্রিয়া, যখন নিচে নেমে আসে বাস্তবের আকার নিতে ও জড়েতে প্রকাশ হতে, তখন সরাসরি ক্রিয়াতে তার অনুরূপ স্পন্দন ঘটে। আর ঐগুলি হলো বিপরীত জিনিস। তুমি রয়েছ বাক্যে রূপায়িত চিন্তার স্তরে, আরো উপরে উঠলে হবে নীরব বাক্যশূন্য ভাব; আরো উপরে উঠলে আসবে শক্তি, চেতনাশক্তি, যার থেকে চিন্তা জন্মায়। তখন বিশুদ্ধ চেতনা, যার আকার নেই। অর্থাৎ তখন ভাবের মূল উৎসে উঠে যাবে। সে চেতনার আলোক নিয়ে যদি

বস্তুজগতে কিছু করতে চাও তাহলে সে ইচ্ছা স্তরের পর স্তর নেমে শব্দে রূপ নেবে এবং নীরবতার বদলে সরব বাক্য হয়ে স্পন্দন আনবে। কিন্তু তার আগে সেই সর্বোচ্চে ওঠা চাই, সেই নীরব চেতনার উৎসে, তবেই তা পরে তেমনই বাক্যে স্ফুরিত হবে। সেরূপ বাক্য আসে উপরের ভূমি থেকে, মাঝামাঝি কোনো স্তর থেকে নয়। তেমন বাক্যই হতে পারে দিব্য বাক্য বা চিন্ময় বাণী স্বরূপ। তা বড়ো সহজ কথা নয়।

আমি এখানে যে চারটি তপস্যা-প্রচেষ্টার সম্বন্ধে বলেছি (The Four Austerities) তার একটি হলো স্পষ্ট ভাব নিয়ে মনের মধ্যে নীরব থাকা, বাক্য বা চিন্তা ছাড়া কেবল এক জীবন্ত চেতনা ও আস্পৃহা নিয়ে থাকা। এখানে আমি তা বাক্যে বলতে বাধ্য হচ্চি ছাপিয়ে প্রকাশের জন্য (এতে তার শক্তির তিন ভাগ কমে গেছে) নতুবা তোমরা বুঝবে না। ফাঁক রেখে দিলে তোমরা জানবে না বলে কথায় বিস্তারিত বলতে বাধ্য হচ্ছি।

যা সত্য, সম্পূর্ণ, নিখুঁত, তার জন্য আস্পৃহা চাই। আর সে আস্পৃহা হবে বাক্যাতীত, নীরব অথচ তীব্র ও অটল। সেখানে বাক্যের অধিকার নেই। শুধু আস্পৃহার নীরব স্পন্দন যা অস্পর্শিত, তাতে যদি কিছু নেমে এসে বাক্যে উচ্চারিত হয়, তাই হবে পরম বাক্য। অন্যরকম কিছু নয়।

আজ এই পর্যন্ত। পুনর্দর্শনায় (Au-revoir) আমার ছেলেমেয়েরা।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

টুকরি

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

বাঙাল

মেসের ছেলেরা ওকে নিয়ে কত হাসে,
কেউ বলে, "ভাই, খুব চেক্‌নাই ছিটের পাঞ্জাবীটা।"
কেউ বলে, "বুঝি লাট সাহেবের নাপিত ছেঁটেছে চুল?"
মাধব তা শুনে হো হো কোরে হেসে ওঠে।

একদিন ওর গোপনে বাক্স খুলে
যতীন যখন ফটোগ্রাফখানি নিয়ে
চোখ টিপে বলে, "মাধব এ কার ছবি—"
রাঙা হলো মুখ, চোখ দুটো লাল কোরে
মুঠি পাকাইয়া গর্জি উঠিল মাধু।

বিচিত্রা

গান শুনে তার আমি বললাম, "ওগো বিচিত্রা দেবী,
ঐ সুর শুনে আজ সারা রাত কাটাতে পারি।"
সে বললে—"আহা! সত্যি নাকি?"
আমি বললাম, "মায়ার কাজল পরেছ চোখে?"
সে বললে –"রাখো কথা!"
—"ওগো সুন্দরী, তোমার রূপের কাছে
উর্ব্বশী হার মানে।"
খিল্ খিল্ কোরে হেসে উঠে বলে, "দেখেছ উর্ব্বশীকে?"
"—চিত্রা চিত্রা! এখনি উঠ্‌লে কেন?"
সে বললে—"তুমি আমাকে বসিয়ে
কার সাথে কথা কও
বুঝতে পারিনে,
তাই যেতে চাই চলে।"

কবির প্রিয়া

শচীন খাতায় লেখে
"অসীম আমার চিত্ত-আকাশে তুমি সে একটি তারা;
আমার মনের গহন কাননে একটি স্বপন-যুথী।"
লেখা শেষ হলে যেতে যেতে পথে শচীন ভাবে,
দু'বোনের মাঝে সাম্বিনী ভালো কি অম্বা ভালো।

বায়োস্কোপ

ফিরোজা-রঙের শাড়িটা কি হলো?
না না, ওটা থাক, আনারসীটাকে আনো;
চুল বেঁধে দিতে দেরী করেছিল দিদি,
তবু হলো নাতো ভালো।
রজত বাবুর গাড়ী এলো বুঝি,
যাবো যে বায়োস্কোপে।

বীরপুরুষ

এ দেখি যুদ্ধ ইংরেজে জার্মানে।
একজন বলে, "বন্দুকে তোর উড়োবো মাথা।"
আর জন বলে, "টের পাবি যদি কামানটা যদি দাগি।"
আমড়াতলার গলিতে দাঁড়িয়ে ন্যাংটা দুজন ছেলে
বাগিয়ে ধরেছে পাটকাঠি আর তলতা বাঁশের চোঙা।

সহরের পথে

সন্ধ্যা বেলার ভিড় জমে গেল গলির মোড়ে,
রক্তে ভিজিল মাটি।
তখনো বৃদ্ধ বলে
"পকেট-কাটা সে বিষম ঠকেছে,
কোমরেতে বাঁধা নোটের তাড়া,
নিতে পারে নাই, পিঠে বেরে গেছে ছুরি।"

ব্যবসায়ী

শাঁখিনী-সাপের সরু সরু হাড়,
ধনেশ পাখীর ঠোঁট,
কালো বিড়ালের পুরোণো চর্বি,
আকড় গাছের শিকড়ের বাঁধা আঁটি,
একটি ছোটট কাঁচের বাটিতে সবুজ রঙের তেল,
এক মুঠো বালি, শুকনো কিসের ফুল,
কালো কম্বলে সাজিয়ে রেখে
মাথায় পাগ্‌ড়ী দুলিয়ে পথের ধারে
ভিড় জমিয়েছে বুজরুক ব্যবসায়ী।

কালিঘাট ও চৌরঙ্গী

কালিঘাট থেকে চৌরঙ্গীর মোড়ে,
কম রাস্তাতো নয়।
তবু দুটি বেলা হেঁটে হেঁটে সারা হোলো।
পায়ে ছেঁড়া চটি,
গায়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবী,
কাঠফাটা রোদে ছাতা জোটে নাকো যার
বলো দেখি দিদি, কোন স্পর্দ্ধায়
হাঁ কোরে চেয়ে থাকে
মোর জানালার পানে।

এদেশ আর ওদেশ

শ্যামবাজারের হলুদে বাড়িতে ধুম ধাম হয় কত,
আজ বিয়ে করে বিলেতফের্তা ও বাড়ির বড় ছেলে।
হাজারিবাগের লাল টালি ছাওয়া বাগান বাড়িতে বোসে
তরুণী কিশোরী কেঁদে ওঠে বারবার।

নন্দিনী সেন

—এই নেও সুতা, তোমার সাধের কাশ্মীরী সাড়িখানা।
—থাক্, ফেলে দাও।
—এনেছি আজকে নতুন রেকর্ড, নতুন নতুন গান।
—আমি শুনবোনা।
—এত অভিমান কেন?
—যাচ্ছা বলোতো, বলোতো শপথ কোরে,
বলতো—বলতো—
—ওকি—ওকি! সুতা পাগল হয়েছ নাকি?
—বলো বলো তুমি, এটা কার চিঠি?
নন্দিনী সেন—সে কে?

শিশু ও যুবক

সাঁওতালী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে
বাজারের এক পাশে
তিনু হালদার আঁখি হানে তার যৌবনভরা বুকে,
সাঁওতালী মেয়ে বুক ঢাকে সঙ্কোচে।
ছোট ছোট দুটি গোল মুঠি তুলে
ছেলেটি যখন কেঁদে ওঠে তার কোলে
সাঁওতালী মেয়ে সবার সাম্নে বুক খুলে দেয় শিশুর মুখে।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী বহ
একমাত্র আধ্যাত্মিক মাসিক পত্রিকা।

শৃণ্বন্তু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রতি সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ :

★ শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ধারাবাহিক অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

★ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সাহিত্য দর্শন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তামূলক একাধিক গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ।

★ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ জীবনালেখ্য
"ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

★ দৈনন্দিন সমস্যাপীড়িত জীবনের পথে দিশারী ও প্রেরণাস্বরূপ শ্রীমায়ের বাণী ও মায়ের আলাপ।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) দশ টাকা।
বৈশাখ সংখ্যা হইতে বর্ষ আরম্ভ।
বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা :

শৃণ্বন্তু
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo		
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·০০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী (৩য় সংস্করণ)		যন্ত্রস্থ
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম	,, ,,	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা) (২য় সং)	নীরদবরণ	যন্ত্রস্থ
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	যন্ত্রস্থ
দিব্য জীবনের সন্ধানে	,,	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

FOR
NEAT PRINTING
AND
QUICK SERVICE

Quick Printing Service

6/2 Ramanath Majumdar Street
Calcutta-9
Phone : 34-2575

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX **Phone :** 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

লীলাস্মরন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী–২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা–১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা–৯

একটি চিত্তাকর্ষক কাব্য গ্রন্থ
বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন—
মূল তামিল থেকে বাংলায় অনুবাদ—

আলবার পদাবলী

সমীরকান্ত গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী, দাক্ষিণাত্যে তামিলদেশে তেমনি আলবারদের 'প্রবন্ধম্' বা পদাবলীর সমার্থক স্তবমালা। যে-কয়জন আলবারের পদসংগ্রহ এই গ্রন্থে তাঁরা হলেন—

তিরুমঙ্গৈ আলবার পেরিয়ালবার
কুলশেখরণ আলবার অণ্ডাল নম্মালবার

বঙ্গানুবাদের ভাষা, তার লালিত্য, শব্দব্যঞ্জনা, ধ্বনিঝঙ্কার, মন্ত্রধ্বনিমুখর কাব্যশৈলী পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

মূল্য : দশ টাকা

—প্রকাশক—
শৃঙ্খল
৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগষ্ট ১৫, ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজীতে [illegible] সম্পূর্ণ
সুশোভন রক্সিন [illegible]—১৫০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
[illegible] —৭৫৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত (গীতার ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী, পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি) পূর্ণাঙ্গ খণ্ড সহ অন্যান্য রচনার নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬৲ টাকা

আঞ্চলিক ভাষা

১ হিন্দী গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

197 MAR 1975

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২